

~*MASUD RANA SERIES*~

Lenin Gradh (Part I & II) By Kazi Anwar Hossain



For more free Books, Songs, Software,
PC games, Movies, Natok,
Mobile ringtones, games and themes etc.
please visit
www.murchona.com/forum



Scanned By:

Abu Naser Mohammad Hossain (Sumon)

Email:

anmsumon@yahoo.com, anmsumon@gmail.com

মাসুদ রানা

লেনিন গ্রাদ

[দুইখণ্ড একত্রে]

কাজী আনোয়ার হোসেন

সবার সাথে ফিলারও উঠেছে

ডুবোজাহাজ লেনিনগ্রাদে। অলক্ষ্য থেকে

একের পর এক হামলা চালাচ্ছে যখন যারওপর খুনি

মনে হচ্ছে উদ্দেশ্যহীন ম্যানিয়াক একজন—

খুনের নেশায় নিজেকেও ধ্বংস করে দিতে দ্বিধা নেই যাত্র।

প্রথম দিকে বোকা বনে গেল রানা। কিন্তু তারপ

জটিল এক জান পাতল অতি সাবধানে।

আরও একটা খুন করার

কিংবা আরও মারাত্মক কোন বিপদে ফেলার

আগেই ধরতে হবে খুনীকে—প্রমাণ সহ।

কিন্তু রানা কি ভাবতে পেরেছিল

শেষ মুহুর্তে পিস্তল বের করে বসবে খুনী?



সেবা বই

প্রিয় বই

অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেতুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শৌ-ক্রম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

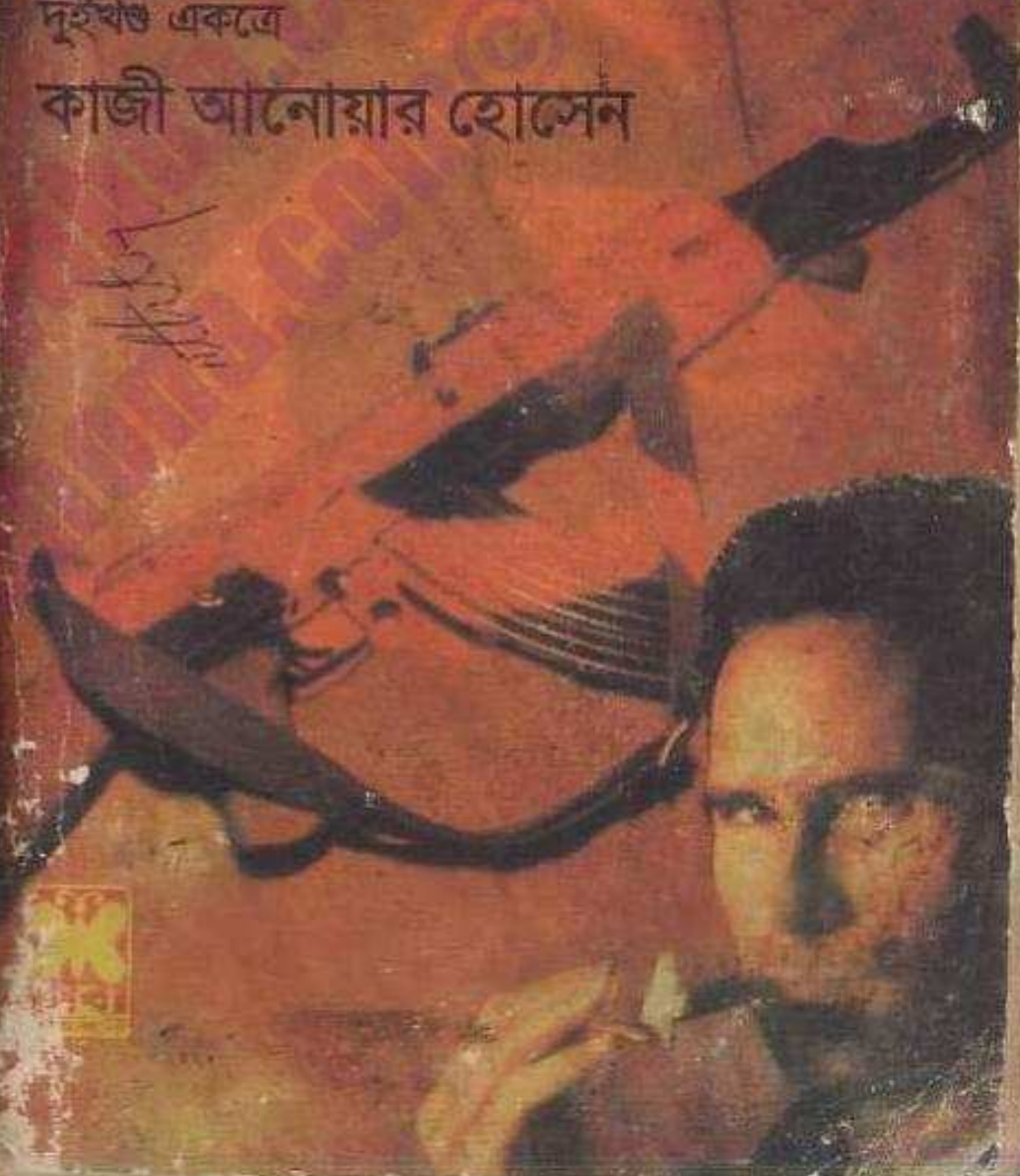
শৌ-ক্রম: ৩৮/২৫ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মাসুদ রানা

লেনিন গ্রাদ

দুইখণ্ড একত্রে

কাজী আনোয়ার হোসেন



এক

ভোরের আলো ভাল করে ফোটেনি এখনও, বালির ওপর সাবধানে পা ফেলে আটল্যান্টিকের একেবারে কিনারায়ে এসে দাঁড়াল মাসুদ রানা। মনটা ভাল নেই।

পূর্ব আকাশে কীপ আলোর আভাস লক্ষ করা গেলেও মাথার ওপর ঘন কালো অন্ধকার। বোধহয় মেঘ করেছে। ঝিরঝিরে বাতাস লাগছে চোখে-মুখে, ঠাণ্ডা। সমুদ্র প্রায় শাস্ত্রই বলা যায়। পায়েয় কাছে এসে পড়াগড়ি খাচ্ছে ছোট ছোট ঢেউ। মাথার ওপর ডানা ঝাপটাবার আওয়াজ, কিন্তু একটা সী-গালও চোখে পড়ল না। সুইম-সুট পরে এসেছে রানা, সুখোদয় দেখে গোসলটাও সেরে মেবে। ভিজ়ে বালির ওপর বসে পড়ল। কাছাকাছি কোথাও থেকে ভেসে এল মিষ্টি মেয়েলি গলার হাসি। বুক চেঁলে বেরিয়ে এল ভারী একটা দীর্ঘশ্বাস।

গ্রিও গ্যাব্রেলস, আজর্জিনা।

সরকারী আমন্ত্রণে রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির টীক হিসেবে বুয়েনস আইরেসে এসেছিল ও। রাজধানীর উচ্চবিত্ত মহলে অপরাধ প্রবণতা দিনকে দিন মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলো অপরাধীদের নিত্য-নতুন কৌশলের সাথে এটে উঠতে পারছে না, তাই মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, আন্তর্জাতিক মানের কোন প্রাইভেট গোয়েন্দা সংস্থার সাহায্য চাওয়া দরকার। অতিজ্ঞ আর দক্ষতার রেকর্ড-পত্র ঘেঁটে গোটা পাঁচেক ফার্মের মধ্যে থেকে বেছে নেয়া হয়েছে রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সিকে। কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ আলোচনার পর বুয়েনস আইরেসে একটা শাখা খুলতে রাজি হয়েছে রানা।

ইচ্ছে ছিল কাজ সেরে দেশে ফিরে যাবে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে হঠাৎ করেই মনে পড়ে গেল কুয়েজা ইরোরার কথা। ইরোরা চোখ-ঝলসানো ঝুঁকি নয়, নেহায়েতই সাদামাঠা—কিন্তু তার মত সরল আর ভাল মেয়ে বড় একটা দেখা যায় না। বছর দুই আগে লন্ডনে ওদের পরিচয় হয়েছিল। নিজের অজান্তে কিছু বাজে লোকের পান্নায় পড়ে গিয়েছিল ইরোরা, বিপদ যখন টেন পেল তখন আর নিজেকে রক্ষা করার কোন উপায় ছিল না। ঘটনাচক্রে ব্যাপারটা জানতে পেরে তাকে উদ্ধার করে রানা। এরকম অবস্থায় প্রায়ই দেখা যায় উদ্ধারকারী কিছু সুযোগ নিতে চেষ্টা করে, কিন্তু রানার মধ্যে সে-ধরনের কোন প্রবণতা দেখতে না পেয়ে যেমন আশ্চর্য হয়েছে তেমনি কৃতজ্ঞ বোধ করেছে মেয়েটা। নিজের দেশে বেড়িয়ে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল রানাকে, কিন্তু সময়ভাবের অজুহাত দেখিয়ে এড়িয়ে গিয়েছিল রানা।

কাল দুপুরে রিও গাল্ফেসে পৌঁছেছে ও। উঠেছে হোটেল ইন্টারকনে। ইচ্ছে ছিল বিকেলের দিকে ইরোরার ঠিকানায সারপ্রাইজ ভিজিট দেবে। মেয়েটি সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা হয়নি ওর, তাই হোটেল পৌঁছেই খোজ-খবর নেবার চেষ্টা করেছিল। প্রায় তিনে হোটেল মানেজার বা বলল, তাতে মনটা একেবারে খাবাপ হয়ে গেল। মানটি-মিলিওনিয়ার বাপের একমাত্র আদরের দলদলী ইরোরা। দেশ-জোড়া পরিচিত এবং সুখাম রয়েছে পারিবারটির। কিন্তু এই অর কিছুদিন হলো হঠাৎ ইরোরার বাবা মেয়েকে চরিত্রহীন, সম্পট এবং আত্মবৃত্তো এক কোটিপতি ব্যবসায়ীকে বিয়ে করতে বাধ্য করেছেন। এই বিয়েতে রাজি ছিল না ইরোরা, কিন্তু বাপ তার নিজের সিদ্ধান্তে অটল। ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল ইরোরা, কিন্তু ডাক্তাররা তাকে বাঁচিয়ে তোলে। এরপর তার বাবা প্রকাশ্যে জানিয়ে দেন, বিয়েতে রাজি না হলে ইরোরাকে তাঁর উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত এবং অজ্ঞা-কন্যা করা হবে। শেষ পর্যন্ত বিরোধে মত দেয় ইরোরা। বিয়েটা হয়েছে মাসখানেকও হয়নি, শোনা যাচ্ছে এরই মধ্যে নাকি সম্পট স্বামী ইরোরার ওপর শারীরিক নির্যাতন শুরু করেছে। সব শুনে তখনই ইরোরার কাছে ভুটে যেতে ইচ্ছে করেছিল রানার, তার এই বিপদে সাহায্য করার জন্যে জটিল করে উঠেছিল মনটা। কিন্তু তাগ মাখায় ব্যাপারটা ভাবতে গিয়ে বুকল, এমন কিছু করা উচিত হবে না যাতে ইরোরার মন অস্থির হয়ে ওঠে। এখন হয়তো সে স্বামীর সংসারে নিজেকে আডজাস্ট করে নেবার চেষ্টা করছে, চেষ্টা করলে হয়তো কুণ্ড থেকে স্বামীকে ফিরিয়েও আনতে পারবে। সাহায্য চাইলে আলাদা কথা ছিল, গায়ে পড়ে কিছু করতে যাওয়া উচিত হবে না। ভেবেচিন্তে ঠিক করল রানা, ইরোরার সাথে সে দেখাই করবে না। দেখা করে লাভ কি! এই পরিস্থিতিতে ইরোরাকে কিভাবে সাহায্য করা যায় তাতে সে পেল না ও। মনে মনে এই ভেবে নিজেকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল—বুকের মত নিষ্পাপ কিছু মেয়ে পুরুষের নির্যাতন সহ্য করার জন্যেই জন্মায়।

রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি ওর, শেষ রাতের দিকে আজোবাজে স্বপ্নও দেখেছে। হোটেল থেকে সুইম-সুট পরে বেরোবার সময় ঠিক করে ফেলেছে, এখানে আর নয়, আজই রিও গাল্ফেস ছাড়বে।

দুর্ঘটনার পরও অনেকক্ষণ সৈকতে বসে থাকল রানা। অনামনস্থ, বিষম—আশপাশে কি ঘটছে সে-ব্যাপারে খেয়াল নেই। মন জুড়ে আছে ইরোরা। তার শাস্ত, নিষ্পাপ, বড় বড় চোখ জোড়া করণ আবেদন ভরা দৃষ্টিতে যেন তাকিয়ে আছে ওর দিকে। বুকের ভেতর অদ্ভুত একটা কষ্ট অনুভব করল রানা।

খানিক দূর থেকে দু'জন লোক-যে ওর ওপর নজর রাখছে, ব্যাপারটা লক্ষ্যই করল না ও।

কাছেই হোটেল, পানি থেকে উঠে ভিজে কাপড় নিয়েই এক মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেল। এলিভেটরে চড়ে তিনতলায় উঠে এসে দাঁড়াল নিজের সুইটের সামনে। কী-হোলে ঢাবি ঢুকিয়ে তালা বন্ধ। সিটি রুম চুকতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ল। দরজার দিকে পিছন ফিরানো একটা চেয়ারে একজন লোককে বসে থাকতে দেখে মুহূর্তের জন্যে থমকে গেল ও।

তালা খোলার ক্লিক শব্দে রানার উপস্থিতি টের পেয়েছে লোকটা, দীরে দীরে ঘাড় ফিরিয়ে দরজার দিকে মুখ করল সে। লম্বায় বোধহয় রানার চেয়ে ইঞ্চি কয়েক বেশিই হবে, একহারা গড়ন, চেহারায় অদ্ভুত একটা নিষ্ঠুর ভাব। ঠোটে লোপে রয়েছে অকারণ বিক্রপের হাসি। বলল, 'আসুন, কমরেড রানা। আমি আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি।'

লোকটাকে আগে কখনও দেখেছে কিনা মনে করতে পারল না রানা। চেহারায় দেখে এবং ইংরেজী উচ্চারণ শুনে বুঝতে অসুবিধে হলো না, লোকটা রাশিয়ান। কে.জি.বি. ও আর্জেন্টিনায়, একথা জানল কিভাবে? মতলবখানা কি? একা, নাকি সাথে আরও লোকজন আছে? নিশ্চয়ই তল্লাশি চালিয়েছে? পিস্তলটা কি পেয়ে গেছে? এই রকম আরও অনেক প্রশ্ন জাগল রানার মনে। শরীরের পেশী শক্ত হয়ে উঠলেও, চেহারায় রাগ বা সতর্কতার কোন ভাব ফুটল না। মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়িয়েছিল, তারপর শান্ত ভাবে ভেতরে ঢুকে দরজাটা ভিড়িয়ে দিল। দরজায় তালা না লাগিয়ে হেঁটো এসে দাঁড়াল ছোট্ট বারের সামনে। একটা গ্রাসে কয়েক টুকরো বরফ ফেলে তাতে খানিকটা আপল জুস ঢালল ও। বারের ওপর কনুই রেখে ঢিল করে দিল শরীর, আরাম করে দাঁড়াল। তারপর চুমুক দিল গ্রাসে। নিঃশব্দে কেটে গেল ঝাড়া গ্রিশ সেকেন্ড।

তারপর পিছন থেকে জানতে চাইল লোকটা, 'কিছু জিজ্ঞেস করার নেই, কমরেড রানা?'

এক চুমুকে গ্রাসটা খালি করল রানা। বারের ওপর সেটা নামিয়ে রেখে এগোল বাথরুমের দিকে। দরজার কাছে পৌঁছে ঘুরে দাঁড়াল ও। বলল, 'ফিরে এসে যদি দেখি তুমি আছ, ঘাড় ধরে বের করে দেব।' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল ও।

বেসিনের সামনে এসে দাঁড়াল রানা। জু খুলে বেসিনটা একটু উচু করে ধরল ও, পিছন দিকটা হাতডাঙেই টেপ দিয়ে আটকানো ওর প্রিয় সঙ্গী পয়েন্ট থ্রী-ট ওয়ালবার পি.পি.কে. ঠেকল আঁড়লে। সেটা বের করে ভাল মত পরীক্ষা করল ও। ঠিকই আছে।

কাঁচের শেলফে পিস্তলটা রেখে শাওয়ারের নিচে দাঁড়াল রানা। গা থেকে সাগরের লোনী পানি ধুয়ে ফেলার ফাঁকে চিন্তা করতে লাগল। মাসুদ রানা আর্জেন্টিনায়, এ খবর যোগাড় করা কে.জি.বি.-র পক্ষে মোটেও কঠিন নয়। প্রায় সব এয়ারপোর্টেই ওদের লোক থাকে। কোন হোটেলের উঠেছে, সেটা জেনেছে ওকে অনুসরণ করে। সুইটের ঢাবি যোগাড় করা একটু কঠিন—হয়তো হোটেল কর্মচারীদের মধ্যে নিজেদের লোক আছে, নয়তো ঘুম দিয়ে স্পেমার কী বাসিয়েছে। কিন্তু উদ্দেশ্যটা কি? পুরানো শত্রুতার ছুতো ধরে প্রতিশোধ নিতে চায়? পেশার স্বাভাবিক অনেক সময়েই রাশিয়ার শত্রুদেশকে সাহায্য করতে হয়েছে ওর, কে.জি.বি. সেটাকে কখনও ভাল চোখে দেখেনি। কিছু প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছে থাকলে ওর মাখায় টুন করে একটা গুলি বেরিয়ে নিজে বাহেমলা সিটিয়ে ফেলতে পারত। অদ্ভুত সে চেষ্টাই করত। এত কষ্ট করে ওর হোটেল সুইটের ভেতর ঢুকে ঐফের সঙ্গে অপেক্ষা করত না। নাকি ভুলিয়ে মারতে চায়, একটু একটু

করে? নেকড়ে অন্য কোথাও নিয়ে যেতে হবে ওকে। হোটেলের ভেতর দরজা ও ওপর দরজার চালানো সম্ভব নয়। আর জোর করে অন্য কোথাও যদি ওকে নিয়ে যাবার ইচ্ছে থাকে, লোকটা একা আসেনি। এতকণে নিজের একটা তুল আধিকার করল রানা। সৈকত থেকে হোটেলের ফেরার সময় এইই চিন্তামা ছিল সে পিছনটা দেখে নেবার কথা মনে ছিল না ওর।

তোয়ালে দিয়ে পা মুছে সেটা কোনরকমে জড়িয়ে নিল ও। পিছল হাতে দরজা খুলে বেরিয়ে এল সিটিং রুম। সেই একই চেয়ারে একই ভঙ্গিতে বসে আছে লোকটা। রানার হাতে পিছল দেখে ক্যাকাসে হয়ে গেল মুখের চেহারা। পরমুহুর্তে মুচকি একটা হাসল সে। 'আহা, কমরেড, সবকিছু কি দরকার ছিল। আমাকে আপনি শত্রু হিসেবে নিচ্ছেন কেন? আমি আপনার শত্রু নই, একটা অনুরোধ নিয়ে এসেছি...'।

কথা না বলে তর্জনী নেড়ে উঠে দাঁড়াবার ইঙ্গিত করল রানা। চেহারায় অসহায় একটা ভাব ফুটিয়ে তুলল লোকটা, কিন্তু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে দেরি করল না। খাড়া তর্জনী দিয়ে পুন্যে একটা ছোট বৃত্ত রচনা করল রানা, এটা ঘুরে দাঁড়াবার ইঙ্গিত। কাঁধ ঝাঁকিয়ে নির্দেশ পালন করল লোকটা। দু'পা এগিয়ে তার পিছনে এসে দাঁড়াল রানা, দ্রুত তল্লাশি চালিয়ে পকেট থেকে বের করে আনল একটা লুগার। পিছিয়ে এসে বলল, 'ফেরো'।

ফিরল লোকটা। ঠোটে বিজ্ঞপের হাসি লেগে থাকলেও চেহারায় অসহায় ভাবটুকু লুকাতে চেষ্টা করল না। 'কোথায় ছিল ওটা?' রানার হাতের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল সে, 'বাথরুমটা তো ভালমতই দেখেছিলাম'।

ভাবাব দিল না রানা। 'নাম?' লুগারটা ছুয়ারে ভরে রাখল ও।

'কোনানিয়েত? ভিক্টর কোনানিয়েত'।

'কে.জি.বি.?'

মাথা ঝাঁকাল কোনানিয়েত।

'তোমার সাথে আর কে কে আছে?'

'আমরা তিনজন এসেছি, বাকি দু'জন এতকণে পৌছে গেছে বাইরের করিডরে। আপনাকে অনুসরণ করে সৈকতে গিয়েছিল ওরা'।

চুপ করে ভিড়ানো দরজার দিকে একবার তাকাল রানা। 'কি চাও তোমরা?'

অলস ভঙ্গিতে একটা পিছিয়ে গেল কোনানিয়েত, আবার বসল চেয়ারে। চেহারায় উদ্বেগের লেশমাত্র নেই। 'আপনি শুধু শুধু বিতর্কিত হচ্ছেন, কমরেড রানা। বিশ্বাস করুন, আমাদের কোন অসং উদ্দেশ্য নেই। আমরা আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাতে এসেছি'।

'তাই?' তুফ নাচিয়ে জানতে চাইল রানা। 'তা উপলক্ষটা কি?'

'তা তিক বলতে পারব না। বড়কর্তা হুতুম দিলেন, বললেন, যাও কমরেড মাসুদ রানাকে এখন আমাদের কাছে ডেকে নিয়ে এসো, আমরা আপনার চলে এলাম'।

'তাক দিলেই আমি যাব, তোমার বড়কর্তা নেটা ধরে নিলেন কিভাবে?'

কোনানিয়েতের নিষ্ঠুর চেহারা আরও অধিক মেশানো কীল একটা রক্তাক্ত হাসি ফুটল, দুটো আঙুলি আঙ্গুরের সুরে বলল সে, 'তিনি জানান, তাঁর আদেশ আমরা মেনে

কোন মূল্যে পালন করি'।

'তারমানে কি নিজের ইচ্ছে না গেলে তোমরা আমাকে জোর করে নিয়ে যাবে?'

দাঁত দিয়ে জিত কাটল কোনানিয়েত। 'জি-জি, এ আপনি কি বলছেন! বড়কর্তার কাছ থেকে জেনেছি, আপনি মহাত্মা স্পর্শকাতর, আত্মমর্য়াদামগ্নেতন ভ্রমলোক। পই পই করে নিষেধ করে দিয়েছেন, আমরা যেন আপনার সাথে কোন বকম অস্ত্র ব্যবহার না করি। তবে সেই সাথে একথাও জানিয়ে দিয়েছেন, আপনার জন্যে তিনি অপেক্ষা করছেন। আপনাকে সাথে করে না নিয়ে গিয়ে আমাদের উপায় নেই'।

'তা, তোমাদের বড়কর্তা কে?'

'আপনার প্ররচিত। কর্নেল কবল'।

নামটা শোনামাত্র বকের বুক চলকে উঠল রানার। অতীতের নানা টুকরো ঘটনার কথা ভিড় করে এল মনে। কে.জি.বি. চীফ জেনারেল তুর্গেই তুর্গেনিভকে নিয়ে কমান্ডার থেকে পালিয়ে আসছিল ও, খবর পেল মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের কর্নেল কবল জেনারেলকে খুন করার জন্যে নিজেই বণ্ডনা হয়ে গেছে। সেবারই প্রথম নিজের চোখে কর্নেল কবলকে দেখতে পায় ও। রানার সাথে এঁটে উঠতে না পেলে শেষে ট্রেন থেকে নেমে পালিয়ে থাকিল দুর্গেই লোকটা। ইচ্ছে করলে ওলি কাপ মেয়ে ফেলতে পারত রানা, কিন্তু অকারণ হত্যায় রুচি সেই বলে সুযোগটা হাতে পেয়েও নেয়নি। সে-সময় রাশিয়ান মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স আর কে.জি.বি.-র মাক্সবানে লিয়াজো অফিসার হিসেবে কাজ করছিল কবল, সবার ধারণা ছিল তুর্গেই তুর্গেনিভ মৃত্ত বিধে পালিয়ে এলে কে.জি.বি.-র চীফ হিসেবে তাকেই মনোনয়ন দেয়া হবে। কিন্তু যে-কোন কারণেই হোক, কে.জি.বি. চীফ হিসেবে তাকে দেখা গেল না। বিফলতা বড় বেশি বেজেছিল কর্নেল কবলের বকে। জানা গেল, তুর্গেই তুর্গেনিভকে রাশিয়া থেকে পালাতে সাহায্য করার অপরাধে রানাকে শাস্য করা প্রতিজ্ঞা নিয়েছে সে। উঠেপড়ে লেগেও গিয়েছিল লোকটা। কিন্তু শত চেষ্টা করেও রানাকে নাগালের মধ্যে পায়নি। বরং রানাই একবার খবর পেল, কি এক কাজে লভনে এসে ফেসে গেছে কর্নেল কবল, ধরা পড়েছে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের একটি শাখা MI5-এর হাতে। সাথে সাথে নিজের প্রত্যাব খাটিয়ে তাকে মুক্ত করে রানা। ভাগ্যিস MI5 কর্নেল কবলের আসল পরিচয় জানতে পারেনি তখনও, জানলে দুনিয়া কাপানো স্ব্যাস্ত্র তৈরি হতো, তুলকালাম কাও ঘটে যেত ব্যাপারটা নিয়ে, মহা বিপদে পড়ত সোভিয়েত পবরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। শেষ হয়ে যেত কর্নেল কবলের ক্যারিয়ার। কে তাকে বাচিয়েছে সে-কথা কর্নেলকে জানাবার কোন চেষ্টা করেনি রানা, কিন্তু খবর নিয়ে আসল ব্যাপারটা নিশ্চয়ই জানতে পেরেছিল সে। সেই থেকে রানার পিছনে লাগা বন্ধ করেছে বটে, কিন্তু রানা তাকে এখনও এককিন্তু বিশ্বাস করে না। এই কর্নেল কবল সম্পর্কে অনেক গল্প শোনা যায়। নানান ঘটনায় লোকটাকে যতটুকু চিনেছে রানা, গরতলো বিশ্বাস করেছে সে। বড়দুর জানা যায়, তার মত সব এক নিষ্ঠুর লোক সোভিয়েত মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সে আর একজনও নেই। দুঁকি নেবার আশ্বই একটা প্রকণতা আছে

লোকটার মধ্যে, ভয় আর বিপদ কাকে বলে জানে না। মৃত্যুর একেবারে লোরগোড়ায় দাঁড়িয়েও লোকটা সম্পূর্ণ ধীর-স্থির আর নিরাক্রিয় থাকতে পারে। তার মত বুদ্ধিমান স্পাইও নাকি গোটা রাশিয়ায় আর একজন নেই। সেই কর্নেল রুবল আজেকিদিনায়, এই রিও গ্যাঙ্গ্রেসে? কেন? এদিকে কোথাও বড়লড় ধরনের কিছু ঘটতে যাচ্ছে নাকি? ওকেই বা হঠাৎ তার দরকার পড়ল কেন? তবে কি প্রতিশোধ নেবার আশা এখনও ছাড়েনি কর্নেল রুবল? মৃত বিপদ থেকে তাকে বাঁচিয়েছিল ও, কথাটা এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেছে?

‘আমাকে কি জানে দরকার তার?’ জানতে চাইল রানা।

‘বলেননি,’ জানাল ভিক্টর কোনানিয়েভ। ‘ওধু বলেছেন, অত্যন্ত জরুরী ব্যাপার, দেরি করলে মৃত্যু ক্ষতি হয়ে যাবে।’

কঠিন একটি হাসি দেখা গেল রানার ঠোঁটে। ‘মৃত্যু ক্ষতি হয়ে যাবে—কারণ?’

‘এই বা, সে-কথা জিজ্ঞেস করতে মনে ছিল না!’ বললই হা-হা করে হেসে উঠল কোনানিয়েভ। তারপর হাসি থামিয়ে বলল, ‘তুনেছি কে.জি.বি.-র ওপর আপনার আস্থা একটি কম। কিন্তু তাই বলে আপনি যদি আমাদেরকে ছোটলোক ভেবে বলেন, আমরা সত্যি সত্যি মনে দুঃখ পাব। আপনাকে দাওয়াত করে নিয়ে গিয়ে অপমান-করার, বা আপনার কোন ক্ষতি করব—এতটা নীচ আমরা নই।’

‘কথা একটি কম বলো,’ বিরক্তির সাথে বলল রানা। ‘কোথায় সে?’

কোনানিয়েভের চেহারা উৎসাহের ভাব ফুটল। ‘এই তো কাছেই, গাড়িতে এখান থেকে পাঁচ-সাত মিনিটের পথ। তাহলে কাপড়-চোপড় পরে তৈরি—’

‘আমি যেতে না চাইলে কি করবে জেমস?’

‘অসহায় বোধ করব,’ গোবেচ্চার ভঙ্গিতে বলল কোনানিয়েভ। ‘কিন্তু যাবেন না-কেন?’

‘কেউ ডাকলেই আমি ছুটব, আমার সম্পর্কে তোমাদের এই তরুণ ধারণা কেন হলো?’

‘যাবেন না, তারমানে কি ধরে নেব ভয় পেয়েছেন?’ পাল্টা প্রশ্ন করল কোনানিয়েভ।

মনে মনে একটা চ্যালেঞ্জ অনুভব করল রানা। যেতে না চাইলে এদের পক্ষে সম্ভব নয় যে জোর করে নিয়ে যাবে ওকে। কিন্তু অনুরোধটা রফা না করলে কর্নেল রুবল মনে করবে, মানুষ রানা ভয় পেয়েছে। আবার গেলেও সাংঘাতিক ঝুঁকি নেয়া হয়ে যায়। গোখরা সাপকেও হয়তো বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু কর্নেল রুবল তারচেয়েও ভয়ঙ্কর। বিধায় পড়ে গেল ও। লক্ষ্য করল, চেহারায় কৌতুক দেখানো কৌতুক নিয়ে ওকে দেখছে কোনানিয়েভ।

‘ঠিক আছে, চলো।’ অনেকটা বৌদ্ধের মাথাতেই বলে বলল রানা। সাধা স্পাই কর্নেল রুবলকে একেবারে কাছ থেকে দেখার সুযোগটা হাতছাড়া করতে মন চাইল না, যেতে চাওয়ার সোটাও একটা কার্য।

‘বনাবাস, কমবেড রানা,’ পুরনো স্বস্তির একটি কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল কোনানিয়েভ। ‘আপনি আমাদের অনেক ঝামেলা থেকে রেহাই দিলেন।’

কথাটা তেমন পছন্দ হলো না রানার। কিন্তু এখন আর পিছিয়ে যাওয়ার উপায়

নেই।

কোনানিয়েভের প্রতিবাদ জানে না তুলে ব্রেফফান্টের অভ্যাস দিল রানা। লুপারটা ফিরিয়ে দিয়ে ধসর বাড়ের একটা স্টাট পরল ও। ব্রেফফান্ট সাবচে ইয়েন্তে করেই একটু বেশি সময় নিল। বলেছে বটে যাবে, কিন্তু সিদ্ধান্তটা নিজেরই পছন্দ হয়েছিল না। এখনও সময় আছে, না করে দেবে নাকি? ইই, সেটা হাস্যকর হয়ে যাবে।

বাকি দুজন করিডরেই অপেক্ষা করছিল। রানাকে নিয়ে নিচে নেমে এল ওরা। হোটেলের বাইরে একটা জাপানি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, রানাকে মাঝখানে নিয়ে কোনানিয়েভ আর অপর একজন লোক বাক সিটে বসল। তৃতীয় লোকটা বসল ড্রাইভিং সিটে। কোনানিয়েভের কাছ থেকে তরুণ পেয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল সে।

তিন মিনিটের মধ্যে শহর থেকে বেরিয়ে এল ওরা। হাইওয়ে ধরে ছুটে চলল গাড়ি। বাস্তব দু’পাশেই ফাঁকা মাঠ, দূরে দেখা গেল পাহাড়ের মাথা। আরও এক মিনিট পর হাইওয়ে ছেড়ে ডান দিকে বাক নিল গাড়ি। ছোট ছোট পাহাড়ের মাঝখানে দিয়ে রাস্তা, কয়েকটা গ্রাম ছাড়িয়ে এসে নির্জন মাঠের এক ধারে ছোট্ট একটা ভিলার সামনে থামল গাড়ি। বন্ধ দরজা ভেতর থেকে খুলে গেল। দারোয়ান লোকটাকে দেখে রানার মনে সংশয়ের মাত্রা বাড়ল বৈ কমল না। একটা ওভার-কোট পরে আছে লোকটা, বাইরের থেকে টের পাওয়া গেল, ভেতরে লুকানো রয়েছে কারবাইন।

ভেতরে ঢুকে গাড়ি-বারান্দায় থামল জাপানি হোজা। রানাকে নিয়ে গাড়ি থেকে ওধু কোনানিয়েভ নামল। গোটা চারেক ধাপ উপরে একটা দরজার সামনে থামল ওরা। কলিং বাটন টিপতেই খুলে গেল দরজা। আরও একজন ওভারকোট পরা লোক দেখা গেল। লোকটার একটা হাত পকেটের গভীরে সৈধিয়ে আছে। চোখে সতর্ক, সন্দিহান দৃষ্টি। একেবারে নিচু গলায় কথা বলল সে, ‘কর্নেল আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন, কমবেড কোনানিয়েভ।’

রানাকে নিয়ে সিটিং রুমে ঢুকল কোনানিয়েভ, সেখান থেকে বেরিয়ে এল লম্বা একটা করিডরে। শেষ মাথায় একটা দরজা দেখা গেল, কবচ খোলা, পর্দা খুলেছে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল কোনানিয়েভ, রানার দিকে ফিরে বলল, ‘ভেতরে যান, কমবেড।’

পর্দা সরতে গিয়েও কি ভেবে ফাস্ত হলো রানা, ঘুরে দাঁড়িয়ে আঙুল নাড়ল, মুখটা কাছে সরিয়ে আনার ইঙ্গিত দিল কোনানিয়েভকে, যেন গোপনে কিছু জানাতে চায়। রানার ঠোঁটের কাছে কান নিয়ে এল কোনানিয়েভ। ঠিক এই অবস্থায় মুঠো পাকানো ডান হাত দিয়ে লোকটার পাজরে ধাই করে একটা ঘুনি কসিয়ে দিল রানা। ছোট্ট এক মূহুর্তেই যাক্সিল কোনানিয়েভ, তার শার্টের কলার ধরে ফেলে আটকে রাখল রানা। বাধায় তো বটেই, বিশ্ময়ও বিহবল দেখাল লোকটাকে। তার নাকের সামনে মুঠো পাকানো হাত নেনড়ে বলল রানা, ‘সেই যদি অনুমতি না নিয়ে আমার কামরায় ঢোকো, এক ঘুনিতে আমি তোমার সব কটা দাঁত ফেলে দেব।’ বলে আর দাঁড়াল না ও, ঘুরে পর্দা সরাল, ঢুকে পড়ল ঘরের ভেতর।

ছোট্ট একটা ঘর। জানালার পাশে মাঝারি একটা ডেস্ক, দু'ধারে একটা করে চেয়ার। সাদা দেয়ালে কোন ক্যালেন্ডার বা পোষ্টার নেই। ডেস্ক আর চেয়ার ছাড়া আর কোন ফার্নিচারও দেখানো না বানো। পায়ে ওপর পা তুলে ওষাধের চেয়ারে বসে আছে একজন লোক। কামড়ে ধরে আছে একটা টোব্যাকো পাইপ। শান্ত, নিরুদ্ভিগ। এত সামনে থেকে এই প্রথম দেখছে বানা, তবু বুঝতে অনুবিলে হলো না, এই লোকই সেই দুর্ভাগ্য 'স্পাই-কর্মকর্তা' কর্নেল ক্রবল।

বানাকে দেখে লোকটার চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল, যেন অনেক দিন পর প্রিয়জনকে দেখে আন্তরিক খুশি হয়েছে সে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, কঁনল, 'আসুন, মিস্টার মাসুদ বানা!'

করদারনের হাতে লোকটাকে ধঁটিয়ে দেখে নিল বানা। মাঝারি গড়ন, 'স্বাস্থ্য' অত্যন্ত ভাল, বয়স প্রকাশ কি বাহান, কপালটা গম্বুজের মত। চিবুকা ভোঁতা, দেখে ধারণাই করা যায় না এই লোক প্রচণ্ড মানসিক শক্তির অধিকারী।

'বসুন,' বলল লোকটা। 'আমাকে বা আমার ফটো দেখেননি আপনি, কাজেই পরিচয় দেবার দরকার আছে, কি বলেন? আমি ক্রবল।'

ডেস্কের এধারের একমাত্র চেয়ারটায় বসল বানা। 'দরকার ছিল না,' বলল ও। 'লোকের পেছনটা তেঁখে সামনেটা কেমন হবে আন্দাজ করতে পারি আমি।'

'কবে? কোথায়?' সংক্ষেপে জানতে চাইল কর্নেল ক্রবল।

'আটলান্টিক এক্সপ্রেস থেকে নেমে পালিয়ে যাচ্ছিলেন...'

'দেখে ফেলেছিলেন?' ডুর কুচকে উঠল দেখে বোঝা গেল বেশ একটা অরাক হয়েছে কর্নেল। 'কিস্তি...'

'কিন্তু গুলি করিনি কেন, এই তো? করিনি, কারণ, আপনি আমাকে শত্রু মনে করলেও আমি আপনাকে ঠিক তা ভাবতে পারিনি। আমি আমার দেশের কাজ করছিলাম, আপনি করছিলেন আপনার। ভাগ্যক্রমে তখন আমরা কিংক্স দলের হয়ে খেলছিলাম। তারমানে এই নয় যে আপনাকে দেখলেই আমার গুলি করতে হবে। তাছাড়া আমি-জানি ওই একটা জিনিস মেবে শেষ করা যায় না—শত্রু। একজনকে মারলে তার জায়গায় আরেকজন আসে। কাজেই এটাকে খেলা হিসাবে নেয়াই আমার পছন্দ। তাছাড়া, সব যদি মেবে শেষ করে ফেলি, শক্তি পরীক্ষাটা হবে কার সঙ্গে? বুদ্ধিমান শত্রুকে মেবে ফেলার মত বেরনিক আমি অস্বস্তি নই।'

'প্রশংসার জন্যে ধন্যবাদ,' মুচকি একটা হাসল কর্নেল ক্রবল। চেয়ারে বসে হাতের পাইপটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল সে। 'ডাক দিতেই চলে এনেছ, সৈজানো আমি সম্মানিত বোধ করছি, বানা। লেটলু বি ফ্রেডস—ও-কে? কি বাবে বলো। মন তো ছেড়ে দিয়েছি—কফি, না চা?'

'নাওয়াত করে নিয়ে এসে শুধু কফি বা চা? শুনেছি তোমাদের আর্থিক অবস্থা সলিমে থাকছে না, কিন্তু এতটা ব্যাপার খাবা করিনি। পানান, এসব কিছু লাগবে না।' রিট-ওয়াচ দেখল বানা। 'ফটো দেড়েকের মধ্যে ফ্লাইট করতে হবে। কেন ডেকেছ বলো।'

'ফ্লাইট? কোথায় যাব? জরুরী কোন কাজ?' কেমন যেন চিত্তিত দেবাল কর্নেলকে।

'দেশে ফিরব। খুব জরুরী কোন কাজ নেই, কিন্তু পরিমাণে অনেক বলে ফিরে যাওয়াটা খুব জরুরী। কেন?'

'তোমাকে আমার একটা অনুরোধ রাখতে হবে,' অত্যন্ত সার্বভানে, ভেবেচিন্তে বলল কর্নেল। সারাক্ষণ কি যেন বুজছে বানার মুখে। 'ইহাৎ একটা টেকার পড়ে গেছি, তোমার সাহায্য দরকার।'

'কে.জি.বি, আমার সাহায্য চাইছে? তুমি দেখছি হাসালে!'

'না, বানা, হ্যাঁ নয়।' সিরিয়াস দেখাল কর্নেলকে। 'নেহাত বেকায়দায় না পড়লে এভাবে তোমার সাহায্য চাইতাম না...'

'তোমরা বেকায়দায় পড়তে তো আমার কি?' বলল বানা। 'সময় অসময়ে বেকায়দায় তো আমাদেরকে পড়তে হয়, কই, আমরা কখনও তোমাদের সাহায্য চেয়েছি?'

'কেমন যেন ধমকে গেল কর্নেল। বানা এই স্বকম আক্রমণাত্মক ডব্লি নেবে তা যেন সে আশা করেনি। 'চাওনি, চাইলে হয়তো পেতে,' বলল সে। 'আমরাও এতদিন চাইনি, কিন্তু এখন ভাবছি, চাইলে হয়তো পাব। অতীতের কথা মন থেকে মুছে ফেলে আমরা তো পারস্পরিক সহযোগিতার একটা ক্ষেত্র প্রস্তত করতে পারি...'

ট্রাফিক পুলিশের মত একটা হাত তুলে কর্নেলকে থামিয়ে দিল বানা। 'রকে করো। এত বড় বড় বুলি আমার ধাতে সয় না।'

একটু যেন লালচে হয়ে উঠল কর্নেলের চেহারা। 'অস্বস্তি বিপদটা কি সেটা তো ওনবে?'

'কোন আগুহ নেই,' পরিষ্কার জানিয়ে দিল বানা। 'ক্যামেলার কোন ব্যাপারে নিজেকে আমি জড়াতে চাই না এই মুহুর্তে।'

'কেন?' খুব নরম সুরে প্রশ্ন করল কর্নেল ক্রবল।

'তোমার এই প্রশ্নের উত্তর দিতেও রাজি নই আমি।'

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ কাঁকাল কর্নেল, কিন্তু সাথে সাথে কিছু বলল না। একটু পর ধীরে ধীরে শুরু করল সে, 'এমন তো নয় যে কারও অনুরোধই তুমি রাখো না। যুক্তরাষ্ট্রের কথাই ধরো। ওদের অনেক কাজ তুমি করে নিয়েছ। আমরা কি অন্যায় করলাম?'

'পছন্দ-অপছন্দের একটা ব্যাপার আছে, সেটা তুমি ইচ্ছে করে তুলে যাব। তবে আসল কথা সেটা নয়। আমি আমার দেশের স্বার্থে কাজ করি, তুমি জানো। ওদের কাজ করে দিলে যখন আমাদের কিছু স্বার্থ উদ্ধার হয়...'

বানার কথাটা যেন লুফে নিল কর্নেল। 'সে প্রশ্নের তো আমারও? তুমি আমাকে সাহায্য করলে বিনিময়ে আমিও তোমাকে...'

'ধন্যবাদ, তোমার সাহায্য আমার দরকার নেই।' আবার রিট-ওয়াচ দেখল বানা। 'এবার আমাকে উঠতে হয়।'

'ট্রীজ, বানা।' কর্নেলের চেহারায় আবেদনের ভাব ফুটি উঠল। 'অতীতে যা ইবার হয়েছে—আমি তোমার পেছনে পোশেছি, তুলে যাও; তুমি আমাকে খোলাপানি খাইয়েছ, তা নিয়েও আমার মনে কোন রাগ নেই। আমার সাথে বন্ধুত্ব করলে

তোমার ক্ষতি নয়, লাভই হবে। অতঃপর নমস্কাট কি সেটা একটু মন দিয়ে শোনো।

ব্যাপারটা কি জানলে ক্ষতি নেই, তাবল রানা। ঠিক আছে। কিন্তু কম কথায়। আর, ওনারে রাজি হওয়ার মানে এই নয় যে তোমার কোন কাজ আমি করে দেব।

মিলক করে উঠল কর্নেলের মুক্তোর মত দাঁত। হাসিটা ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। বলল, 'তোমার তো জানার কথা, সহজে হাল ছেড়ে দেয়ার পাত্র আমি নই।' এটা যে একটা প্রত্যাশা হুমকি সেটা রানাকে বুঝতে দেবার জন্যে এক সেকেন্ড চুপ করে থাকল সে। তারপর শুরু করল, 'শোনো তাহলে। নর্থপোলে আমাদের একটা ওয়েনার স্টেশন আছে। নাম, ড্রিফট স্টেশন নভেলি। ওদের কাছ থেকে একটা এস. ও. এস. পাওয়া গেছে, তারপর আর কোন সাড়া-শব্দ নেই। মানবতার খাতিরে হলেও ওদেরকে উদ্ধারের জন্যে তুমি যদি একটা চেষ্টা করো—'

'এর মধ্যে বেকায়দাটা কোথায়? তোমরা একটা সুপার-পাওয়ার, চাইলেই সব হাতের কাছে পেয়ে যাও—একটা রেসকিউ টীম পাঠিয়ে নিলেই তো পারো।'

'তা পারি। পাঠাচ্ছিও। কিন্তু সেই টীমের সাথে তোমার মত একজন মানুষের স্পাই দরকার আমাদের। কেন দরকার সে কথা তোমাকে আমি পরে বিস্তারিত জানাব। এর মধ্যে আরও কিছু ব্যাপার আছে। মুশকিল হয়েছে, দরকারের সময় হাতের কাছে উপযুক্ত লোক পাচ্ছি না আমি যার ওপর নির্ভর করা যায়। হাতে সময়ও কম। সেজন্যেই তোমাকে এত করে—'

'এবং আমি সেটা পছন্দ করছি না,' বলে উঠে দাঁড়াল রানা। 'ডেকে নিয়ে এসে চা অফার করো, সেজন্যে ধন্যবাদ। চললাম।'

রানা ঘুরে দাঁড়াতে যাবে, এই সময় চেয়ার ছেড়ে দ্রুত উঠে দাঁড়াল কর্নেল। 'প্রীজ, রানা! আমাকে এভাবে অবহায় অবস্থায় ফেললে চলে যেয়ো না!'

হেসে ফেলল রানা। 'আরে! তুমি দেখছি ভাল নাটকও জানো!' ধীরে ধীরে জান হতে হতে হাসিটা চেহারা থেকে মিলিয়ে গেল। 'সুশিক্ষিত, কর্নেল কর্নেল। আমি তোমার কোন কাজে লাগছি না।'

কর্নেলের চেহারা থেকে শুধু আবেদন নয়, সমস্ত ভাবাবেগের ছাপ মুছে গেল। অদ্ভুত শান্ত আর ঠাণ্ডা দেখাল তাকে। রানার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে আশট্রেতে পাইপের ছাই ঝাড়তে শুরু করল সে। 'নোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, সেটা চলে সরিয়ে দেওয়া কি বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে, রানা?' সম্পূর্ণ শান্ত সুরে জানতে চাইল সে।

'জানতাম, এবার তুমি হুমকি দিয়ে কথা বলবে।'

'ধরো, তোমাকে আমি যদি বিদায় না দিই?' আশট্রে থেকে রানার চোখে তাকাল কর্নেল। 'এমন সুরে প্রশ্নটা করল যেন রানার কথা ওনারেই পায়নি।'

'আমার অনুমতি ছাড়া এই চিন্তা থেকে কেউ বেরিয়ে যাবে পারবে না।'

জোর করা হাসিটা রানার মুখে মানিয়ে গেলো, 'এর হাতের তালু বামডে ভঙ্গ করেছে। রেসে গেছে ও। এই তো, হলে যাচ্ছি আমি, পাবলে বাধা নাও।' বলেই ঘুরে দাঁড়াল রানা। না পায়ে এগোল দরজার দিক।

শিরদাঁড়া বরাবর শিরশায়ে একটা অনুভূতি নিয়ে দরজার কাছে পৌঁছে গেল।

রানা পিছন থেকে কর্নেল বলল, 'এক সেকেন্ড, রানা। দেখো তো, এদেরকে চিনতে পারো কিনা?'

ঘুরে দাঁড়াল রানা। দেখল, ডেস্কের ওপর একটা এনভেলপ রয়েছে, সেটা খুলে ভেতর থেকে একটা ফটো বের করছে কর্নেল কর্নেল। 'জিঙ্কস কর্নেল, 'কার ছবি?'

'কার নয়, বলো কাদের। এদেরকে আমার চেয়ে তুমিই ভাল চেনো। চলে তো যাবেই, যাবার আগে একবার চোখ বুলিয়ে যাও, প্রীজ।'

ডেস্কের কাছে ফিরে এল রানা। অনুভব করল, হার্টবিট বেড়ে গেছে ওর। 'অসম্ভব দ্রুত এই কর্নেল কর্নেল। কে জানে কি পরবর্তী বুদ্ধি এটে নসে আছে।'

কর্নেলের হাত থেকে ফটোটা নিল ও। একটা পরিবারের ছাপ ফটো। মা-বাবা আর দুটা শিশু সন্তান। প্রথমটায় চিনতে পারল না রানা, পরমুহূর্তে ঝট করে তাকাল কর্নেলের দিকে। 'আজামাত কিরিম, তার স্ত্রী আর ছেলেমেয়ে এরা। তাসখন্দে থাকে। এদের ফটো আমাকে দেখাবার উদ্দেশ্যে?'

'সত্যি-মিথো জানি না, কেউ কেউ বলে এই আজামাত কিরিম নাকি একবার তোমার প্রাণ বাঁচিয়েছিল। কি একটা অ্যানাঈনমেটে তুমি বোধহয় একবার তাসখন্দে গিয়েছিলে, তাই না? একদল ইসরায়েলি এজেন্ট তোমাকে ধাওয়া করেছিল, শেষ মুহূর্তে তুমি ধরাও পড়ে গিয়েছিলে। তাদের হাত থেকে উদ্ধার পেতে এই আজামাত কিরিম আর তার স্ত্রী নাকি তোমাকে সাহায্য করে। কথাটা সত্যি?'

এক সেকেন্ড চিন্তা করেই বুঝল রানা, ঘটনাটা পুরোপুরি জানে কর্নেল। 'চোপে যাবার চেষ্টা করে লাভ নেই। বলল, 'সত্যি।'

'আমি তাহলে ধরে নিতে পারি, যদিও কণ অনেক আগেই পরিশোধ করেছে, এই আজামাত কিরিমের প্রতি তুমি এখনও কিছুটা কৃতজ্ঞ—পরিবারটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ প্রীতি বন্ধনে আবদ্ধ?'

'সে-সব তোমার কোন ব্যাপার নয়,' কঠিন সুরে বলল রানা। 'ওদের ফটো আমাকে দেখানোর পিছনে তোমার উদ্দেশ্যটা কি?'

'আজামাতের স্ত্রী জানতে চায়, তার স্বামী বেঁচে আছে কিনা। আর বেঁচে না থাকলে, স্বামীর লাশটা সে শেষ একবার দেখতে পাবে কিনা।'

'চোখ-মুখ কঠোর, ধমধমে হয়ে উঠল রানার। 'পরিষ্কার করে বলো।'

'স্টেশন নভেলিতে অনেক লোক আছে, তাদের মধ্যে একজন হলো আজামাত কিরিম,' বলল কর্নেল। 'বিপদ হয়েছে টের পেয়ে কান্নাকাটি করেছে ওর ছেলে-মেয়েরা। টেলিফোনে ওর স্ত্রীর সাথে কথা হয়েছে আমার। তোমার কথা শুনে বলল, মানুষ রানা তাদের এই বিপদের কথা শুনে চুপ করে বসে থাকতে পারবে না।'

কয়েক সেকেন্ড নিঃশব্দে কর্নেলের দিকে তাকিয়ে থাকার পর ধীরে ধীরে চেয়ার টেনে বসে পড়ল রানা। এই শীতেও ঘাম চিকচিক করছে ওর কপালে। 'নিচু গলায় বলল, 'সব কথা খুলে বলো আমাকে।'

'ঠিক বুঝতে না পেরে জানতে চাইল কর্নেল, 'সব কথা জানে?'

'তোমাদের স্টেশন নভেলি সম্পর্কে। স্টেশনটার কাজ কি? কারা আছে

ওখানে? এস. ও. এল. এ. টি জানানো হয়েছে? যা জানো সব।

‘তারমানে কি...’ কেমন যেন বিহবল দেবাল কর্নেলকে, ‘তোমার সাহায্য পাচ্ছি আমি?’

‘না,’ শান্ত সুরে বলল রানা। ‘তোমাকে নয়, আজামাত কিরিনকে সাহায্য করব আমি। সম্ভব হলে। তবে তার আগে আমার জানতে হবে এর বিনিময়ে তোমাদের কাছ থেকে কি উপকার আশা করতে পারে আমার দেশ।’

বিজয়ের আনন্দে কর্নেলের চেহারা উজ্জ্বলিত হয়ে উঠল না। এতই অরাক হয়েছে সে, রানাকে ধন্যবাদ দিতেও ফুলে গেল। একদৃষ্টিতে রানার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভাবল, মাসুদ রানা সম্পর্কে যা শুনেছি তা দেবছি যোলো আনা সত্য। কিন্তু যার মন এই রকম কোমন, অনেক আগেই মারা পড়া উচিত তার, কিভাবে সে স্পাই হিসেবে এত নাম করে? এই বরষোর কোন কিনারা করতে পারল না কর্নেল কর্নল।

কিন্তু সময় নষ্ট করল না, নড়েচড়ে বসে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে শুরু করল সে। খুঁটিনাটি বাদ দিল না কিছুই।

দুই

পোল্যান্ড।

বন্দর শহর গদানস্ক থেকে উত্তর-পশ্চিমে চলে গেছে রাস্তাটা। একদিকে বালটিক সাগর, একজোড়া রাশিয়ান গানবোট টহল দিয়ে রেজাচ্ছে। আরেক দিকে গভীর বনভূমি, গাছপালায় ফাঁকে ত্রিভুজ আকৃতির তাবু আর সামরিক ইউনিফর্মের নড়াচড়া টের পাওয়া যায়। সোভিয়েত দূতাবাসের একটা পাড়িতে রয়েছে রানা, সাথে বিশেষ অনুমতি-পত্রও আছে, তবু সিকিউরিটির কড়াকড়ি ওর জন্যে এতটুকু শিথিল করা হলো না। কমপিউটার তার ভাঁড়ারে ওর ছবি ও আঙুলের ছাপ আগেই যোগাড় করে রেখেছে, প্রথম চেকপোস্টে ওকে গামিয়ে দলা তোলা আঙুলের ছাপের সাথে মেলানো হলো আগের ছাপ। এরপর প্রতি আধ মাইল অঙ্কর একটা করে চেকপোস্ট, পাঁচ মাইল পেরোতে দশবার থামতে হলো ওকে। পোল্যান্ডের ভেতর সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রাইভেট রাস্তা এটা, সোভিয়েত নৌ-বাহিনীর লোকজন ছাড়া আর কারও বাবহানের অনুমতি নেই। রাস্তার শেষ মাথায় ওদের সাবমেরিন ঘাটি। কিন্তু এত কড়াকড়ি সত্ত্বেও ডিপলোমাটিক ব্যাপের লেনকে সাঁটা থাকায় রানার বিস্কেকসটা খুলতে পারল না ওরা।

বেশিদূর দেখা যায় না, ডিমেল সাঁতাসের সাথে তুমার কপার ছুটোছটি দৃষ্টিপথকে রাপসা করে তুলেছে। পত্রপত্র করে সোভিয়েত পনাকা উড়িয়ে ছুটে চলল গাড়ি। খানিক দূর থেকে দেখা গেল বিশাল কিসায়েনর নিচে সাবমেরিন ঘাটির খোলা গেট। গেটের দু’পাশে দু’সারিতে দাঁড়িয়ে আছে চৌকো দুখো, পতাকাশলি

মিলিটারি পুলিশ। এবার অবদমত শীত পড়েছে ইউরোপে, প্রত্যেকের পরনে ভারী ওভারকোট। ওভারকোটের চওড়া কাঁধে ঝুলছে চকচকে কারবাইন। দু’সারি মিলিটারি পুলিশের ঠিক মাঝখানে থামল গাড়ি। দ্রুত নামল সিভিল ড্রেস পরা শোকার, পালেন্ডার সীটের দরজা খুলে দিয়ে সসম্মানে অপেক্ষা করতে লাগল সে। গাড়ি থেকে নামার সময় তার কাছ থেকে নিখুঁত একটা স্যানিট উপহার পেল রানা। কিন্তু লক করল, তাতে করে মিলিটারি পুলিশদের পাথরে খোঁচাই করা চেহারা বা হিম-শীতল চাহনিতে কোনরকম ভাবান্তর ঘটল না। বিশালদেহী না হলোও, বুদে লিলিপুটিয়ানও নয় রানা, তবু এদের সামনে নিজেকে তার মেহাতই ছোট আর নুর্বল বলে মনে হলো। শির উচু করে দাঁড়িয়ে আছে যেন বজ্র-মাংসের এক একটা মতিঝিলের ডি আই টি রিস্তা। সন্দেহটা আবার একবার উঁকি দিল ওর মনে—অনুবোধে ঢেকি ফিলতে দিয়ে ভয়ঙ্কর কোন ফাঁদে পড়ে যাবনি তো সে?

টেলিফোনে আগেই রানার পরিচয় এবং আসার খবর জেনেছে, তবু সমস্ত কাগজ-পত্র খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল মিলিটারি পুলিশ। হাত বদল হতে হতে সিকি মাইল দূরে চৌকো একটা বিল্ডিংয়ের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল সেগুলো। একটু বিরক্ত হলোও, আশ্চর্য হলো না রানা। এই সাবমেরিন ঘাটিতে স্বদেশী সিভিলিয়ানদেরই প্রবেশ নিষেধ, তার ওপর রানা একজন বিদেশী নাগরিক। ওকে তো সন্দেহের চোখে দেখা হবেই।

দশ মিনিট পর কাগজ-পত্র ফিরে এল। তরুণ একজন মিলিটারি পুলিশের সাথে হুড খোলা একটা জীপে চড়ল রানা। দূতাবাসের পাড়টাকে এতক্ষণে নিজের ঠিকানায় ফিরে যাবার অনুমতি দেয়া হলো। মাইল দু’য়েক পেরিয়ে জীপ এসে থামল একেবারে বালটিক সাগরের কিনারে। সামনেই জেটি। জেটির শেষ মাথায় মিশমিশে কালো কি যেন একটা ডেসে আছে, দেখতে অনেকটা তিমি মাছের পিঠের মত। রানা বুঝল, এই হলো লেনিনগ্রাদ—আণবিক শক্তিস্থান রাশিয়ান আধ-মেরিন।

একপাশে কাঁচ দিয়ে ঘেরা সারি সারি অনেকগুলো অফিস কামরা, পাড়ি থেকে নেমে সেদিকে এগোবার সময় একবার থামল রানা। দৃষ্টি এবং মনোযোগ দুটোই সাবমেরিনের ওপর। এই প্রথম একটা রাশিয়ান নিউক্লিয়ার সাবমেরিন দেখেছে ও আর সব সাবমেরিনের সাথে এর প্রায় কোন মিলই নেই। লম্বায় এটা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার দূর-পাল্লার সমুদ্রগামী সাবমেরিনগুলোর মতই, মিল বলতে এইটুকু। ভায়ামিট্যের দিক থেকে আর সব ভুবোজাহাজের ত্রিভুজ এটা। প্রচলিত সাবমেরিনের চেহারায় বোট-বোট একটা ভাব থাকে, কিন্তু লেনিনগ্রাদ নিখুঁত একটা টিউবের মত দেখতে। ইংরেজী অক্ষর ‘ডি’ আকৃতির বো নহ, এর নাক তান ঠিক ত-গোলকের অর্ধেক। বো থেকে একশো ফিট পিছনে প্রকৃত কনি-টাওয়ার, ঠেক ছাড়িয়ে বিশ ফিট পর্যন্ত উঠে গেছে। টাওয়ারের নানানমাথি দূরত্ব, গা বুড়ে জান দিকে বেবিয়ে এসেছে মোটা খাটো শক্ত চেহারা অকজিলারি ডাইভি জেন্ডলো। একটু এগোচ্চ আরও পিছনে কি আছে দেখতে পেত ও, কিন্তু ইৎসার বোধ করল না। গায়ে ওভারকোট নেই, ঠাণ্ডায় হি-হি রক্ত করেছে।

জীপ ঘুরিয়ে নিয়ে গেটের দিকে ফিরে গেছে মিলিটারি পুলিশ। ডিমেলেরা আর

বদল করে সারি সারি অফিস কামরার দিকে এগিয়ে রান্না। প্রতিটি দরজায় একটা করে নেমপ্লেট। কমান্ডার রাইকড লেখা নেমপ্লেটটা খানিক দূর থেকেই দেখতে পাওয়া গেল। কাঁচের দেয়াল ভেদ করে ভেতরে ঢলে গেল দৃষ্টি। এক কোণে ডেস্ক আর কাঠের চেয়ার, আরেক কোণে এক সেট সোফা। তিনজন লোককে দেখল রান্না। তিনজনই প্রকাণ্ড, যেন একই গরিলা পরিবারের সদস্য। নিজেদের মধ্যে কি নিয়ে যেন হাসাহাসি করছে ওরা। দরজায় সামনে এসে দাঁড়াল রান্না, একটু চাপ দিতেই খুলে গেল সেটা। হাসি আর কথা ধেমসে গেল, প্রত্যেকটি গরিলা ষাড় ফিরিয়ে তাকাল ওর দিকে।

ভেতরে ঢুকল রান্না। তিনজনের একজন উঠে দাঁড়িয়ে ডান হাতটা লম্বা করে দিল। 'ড. মাসুদ রান্না?' ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল রান্না। 'আমি লেফটেন্যান্ট ইউরিক রুস্তভ, লেনিনগ্রাদের একজন এম্বুলিকিউটিভ।' ডান পাশে বসে লোকটাকে হাঁকিতে দেখাল সে। 'ডিক্টর পিনি, অফিসার।' তারপর ফিরল বা দিকে। 'ম্যাক্সিম গ্যাকো, অফিসার। আপনার অপেক্ষাতেই আমরা এখানে বসে। আমাদের কমান্ডার একটু ব্যস্ত আছেন, সেটা মিটিয়েই আপনার সাথে কথা করবেন। বসুন, ড. রান্না।'

পিনির সাথে হাতশেক করে গ্যাকোর দিকে তাকাল রান্না, ডান হাতটা নিজের অজান্তেই এগিয়ে গেল তার দিকে। প্রায় একই সাথে বিষম দুটো শব্দা খেলো রান্না। প্রথমে লক করল, ম্যাক্সিম গ্যাকো ওর বাড়ানো হাত ধরার জন্যে নিজের হাত বাড়িয়ে দেয়নি। লোকটা কেমন যেন বিহ্বল চোখে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। তার দৃষ্টিতে ধীরে ধীরে অবিশ্বাসের ভাব ফুটে উঠল। পরক্ষণে লোকটাকে চিনতে পারল রান্না, এবং সেই সাথে প্রমাণও হল। সর্বনাশ, এ-বাটা তো হাতে হাঁড়ি ভেঙে দেবে।

যেন রান্নার মনের কথা ধরতে পেয়েই মুচকি একটু হাসল গ্যাকো। রান্নার বাড়ানো হাত ধরে একটা ঝাঁক দিয়ে বলল, 'আমরা চেনা একজন লোকের সাথে আপনার চেহারার অভূত মিল আছে, ড. রান্না। তাই কৃত দেবার মত চমকে উঠেছিলাম। বসুন, বসুন।'

ঘটনাস্থিতির পরিবর্তন মনে আছে রান্নার। নয়ামিড্‌রী, সোলজিয়েত দূতাবাস। সমস্ত আলো নিষ্কেষ্ট অচল করে দিয়ে দূতাবাসের ভেতর ঢুকে পড়েছিল ও। উদ্দেশ্য ছিল একটা ফাইল চুরি। ফাইল নিয়ে বেরিয়ে আসার সময় এই গ্যাকোর হাতে ধরা পড়ে যায় ও। ধস্তাধস্তির পর জড়োয় পাঁচো কাঁচ করে গ্যাকোকে একটা বাথরুমের ভেতর বেধে রেখে বেরিয়ে এসেছিল ও। তার মুখে ক্রমাল গুঞ্জে দেবার আগে গ্যাকো বলেছিল, বেঁচে থাকলে আবার আমাদের দেখা হবে, প্রতিশোধের জন্যে তৈরি থেকে।

দেখা হবি তো হ, কিন্তু এই জায়গায়? যোগানে ওর ভাবের হুদ-পরিচয়টা বজায় থাকা সহজত। কেবলই খারাপ হয়ে গেল, কিন্তু চেহারাটা সোম প্রকাশ করল না রান্না। গ্যাকো এ ওকে চিনতে পোতছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এখন মুখ ফুটবে কিনা সেটাই বলাই বিহীন।

হৃদযন্ত্রের পায়ের কাছে গেলে ওদের তিনজনের সামনে একটা সোফায় বসল রান্না। তারপর এক এক করে তিনজনের দি হ তাকাল। লেফটেন্যান্ট রুস্তভের

লেনিনগ্রাদ-১

চেহারা বুদ্ধির দীপ্তি আছে; গ্যাকোর চেহারা আছে কর্কশ, নিষ্ঠুরতার ছাপ; আর পিনির চোখে-মুখে ফুটে আছে শিশুর সারলা। শুধু গরিলা নয়, হাসি-খুশি একটা পরিবার—একটু পরই তার প্রমাণ পেল রান্না।

'এক মিনিট,' চিত্তিত্ত উদ্ভিতে মাথাটা একটু কাত করে কি যেন ভাবতে শুরু করল লেফটেন্যান্ট। 'একটি জটিল অঙ্ক কয়ছি।'

রান্না লম্বা করল, হাসি চেপে রাখার চেষ্টা করছে পিনি। আর গ্যাকো সন্দেহকে তাকিয়ে আছে লেফটেন্যান্টের দিকে।

'ইউরেকা!' লেফটেন্যান্টের চেহারা যেন আনন্দের বিস্ফোরণ ঘটল। 'হিসেব মিলে গেছে।' তর্জনী নেড়ে রান্নাকে একটু সামনে বৃঁকে আসতে ইঙ্গিত দিল সে। 'আমি ধরেই নিছি তুমি ডাক্তার— মানে, কণী মাঝে। বয়সে আমি তোমার চেয়ে বড়, কিন্তু পেশায় তুমি আমার চেয়ে বড়। ডাক্তার তবু দিলে নিজের পেশাব পর্যন্ত খেতে হয়, ইয়াকি নয়? তারমানে, আমরা সমান সমান, কেউ কারও চেয়ে ছোট বা বড় নই। কাজেই তোমার ভাণ্ডে শিকে ছিড়ুক বা না ছিড়ুক, তুমি আমার বন্ধু, পরস্পরকে আমরা তুমি বলে সম্বোধন করব। ঠিক আছে?'

হেসে ফেলে মাথা ঝাঁকাল রান্না। লেফটেন্যান্টের বলার উদ্ভিতে কৌতুক আছে, কিন্তু স্মৃতি নেই।

'আপনার অঙ্কে অবশিষ্ট নেই, কিন্তু আমাদের অঙ্কে আছে, লেফটেন্যান্ট,' সরল চেহারার পিনি এক গাল হেসে বলল। 'আমাদেরকে ভয় পাবার কোন কারণ নেই ডাক্তারের, কিন্তু ডাক্তারকে ভয় পাবার যথেষ্ট কারণ হয়ে গেছে আমাদের। উনি কারও ওপর অসন্তুষ্ট হলেই তাকে ধরে-বেঁধে ততো কুইনাইন খাওয়াতে পারেন, ইন্জেকশন দিতে পারেন, অথবা এই শীতের দিনে পায়ে বালতি বালতি পানি ঢালতে পারেন। শখ চাপলেই ভয়ঙ্কর আরও অনেক কিছু করতে পারেন উনি, কাজেই ওকে আমরা আপনি বলে সম্মান দেখাব, আর আবদার করব, উনি যেন আমাদেরকে ছোট ভাই হিসেবে দয়া করে তুমি বলেন।'

লেফটেন্যান্ট রুস্তভ আর গ্যাকো দু'জনেই হেসে উঠল। হাসি ধামিয়ে গ্যাকো বলল, 'বোকার মত কথা বলিস কেন, পিনি? ডা. মাসুদ রান্না বয়সে আমাদের চেয়ে ছোট বা সমান সমান হবেন, বড় তো হতেই পারেন না।' রান্নার দিকে ফিরল সে। 'এত অঙ্ক বয়সে আপনি ডিগ্রী নিলেন কিভাবে?' তার চোখের দৃষ্টি তাঁক, অনুসন্ধিসূ হয়ে উঠল। চেহারায় অবিশ্বাস।

'চেহারা দেখে সবার বয়স আন্দাজ করা যায় না,' বলল রান্না। 'আমি উপযুক্ত বয়সেই ডিগ্রী নিয়েছি। এবং তোমাদের চেয়ে বড়ই হব।'

চমৎকার একটা ঘরোয়া ভাব আছে পরিবেশটায়, দু'মিনিটের মধ্যে রান্নাকে ওরা আপন করে নিল। অন্য সবার চেয়ে ওকে একটু বেশি করে এবং জটিলে লক করেছে বটে গ্যাকো, কিন্তু সবার হাসির সাথে সে-ও প্রতিবার গলা মেলাল, দু'একটা কৌতুক করতেন পিছিয়ে থাকল না, যেন রান্নার ওপর কোন কালেই কোন রাগ বা আক্রোশ ছিল না তার। কক্ষার ফাঁকে এক সময় কিউওয়াচ দেখল রান্না। চারটে পঞ্চাশ, আরেকটু পরেই সাড়ে নামবে। ঠিক সাড়ে চারটের সময় লেনিনগ্রাদের কমান্ডার নিউ রাইকডকে টেলিফোন করার কথা কবলেন। অবশ্য

লেনিনগ্রাদ-১

১৯

রানা যে আসছে সে-খবর কার্টেনকে আজ বিকেলের আগেই জানানো হয়েছে।
ওদের কথা শেষ হতে কতক্ষণ লাগবে বলা কঠিন। লেনিনগ্রাদের কমান্ডার হিসেবে
লিউ রাইকভ শুধু ডিরেক্টর অব আভারসী ও অরফেয়ারের নির্দেশ মানতে বাধ্য
কর্নেল কবল কে.জি.বি. এবং মিনিটারি ইন্সপেক্টরের প্রতিনিধি হিসেবে যে
অনুরোধটা তাকে করবে সেটা তিনি কক্ষ করবেন এমন আশা খুবই কম। আরোহী
হিসেবে রানাকে তিনি লেনিনগ্রাদে নিতে চাইবেন বলে মনে হয় না। সব কথা যদি
স্বিপারকে বলে বলতে পারত কবল, তাহলে তাঁর সম্মতি আদায় করা হয়তো
কিছুটা সহজ হত, কিন্তু গোপনীয়তার ব্যাপারে আসাইনমেন্টের অঙ্গল উদ্দেশ্য
নির্দিষ্ট একটা সময় পর্যন্ত চেপে রানার দরকার আছে। কমান্ডারকে সাজি করাবার
জানো শেষ পর্যন্ত হয়তো কবলকে মস্তুর সাথে যোগাযোগ করতে হবে। তাতে
সময় লাগবে বেশি। শেষ পর্যন্ত কি হয় বলা মুশকিল। রানাকে যদি নিরাশ হয়ে
ফিরে যেতে হয়, তাতেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। নিউক্লিয়ার সাবমেরিনের
কার্টেন হিসেবে কমান্ডার লিউ রাইকভের নিজস্ব একটা ক্ষমতা আছে, সেখানে
কর্নেল কবল পাশা নাও পেতে পারে।

'খুব তাড়া পড়েছে, তাই না?' সিগারেটের ধোঁয়া প্যাকেটটা রানার সামনে
বাড়িয়ে ধরে বলল লেফটেন্যান্ট, 'নাও।'

'ধন্যবাদ, আমার চলে না,' বলল রানা। 'আপত্তি না থাকলে আমার তরফ
থেকে কক্ষ খেতে পারো সবাই। আসার পথে কাজেগিটে কোথাও একটা ক্যাফে
দেখেছি।'

'কিন্তু তুমি খাবার, সেটা কি ভাল দেখায়?'
'আমার মতলব তোমাদেরকে কলী করে রাখা। লেনিনগ্রাদে যতক্ষণ থাকব,
তোমাদের সাহায্য দরকার হবে আমার।'

লেনিনগ্রাদে রানার থাকার ব্যাপারে কোন যত্নবা করা থেকে বিরত থাকল
কবল, বলল, 'যা শীত পড়েছে, কক্ষ খেতে কোন আপত্তি নেই আমার। আমার
মনে হয়, পিনিংও আপত্তি করবে না।'

সোফা ছেড়ে উঠে দাড়িয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল পিনিং। তার সাথে
লেফটেন্যান্টও উঠল, এগিয়ে গিয়ে দাড়াল ডেকের সামনে। ওদের দিকে গিছন
ফিরে কোনোর রিসিভার তুলল সে।

'আমার প্রতিজ্ঞার কথা মনে আছে, রানা?' চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল
প্যাকো।

'মজার কথা ওনারে? ওই ফাটলটায় বা পাব বলে আশা করেছিলাম তা ছিল
না। ঘরে নিজে গিয়ে খুলে একেবারে হকব বনে গিয়েছিলাম।'

লিউ রাইকভ লেফটেন্যান্টকে একবার দেখে মিল থাকে। 'তোমার কথা বলছে
সে। 'তুমি ডাক্তার, এ আমি বিশ্বাস করি না। নিখুঁত কোথাও কোন ভুল করেছে
বড়কতারা, 'নিচু গলায় বলল প্যাকো। 'বটমারের কথা এখন যদি আমি কার্টেনকে
জানাই কেমন হবে সেটা?'

'কার্টেন বড়কতাদের জানাবেন, বলল রানা। 'এক বড়কতারা কলছেন,
মানুস রানা লোক ভাল নয় সে আমরাও জানি। কিন্তু ঠেকার কাজটা ওকে দিয়েই

চালিয়ে নিতে হবে।'

রক্তক্ষ মেনে রানার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল প্যাকো। তারপর
নিচু গলায় জানতে চাইল, 'ঠেকার কাজটা কি জানতে পারি?'

'চাঁদ ধরার চেষ্টা কোরো না, প্যাকো,' উপদেশের সুরে বলল রানা।
'কাপারটা তোমাদের কার্টেনও জানছেন না।'

'মনে রেখো, তোমার ওপর নজর রাখব আমি,' প্যাকোর নিচু চেহারা হিংস্র
হয়ে উঠল। 'কি বলেছিলাম মনে আছে তো? বৈচে থাকলে আমার আমাদের দেখা
হবে, প্রতিশোধের জন্যে তৈরি থেকে।'

'আই, মজার কোন গল্প বলে আমার প্রথম থেকে শুরু করতে হবে।' চোখ
পাকিয়ে বলল লেফটেন্যান্ট কবল, এগিয়ে এসে বসে পড়ল নিজের সোফায়।

প্যাকোর চেহারা থেকে এক নিমেষে হিংস্র ভাবটুকু অদৃশ্য হয়ে গেল। সহজ
সুরে হেসে উঠল সে, বলল, 'ড, রানাকে জিজ্ঞেস করাছিলাম, উনি সত্যি ডাক্তার,
নাকি ডক্টর। ডাক্তার হলে ওর হাতে এ পর্যন্ত ক'টা রুগী মারা গেছে।'

'কাজটা ভাল করোনি,' কৃত্রিম গাভীয়ে ভারী হয়ে উঠল লেফটেন্যান্টের প্রকাণ্ড
মুখ। 'কারও প্রফেশন্যাল সিক্রেসী জানতে চাওয়া উচিত নয়।' রানার দিকে ফিরল
সে। হেসে বলল, 'কমান্ডার মস্তুর সাথে কথা বলছেন, তোমাকে আরও খানিক
ধৈর্য ধরতে হবে।'

'আমার কোন তাড়া নেই,' বলল রানা। 'তবে আমাকে এখানে বসিয়ে রেখে
সাবমেরিন নিয়ে চলে যেয়ো না তোমরা।' লক্ষ করল, ওর কথায় লেফটেন্যান্টের
চেহারার কোন প্রতিক্রিয়া হলো না। টেনিং পাওয়া, সাত ঘণ্টার পানি খাওয়া
লোক, ঐটাই স্বাভাবিক।

কামরায় ফিরে এল পিনিং, পিছু পিছু এল ট্রে হাতে একজন ইউনিফর্ম পরা
বেয়ারা। তেপালের ওপর ওদের জন্যে কক্ষ সাজিয়ে দিয়ে চলে গেল লোকটা।
নিজের কাপে চুমুক দিয়ে মনু গলায় জানতে চাইল রানা, 'তোমাদের কার্টেন
বোধহয় সিকিউরিটির ব্যাপারে খুব কড়া?'

'চেহারার হাসি হাসি ভাবটা জিইয়ে রেখে লেফটেন্যান্ট বলল, 'বলে যাও।
আদর্শ শ্রোতা হিসেবে আমাদের জুড়ি নেই।'

রানা বৃঞ্চল, সিকিউরিটি কেন, কোন ব্যাপারেই একজন বিদেশী লোকের কাছে
মুখ কুলতে বাজি নয় এরা।

'এবার নিয়ে নর্থপোলে ক'বার যাওয়া হবে তোমাদের?' কক্ষ শেষ করে
জানতে চাইল ও।

একই রকম প্রতিক্রিয়া হলো তিনজনের। রানার প্রশ্ন শুনে চোখের পাতা পর্যন্ত
ফেলল না ওরা, বা কেউ কারও দিকে তাকালও না। তিনজনই ইতি কথোক করে
খুঁকে পড়ল রানার দিকে। এই সময় ট্রে আর কাপ-পিরিচ নিয়ে যাবার জন্যে
কামরায় ফিরে এল বেয়ারা। পর্দার দিল করে আছে ওরা তিনজন, হাসি হাসি ভাব
করও চেহারাতেই এতটুকু রান হলো না। বেয়ারা বেরিয়ে যেতেই শান্ত, হালকা
সুরে জানতে চাইল লেফটেন্যান্ট, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি সেটা একটা উপ-নিজেক্ট
ইনফরমেশন। তুমি জানলে কিভাবে?'

কোটের ভেতরের পকেটে ঢোকাবার জন্যে ডান হাতটা তুলছে বানা, মাঝপথে আটকে গেল সেটা। রক্তভের ডান হাত ওর কজির ওপর আঁটাট হাতকড়ার মত চেপে বসল।

‘কিছু সন্দেহ করছি তা নয়,’ লেফটেন্যান্টের মুখের হাসি অস্বাভাবিক, গলায় কমা-প্রার্থনার সুর। ‘কিন্তু আমরা সুবমেরিনাররা খুব বিপজ্জনক জীবন কাটাই তো, তাই একটু বেশি নার্ভাস।’

খালি হাতটা দিয়ে রক্তভের কজি ধরল বানা, হ্যাঁচকা এক টানে সেটা নিজের কজি থেকে ছাড়িয়ে আনল। কাছটা সহজ হলো না, গায়ের জোর ও কৌশল ব্যবহার করতে হলো একে। ‘টপ-সিক্রেট ইনফরমেশন? হ্যাঁ বটে!’ এমনভাবে হাসল ও, যেন খুব মজা পেয়েছে। ‘দুনিয়ার সবাই জানে তোমরা কোথায় যাচ্ছ। তোমাদের টপ-সিক্রেট ইনফরমেশন মুক্ত বিশ্বের সাংবাদিকরা ফাঁস করে দিয়েছে। পকেট থেকে আমি রক্তভের বা গ্রেনেড নয়, একটা খবরের কাগজ বের করতে যাচ্ছিলাম।’

‘কিসের ওপর ডায়েরি করছ, বানা?’ বা হাত দিয়ে ডান হাতের কজি ঢলছে রক্তভ। চেহারায হাসির জায়গায় এখন ব্যথার ছাপ। ‘ওয়েট-লিফটিং?’ আহত কজিটা চোখের সামনে তুলে ধরে কি যেন পরীক্ষা করল সে। ‘খবরের কাগজ? কোথাকার?’

‘পশ্চিম জার্মানীর,’ বলে কোট-পকেট থেকে কাগজটা বের করে রক্তভের হাতে ধরিয়ে দিল বানা।

ডাঁজ বলে প্রথম পৃষ্ঠার ওপর চোখ রাখল রক্তভ। বুজতে হলো না, সাত কলাম দু’ইঞ্চি হেডিংটা যেন লাফ দিয়ে উঠে এল চোখে। দশ সেকেন্ড পড়ল সে, তারপর তাকাল গ্যাকোর দিকে। ‘মিশন আর ডেসটিনেশন গোপন রাখার জন্যে আমাদেরকে দিয়ে শপথ করানো হয়, অথচ দেখা কাঃ, এখানে সব লেখা আছে পবিত্রার।’

‘আপনি ঠাট্টা করছেন, লেফটেন্যান্ট,’ ভারী গলায় বলল গ্যাকো। ‘আমারও তাই ধারণা,’ বলল পিনিন।

‘তাহলে শোনো, হেডিং আর সাব-হেডিংগুলো পড়ে শোনাই—‘স্ট্রান নভেলিকে উদ্ধারের জন্যে নিউফ্রিয়ার সাবমেরিন তুলব। নর্থ-পোলের দিকে লেনিনগ্রাদের নাটকীয় যাত্রা’। আরে সর্বনাশ! চমকে উঠল রক্তভ। ‘লেনিনগ্রাদের এফটা ছবিও ছেপেছে ওরা! স্থিপারের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে এই লোকটাকে তো চিনতে পারছি না। ছবিটা আপস উঠেছে—দেখো তো, গ্যাকো, চিনতে পারো কিনা?’

তেপয়ের ওপর বিজানো কাগজের ওপর ঝুঁকে পড়ল গ্যাকো। প্রথমে হেডিং পড়ল সে, বিভ্রমিত করে বলল, ‘আবহায়া!’ তাকল ছবি দিকে তাকাল। ‘আরে, স্থিপারের পাশে এটা তো আপনার ছবি, লেফটেন্যান্ট!’

‘তাই তো!’ প্রায় আতকে উঠল পিনিন।

গ্যাকোর দোখাল রক্তভকে। ‘তবেই বাক্যে আমরা যখন ইউরোপে গিয়েছিলাম ছবিটা বোধহয় তখন তোলা হয়েছে, তাই না?’ উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে আবার

বলল সে, ‘এখানটার কি লিখেছে শোনো—‘সাগর বা আর্কটিকের ইতিহাসে এই রকম বিপজ্জনক উদ্ধার প্রচেষ্টা আর বোধহয় হয়নি’...’

‘বিপজ্জনক, লেফটেন্যান্ট?’ তুরু কুঁচকে জানতে চাইল গ্যাকো। ‘স্থিপার কি তাহলে শুধু যাত্রা যেতে রাজি হবে তাদের নিয়ে রওনা হবেন?’

‘সবাইকে জিজ্ঞেস করেছি, সবাই স্বেচ্ছাসেবক হতে চায়।’

‘কই, আমাকে তো জিজ্ঞেস করেননি!’

‘আমাকেও না!’ বলল পিনিন।

‘শুধু বোধহয় তোমরা দু’জনই বাদ পড়েছ,’ বলে মুচকি একটু হাসল রক্তভ। ‘এবার দয়া করে একটু চুপ করো, তোমাদের এক্সজিকিউটিভ অফিসার কথা বলছেন। শোনো—‘কালকের কাগজে পাঠকদের আমরা জানিয়েছিলাম, আর্কটিকের একমাত্র সোভিয়েট মিটিংরোলজিক্যাল স্টেশন, ড্রিফট আইসস্টেশন নভেলি একটা মর্মান্তিক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে। খবরটা জানার পর সারা দুনিয়ার সাংবাদিকসেবীরা হতভম্ব হয়ে পড়েন। দুর্ঘটনার খবর আসার পর এবই মধ্যে পেরিয়ে গেছে মূলবান বাটটি ঘটা। দুনিয়ার চাঁদ থেকে পাঠানো নভেলির অস্পষ্ট এস. ও. এস. প্রথম ধরা পড়েনরওয়ের একজন রেডিও অপারেটরের কানে।’

‘পরবর্তী মেসেজ প্রায় চল্লিশ ঘণ্টা আগে ব্যারেক্ট সাগরের একটা ব্রিটিশ ট্রান্সের রেডিওতে ধরা পড়ে। এই মেসেজে দুর্ঘটনা সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানা গেছে। বৃহস্পতিবার ভোর রাতের দিকে ফুয়েল-অয়েলে আতন ধরে গেলে স্টেশনের প্রায় সবটাই পুড়ে ছাই হয়ে যায়। যারা বেঁচে আছে তাদের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। অয়েল-ফুয়েলের রিজার্ভ আর ফুড স্টোর সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ায় আশঙ্কা করা হচ্ছে, পরগশ ভিত্তি স্ট্রাকচার টোয়েন্টি-বিলো টেম্পারেচারে এদের পক্ষে বেশিষণ টিকে থাকা সম্ভব নয়।’

‘স্টেশনে লোকজন প্রি-ফেরিকেটেড ঘরে থাকত, সবগুলো ঘর ধ্বংস হয়েছে কিনা জানা যায়নি।’

‘ড্রিফট আইসস্টেশন নভেলি তৈরি করা হয় এই বছরেরই গ্রীষ্মে, এই মুহূর্তে তার পজিশন আন্দাজ ৮৫°৪০’ উত্তর, ২১°৩০’ পূর্ব। এলাকাটা নর্থ পোল থেকে মাত্র তিনশো মাইল দূরে। যদিও, পোলার আইস প্যাক ঘড়ির কাটার মত সারাক্ষণ ঘোরে বলে এর সঠিক পজিশন নিশ্চিতভাবে জানার কোন উপায় নেই।’

‘রাশিয়া, ব্রিটিশ আর মার্কিন এয়ারফোর্সের দূর-পাল্লার সুপারসনিক বম্বারগুলো একনাগাড় ত্রিশ ঘণ্টা ধরে পোলার আইস প্যাকেটের ওপর তল্লাশি চালিয়েছে। কিন্তু ড্রিফট স্টেশনের পজিশন সম্পর্কে অনিশ্চয়তা, আর্কটিকে এই সময় দিনের আলোর অনুপস্থিতি, এবং অত্যন্ত ঝড়াবাদ আবহাওয়ার জন্য নভেলিকে খুঁজে বের করার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। বিমানগুলো বাধ্য হয়ে যে যার ঘাঁটিতে ফিরে গেছে।’

‘ওই সব আধুনিক বম্বারে এমন সমস্ত যন্ত্রপাতি আছে, চোখ ব্যবহার করার কোন প্রয়োজন পড়ে না পাইলটদের,’ বলল গ্যাকো। ‘ড্রিফট স্টেশনের রেডিও অপারেটর মেসেজ পাঠানো চালু রাখলে সেটাকে বীকন হিসেবে ব্যবহার করে নির্দিষ্ট পজিশনে পৌঁছে যেতে পারে ওগুলো।’

‘কে জানে, রেডিও অপারেটর হয়তো মারা গেছে,’ বলল লেফটেন্যান্ট ক্রুড। ‘কিংবা তার রেডিওই হয়তো নষ্ট হয়ে গেছে। ওটা চালু রাখার জন্যে হয়তো কয়েকের দরকার হয়। পাওয়ার হিসেবে অপারেটর কি ব্যবহার করত তার ওপর নির্ভর করে...’

‘ডিজেল-ইলেকট্রিক জেনারেটর,’ বলল রানা। ‘তার হাতে নাইফ সেনের অতিরিক্ত একটা ব্যাটারি আছে। সেগুলো হয়তো ইমার্জেন্সীর জন্যে রেখে দিয়েছিল। পুরানো টাইপের একটা জেনারেটরও আছে, হাত দিয়ে চালাতে হয়, কিন্তু তার বেহু খুবই কম।’

প্রথমে পিনিন, তারপর গ্যাকোর দিকে তাকান ক্রুড, বলল, ‘এত কথা যে কাগজে নেই, এরা দুজন তার সাক্ষী!’

মুচকি হেসে বলল রানা, ‘কোথেকে জেনেছি এসব এখন তা আর আমার মনে নেই।’

রানার চোখে একবার তাকান ক্রুড, চেহারায়ে কোন তার নেই। তারপর চোখ নামিয়ে মন দিল কাগজে। ‘এখানে লিখেছে—“বিশ্ববসুদ্রে প্রকাশ, মার্কিনীদের সবচেয়ে শক্তিশালী আর্থিক শক্তিচালিত আইসব্রেকার লভো এখন থেকে চম্পিশ ফটা আগে গ্রীনল্যান্ডের খিউল থেকে নর্থ পোলের দিকে বণ্ডনা হয়ে গেছে। কিন্তু ফলফল সম্পর্কে পর্যবেক্ষকরা মোটেও আশাবাদী নন। বছরের এই শেষ দিকে এরই মধ্যে আইস প্যাক পুর আর মোটা হয়ে জমাট বেঁধে গেছে, যা ভেদ করা মানুষের তৈরি কোন জলযানের পক্ষে সম্ভব নয়।’

‘নভেলিকে খুঁজে বের করার সমস্ত প্রচেষ্টা কার্যতায় পর্বনিত হবার পর মস্তো শরকার এখন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন লেনিনগ্রাদকে পাঠিয়ে শেষ একটা চেষ্টা করে দেখা হবে। লেনিনগ্রাদই এখন দুর্ভাগ্য লোকগুলোর একমাত্র ক্ষীণ আশা। কিন্তু অভিজ্ঞ মহল সতর্ক করে দিয়ে জানিয়েছে, লেনিনগ্রাদের সকল হবার সম্ভাবনা নিয়ে খুব বেশি আশাবাদী হওয়া উচিত হবে না। শুধু যে পোলার আইস প্যাকের নিচ দিয়ে কয়েকশো মাইল পেরোতে হবে লেনিনগ্রাদকে তাই নয়, নভেলিকে খুঁজে হলে আইস প্যাক ভেদ করে কোথাও না কোথাও মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে হবে তাকে। সন্দেহ নেই, তার জীবনের সবচেয়ে বিপজ্জনক অভিযানে বণ্ডনা হতে যাচ্ছে লেনিনগ্রাদ। খবরে প্রকাশ, এই মুহূর্তে পোল্যান্ডের গদানভে রয়েছে সারমেরিনিটি। আশা করা হচ্ছে, আজ সঙ্গে সাহিত্যীর বণ্ডনা হয়ে যাবেন কমান্ডার লিউ রাইকড।’

আরও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে পড়ল লেফটেন্যান্ট, এক সময় মুখ তুলে বলল, ‘বিশেষ আর কিছু লেখেনি। লেনিনগ্রাদের সংক্ষিপ্ত একটা পরিচিতি ছেপেছে, আমাদের এই বাহিনে নাকি সোভিয়েত নৌ-বাহিনীর গর্ভে আঁসরা নাকি এক একটা তরু, ইত্যাদি-ইত্যাদি।’

‘দুনিয়ার চানিতে বসে কি করে লোকগুলো?’ জানতে চাইল পিনিন। ‘মিটিওরোলজিক্যাল স্টেশন বলতে কি বুঝি আমরা?’

কৃত্রিম গাঙ্গীয়ে আরও নাল হয়ে উঠল লেফটেন্যান্টের মুখ। ‘আমার মনে হয় প্রগটা আমাদের নয়, এই মাসুদ রানাফে করলে সন্তোষজনক একটা উত্তর পেয়ে

যাবে তুমি।’

‘এ ব্যাপারে খুব সামান্যই জানি আমি,’ বলল রানা। ‘মিটিওরোলজিক্সেরা আজকাল আর্কটিক আর আন্টার্কটিকাকে বিশাল একজোড়া আবহাওয়া তৈরির কারখানা বলে মনে করেন। আন্টার্কটিকা সম্পর্কে অনেক কিছু জানি আমরা, কিন্তু আর্কটিক সম্পর্কে বলতে গেলে কিছুই জানি না। জানি না, কিন্তু জানতে চাই। তাই সুবিধে মত একটা বরফের তর বা তুপ বেছে নিয়ে সেটার ওপর ঘর বানায় মানুষ, সেই ঘরে রাজ্যের ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়ে ঢোকে টেকনিশিয়ানরা। এভাবে তৈরি হয়ে গেল মিটিওরোলজিক্যাল স্টেশন। এটা এখন মাস হুইয়েক বা ওই রকম সময়ের জন্যে দুনিয়ার মাথার ওপর বরফের সাথে ঘুরে বেড়াতে লাগল। এই ঘরনের স্টেশন আরও দু’একটা আছে তোমাদের, নেভলো প্রায় সবই পুর সাইবেরিয়াম সাগরে। মার্কিনীদের আছে শোটা দশ-বারো। ব্রিটিশরাও একেবারে পিছিয়ে নেই।’

‘আচ্ছা,’ জানতে চাইল গ্যাকো, ‘বরফের রাজ্যে ওরা ক্যাম্প ফেলে কিভাবে? সিস্টেমটা কি?’

‘সবার সিস্টেম এক রকম নয়। তোমাদের লোকেরা কাজটা শীত কালে করতে পছন্দ করে, তখন জমাট বাঁধা বরফের ওপর প্লেন ল্যান্ড করানো যায়। প্রথমে আইস প্যাকের ওপর তল্লাশি চালানো হয়, ভাল এক টুকরো বরফের খোঁজে। বরফ জমাট বেঁধে, জোড়া লেগে বিশাল একটা মাঠ হয়ে উঠলেও বিশেষজ্ঞরা দেখে বলতে পারেন গলা ওরু হলেও কোন অংশটা গলবে না বা ভাঙবে না। জায়গা বাছাইয়ের পর স্থি প্লেনে করে পোর্টেবল ঘর, ইকুইপমেন্ট, টেঁচার এবং মানুষ নিয়ে যাওয়া হয়। এইভাবে ধীরে ধীরে তৈরি হয়ে যায় ক্যাম্প।’

‘মার্কিনীরা গরমের দিনে জাহাজের সাহায্যে কাজটা পারে। ওরা সাধারণত লিটভা ব্যবহার করে, ওটা একটা নিউক্লিয়ার-এজিনড আইসব্রেকার। গরমের দিনে আইস প্যাক অতটা পুরু থাকে না, বরফ ভেঙে পথ করে নেয়া সহজ। ভেতর দিকে ঢুকে গিয়ে পছন্দ মত একটা বরফ-টুকরোর ওপর খালাস করে সব, তারপর আয়োজন করে বরফ জমাট বাঁধতে শুরু করার আগেই ফিরে আসে। তোমাদের ড্রিফট আইসস্টেশন নভেলি এই পদ্ধতিতে তৈরি করা হয়েছে। এই এলাকায় এটাই তোমাদের একমাত্র আইস স্টেশন। এই কাজে মার্কিনীরা তোমাদেরকে ধার হিসেবে লিটভাকে দিয়েছিল। মিটিওরোলজিক্যাল ব্রিশার্চে সর্বাধি উপকার পায় বলে এই একটা বিষয়ে সবাই সবাইকে সাহায্য করার জন্যে উদযীব হয়ে থাকে। তোমাদের লোকজন আর ইকুইপমেন্ট নিয়ে আইস প্যাকের গভীরে চলে যায় লিটভা, ফ্রাঞ্জ জোসেফ ল্যান্ডের উত্তরে। নভেলি এরই মধ্যে তার আদি পজিশন থেকে বেশ অনেকটা সরে গেছে—পোলার আইস প্যাক, যে কিনা আর্কটিক সাগরের ঠিক মাথাটা দখল করে বসে আছে, পৃথিবীর ঘোরার সাথে ঠিকমত পাল্লা দিয়ে সারতে পারে না। মস্তর একটা পান্ডিমুখে গতি এসে যায় তার। এই মুহূর্তে স্পিটিসবার্জেনের প্রায় চারশো মাইল উত্তরে থাকার কথা নভেলির।’

রানা ধামডেই বেজে উঠল টেলিফোন। উঠে গিয়ে রিসিভার তুলল পিনিন। অপরাহৃতের কথা শুনে ফিরে এল সে, বলল, ‘ডা. রানার কাগজ পত্র আর ব্রিফকেন চেয়ে পাঠান।’

চোখের প্রশ্ন নিয়ে রানার দিকে তাকাল লেফটেন্যান্ট। পকেট থেকে কাগজ-পত্র বের করে পিনিনের হাতে ধরিয়ে দিল রানা, বলল, 'রিফকেনটা সাবখানে রেখো, বিদেশ-বিভাগে এটা আমার একমাত্র সফল।'

গ্যাকোর উদ্দেশ্যে চোখ মটকে লেফটেন্যান্ট বলল, 'ওতে নিশ্চয়ই যাক্সাল সব ওষুধ-পত্র আছে।'

রিফকেন আর কাগজ-পত্র নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল পিনিন।

গ্যাকো জানতে চাইল, 'আপনি কি নৈতীতে আছেন, ডাক্তার সাহেব?'

'হ্যাঁ, তা বলতে পারো।' নৈতীর সাথে জড়িত আছি।'

'আলগাভাবে, কোন সন্দেহ নেই।' কোডন ক্রাইল লেফটেন্যান্ট কহুত।

'আম্হা, ডাক্তার, এত থাকতে তুমি আর্কটিকে ছুটি কাটাতে যাচ্ছ কি মনে করে? জানো না, ঠাণ্ডা ওখানে মানুষকে বাঘের মত পাখিয়ারি করে?'

'যাচ্ছি, কারণ নভেলিতে ওয়া যারা বেঁচে আছে তাদের মেডিকেল এইত দরকার হবে। অবশ্য আমার পৌছে যদি কাউকে জ্ঞাতু পাই তবেই।'

'কিন্তু সেজন্য তো আমাদের নিজেদেরই বন্দি রয়েছে। আর একজন ওয়ার কি দরকার ছিল?'

'বন্দি বা ওয়া নয়, ইভিয়েট-ডাক্তার।' কপট তিরস্কারের সুরে বলল লেফটেন্যান্ট।

'ডাক্তারই বোঝাতে চেয়েছি আমি। তবে, মুখ ফাকি ওগুলো বেরিয়ে গেছে বলে আমি ক্ষমাখাখী।'

রানা বলল, 'ওখানে ওদের বেশির ভাগেরই আচ্ছাদপত্র এক্সপোজার, ফুট বাইট এবং নভবত গ্যারিধনে আক্রান্ত হবার ভয় আছে। এসব রোগ সম্পর্কে আমাকে একজন স্পেশালিস্ট বলতে পারো।'

'বলেন কি! এসব রোগ সম্পর্কে আমার স্পেশালিস্টও হওয়া যায়?'

মুচকি হেসে বলল কহুত, 'এখানে আমরা ডা. মাসুদ রানাকে মৃত্যুদণ্ড দেবার জন্যে বিচার করতে বসিনি, কাজেই ওকে এত কড়া জেরা করার কোন দরকার আছে বলে আমি মনে করি না। তারচেয়ে, আমার তরফ থেকে আরেক দফা কফি খেতে কারও আপত্তি আছে কিনা বলো।'

পদস্থ কর্মকর্তা আর সাধারণ কর্মীদের মধ্যে এই হাসি-খুশি, যারোয়া সম্পর্ক রানার কাছে একেবারে নতুন নয়। সাধারণত এক্সারফোর্সে এই জিনিষটা বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। নক্ষ এবং দাখিবুগীল ব্যক্তি অধস্তনদের সাথে সহনশীল, নাকৌতুক আচরণ করেন, সম্ভবত এই জন্যে যে তাতে কাজের একটা সুস্থ পরিবেশ তৈরি হয়।

দ্বিতীয় কাপ কফি খাওয়ার পর আরও দশ মিনিট পেরিয়ে গেল, তারপর ডাক পড়ল রানার। শীল কোর্ট পত্রা একজন নাবিক তুলল কামরায়, বলল, 'ক্যাপ্টেন পাঠালেন, লেফটেন্যান্ট। ডা. রানার জন্যে তিনি তার কেবিনে অপেক্ষা করছেন।'

রানাকে নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে আসার সময় লেফটেন্যান্ট কহুত বলল, 'তোমার ভায়া বটে। তুমিই প্রথম বিদেশী যে লেনিন্স্কায়েল পা ফেলার।'

মাথা নেড়ে বিমত পোকা বলল রানা। 'মানুষ হিসেব যাত্রের চেয়ে আমি ছোট

নই। আমার পায়ের ধুলো পড়ছে, সেজন্যে লেনিন্স্কায়েলই ধন্য হওয়া উচিত।'

একটু থমকে, ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাল লেফটেন্যান্ট। বুলল, 'ওনেত সম্প্রদায় মত লাগলেও কথাটা অন্তরের অনুভূতি আর উপলব্ধি থেকে বলাচ্ছে ডা. রানা কেন যেন বিদেশী লোকটার প্রতি তার মনে একটা শঙ্কার ভাব এসে গেল।'

বাইরে তুষারপাত আগের চেয়ে একটু ধমেছে, হিম-শীতল উত্তরে বাতাস কাপড়-চোপড় ভেদ করে ওদের গায়ে যেন ছল ফোটাতে শুরু করল। ছোট্ট মাথার মস্ত একটা কণকিতের চাতাল, সেটা পরিবেশ সবচেয়ে কাছের গ্যাংওয়ের মাথায় এসে দাঁড়াল ওরা। ফ্রাড-লাইটের আলোয় ডকইয়ার্ড কর্মীরা কাজ করছে।

ফরওয়ার্ড হ্যাচে টর্পেডো তরা চলছে। রানাকে নিয়ে আর্কটার গ্যাংওয়েতে চলে এল লেফটেন্যান্ট। ক্যানভাস ঢাকা আর্কটার হ্যাচের পাশ ঘেঁষে এগোল ওরা, ইস্পাতের একটা মই বেয়ে নেমে এল বাকমাকে তকতকে, পরম এগ্রিন রুমে।

চারদিকে বিরাট বিরাট সব মেশিনারি আর ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেল। ফ্লোরোসেন্ট বাতির আলো উজ্জ্বল রোদের মত, কিন্তু ঠাণ্ডা, কোথাও একরঙি ছায়া পড়েনি।

'আমার চোখে পড়ি বাধে না?' জানতে চাইল রানা।

'দরকার নেই,' মুচকি হেসে বলল লেফটেন্যান্ট। 'তোমাকে এতে চড়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে, তারমানে, তোমাকে বিশ্বাসও করা হয়েছে—এখানে কি দেখলে না দেখলে তা কাউকে তুমি বলতে যাবে না। আর যদি তুমি ভুয়া হও, এখান থেকে সোজা জেলে চলে যাবে, এসে হয় এমন কিছু কাউকে রিপোর্ট করার কোন সুযোগই পাবে না আর কোনদিন।'

কালো রাসার দিয়ে মোড়া ডেক, হাটলে শব্দ হয় না। ছোটখাটো পাহাড় আকৃতির দুটো মেশিনকে ডান পাশে রেখে এগোল ওরা। দেখেই চিনল রানা, টার্বো-জেনারেটর—বিদ্যুৎ পয়দা করে। এক সার ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেলের সামনে দিয়ে চলে এল দরজার কাছে, সেখান থেকে খব সক্র আর লম্বা একটা প্যাসেজে।

প্যাসেজটা পেরোবার সময় পায়ের তলায় বেশ ভারী একটা কাপুনি অনুভব করল রানা লেনিন্স্কায়েল নিউক্লিয়ার রিঅাক্টর বোধহয় ওদের ঠিক পায়ের নিচেই কোথাও আছে। প্যাসেজ-ওয়ে ডেকে গোল আকারের হ্যাচ দেখা গেল, এগুলো নিশ্চয়ই সীসা দিয়ে আটকানো কাঁচের জানালার আবরণ, যাকে ইলপেকশন পোর্ট বলা হয়—অনেক নিচের নিউক্লিয়ার ফারনেসে পৌঁছুবার একমাত্র এবং সবচেয়ে সহজ পথ।

প্যাসেজের শেষ মাথায় আরেকটা ভারী দরজা। সেটা পেরিয়ে লেনিন্স্কায়েল কন্ট্রোল সেন্টারে চলে এল ওরা। ওদের বা দিকে পার্টিশন দেয়া বেডিও-রুম, ডান দিকে এক ব্যাডের ট্রানজিস্টর রেডিও থেকে শুরু করে ছোট মোটর বোট আকারের অসংখ্য মেশিন আর ডায়াল লাগানো প্যানেল—এসবের ব্যবহার সম্পর্কে কোন ধারণা থাকা তো দূরের কথা, আগে কোনদিন এসব দেখেওনি রানা। ওদের সামনে বড় একটা চার্ট টেবিল। আরও সামনে চলে গেল দৃষ্টি, কন্ট্রোল-সেন্টারের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় পেরিস্কোপ স্ট্যাভে রয়েছে একজোড়া পেরিস্কোপ। আর কোন সাবমেরিনে এত বড় কন্ট্রোল রুম দেখান ও, অথচ এক ইঞ্চি জায়গা ফালতু পড়ে নেই কোথাও। বাক হেড আর ডেক হেড ও বিচিত্র সক্র-মোটা ওয়ার, কেবল

আর পাইপের ডিড়ে ঢাক পড়ে গেছে।

কন্ট্রোল রুমের ফন ওয়াড পোর্ট আধুনিক জেট এয়ারলাইনারের ফ্লাইট ডেকের মত দেখতে। দুটো আনানো ইওক কন্ট্রোল রুমার, ওগুলোর সামনে ধরে ধরে সাজানো রয়েছে রাজার রুম ভায়াস ক্যানো বিভিন্ন আকারের প্যানেল। ইওক জোড়ার পিছনে গদি মোটা দুটো চেয়ার।

কন্ট্রোল ট্রাটফর্ম এবং কন্ট্রোল রুম থেকে সামনের দিকে এগাবার জন্যে যে প্যানেলজটা আছে তার উল্টো দিকে পার্টিশন দিয়ে ঘেরা আরেকটা কামরা দেখা গেল। ভেতরে কি আছে তার কোন অভ্যাস পাওয়া গেল না। প্যানেল ধরে হন হন করে এগোল লেফটেন্যান্ট, তার বা দিকে প্রথম যে দরজাটা পড়ল সেটার সামনে দাঁড়িয়ে নক করল সে। দশসেকেন্ড পর দরজা খুলে গেল। দোর-দোড়ায় মাঝ-বয়সী একজন ভদ্রলোককে দেখল রানা, দেখেই ধারণা করল, ইনিই কমান্ডার লিউ রাইকভ, লেনিনগ্রাদের কিপার।

ছোটখাট, একহাতা গড়নের মানুষ কমান্ডার রাইকভ। গোলাপী সাদা রঙের মুখ, তেলতেলে, চকচক করছে। শরীরের তুলনায় মুখটা একটু বেখায়া রুমের ভারীই বলা চলে। মাথা বা দিকে, খুব নিচুতে সিঁথি কেটেছেন, খুলি কামড়ে ধরা চ্যাপ্টা টুপি মত লাগল চুলগুলোকে। রানাকে দেখেই তিনি হাসলেন না, অথচ তার মুখে কিছু রেখা অনেক আগেই তৈরি হয়ে আছে যা দেখলেই 'বাক্য যায়, হাসি জিনিসটা তার প্রতি মুহূর্তের সাথী। কোন পাটিতে, বৈঠকে, ক্রাবে এই ধরনের হাসিখুশি টাইপের লোকেরাই আসার মত করে রাখে। এরা বত না বুদ্ধিমান তারচেয়ে বেশি হয় কৌতুক-রসের যোগানদার। অন্তত প্রথম দর্শনে কমান্ডার লিউ রাইকভ সম্পর্কে এই রকমই একটা ধারণা হলো রানার। কিন্তু থাকাকালী সাথে সাথে ব্যতিক্রম করে দিল ও। দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী নিউক্লিয়ার সাবমেরিনের ক্যান্টেন হিসেবে একজন তরলমতি জোকরকে বেছে নেয়া হয়েছে, এ হতে পারে না। ভদ্রলোকের কোথায় কি বৈশিষ্ট্য আছে, এবার তার খোঁজ শুরু করল রানা। প্রথমেই নজর পড়ল চোখ। আর মাই হোক, ক্যান্টেনের চোখ জোড়ার হাসি বা কৌতুকের ছিটেকোটাও নেই। চোখাচোখি হতেই নিজের অজান্তেই না হুম হুম করে উঠল রানাত। এমন ঠাণ্ডা দৃষ্টি আর কখনও অনুভব করেনি ও। একজন ডেভিস্ট যেভাবে তার গলাব ব্যবহার করে, একজন সার্জেন যেভাবে তার ল্যানসেট কাজে লাগায়, একজন বিজ্ঞানী যেভাবে তার ইলেকট্রনিক মাইক্রোস্কোপ ব্যবহার করে, ক্যান্টেন লিউ রাইকভ ঠিক সেভাবে ব্যবহার করেন তার চোখজোড়া। চতুর বা ধূর্ত লোক নয়, অনুসন্ধানী চোখ। মাথাজোঁক করার যত্ন।

প্রথমে তিনি রানাকে মাপলেন, তারপর ওজন ঠিক আছে কিনা দেখার জন্যেই বোধহয় চোখ বুজলেন হাতে যত্ন করে মাপলেন ওপর। কি ভাবছেন, চেহারায় তার কোন অভ্যাসই ফুটল না। 'অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখা হয়েছে, সেজন্যে আমরা দুঃখিত, ডা. রানা। সাহস হ'লোয় রঙনা হ'লি আমরা। ইউরি' শব্দের কথাটা লেফটেন্যান্ট রুডভকে বলা হলো। 'তার মাঝে সব সেরে নিতে পারবে তো?'

'টপেডো লোড করতে কি রকম সময় লাগে তার ওপর নির্ভর করছে, ক্যান্টেন।'

'আমরা মাত্র হ'লি নিছি।'

লেফটেন্যান্টের একটা ভুরু সামান্য একটু উঠ হলো, কিন্তু কোন মন্তব্য করল না। জানতে চাইল, 'ওগুলো কি টিউবে ভরা হবে?'

'রাকে। ব্যালেন্স ঠিক থাকে কিনা চেক করে দেখে নিতে হবে, তারপর আড্ডাটা করা যাবে।'

'কোন স্পেসের থাকছে না?'

'না।'

মেনে নেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাকিয়ে চলে গেল লেফটেন্যান্ট। রানাকে পথ দেখিয়ে নিজের কামরায় নিয়ে এলেন কমান্ডার, ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলেন দরজা। 'আমার লোকেরা আপনার ব্যতিরিক্ত করেছেন তো?' ভাঙ খোলা একটা টুল দেখিয়ে রানাকে বসতে ইঙ্গিত করলেন তিনি।

ক্যান্টেনের কেবিনটা টেলিফোন বুদের চেয়ে সামান্য বড় হবে। একটা বাক্স, একটা ফ্লোডিং ওয়াশবেসিন, ছোট একটা ডেস্কের ওদিকে হাতল হাড়া চেয়ার, একটা ফ্লোডিং ক্যাম্প টুল, একটা লকার, বাক্সের ওপর কিছু ক্যালিবেটেড রিপটার-ইনট্রুমেন্ট ডায়াল-বাস, আর কিছু নেই। কেউ যদি কনুই বা হাঁটুতে চোট খেতে চায়, কেবিনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বেমজা এক পাক ঘুরলেই মনের আশা পূরণ হয়ে যাবে।

'এক কাপ কফি খাইয়েছিলাম, সেটা ওরা ওই কফি বাইয়েই শোধ দিয়েছে,'

বলল রানা।

কমান্ডারের চেহারায় হাসি খেলে গেল, কিন্তু সে হাসি চোখ দুটোকে স্পর্শ করল না। বললেন, 'আমরা সাবমেরিনাররা আসলে সুযোগ সন্ধানী।' ডেস্কের ওধারে গিয়ে চেয়ারে বসলেন তিনি। গলায় আওয়াজ শান্ত এবং মৃদু, উদ্ভারক ভঙ্গি অত্যন্ত মার্জিত। 'আপনার কাগজ-পত্র দেখলাম। মস্তোড় সাথেও কথা হলো। কিন্তু তবু আমি সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। কে আপনি, ডা. রানা? কি আপনি?'

'এর উত্তর কর্নেল রুবল বা মস্তোড় কাছ থেকে নিশ্চয়ই পেয়েছেন, কমান্ডার। আমি একজন বাংলাদেশী ডাক্তার, নেতার সাথে জড়িত...'

'ন্যাতান ভট্টর?'

'না, ঠিক তা নয়...'

'সিঁতলিয়ান?'

মাথা ঝাকাল রানা।

কমান্ডারের গালে হাসির রেখাগুলো দ্বাকল বাটে, কিন্তু চেহারায় হাসি নেই। 'ঠোট জোড়া পরস্পরের সাথে চেপে আপনমনে মাথা দোলালেন তিনি। 'কিসের ডাক্তার আপনি?'

'তবু কে কোন পরিবেশ বা আবহাওয়া মানুষের শরীরে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হয় তার ওপর রিসার্চ করছি আমি। প্রচণ্ড শীত বা প্রচণ্ড গরমে মানুষ যে-ধরনের অসুবিধের মধ্যে পড়ে, আমি তার চিকিৎসা করি। মহাশয়! ওজনহীনতার শিকার হয় লোকের, এর উল্টোটাও ঘটে, যেমন সাবমেরিন থেকে পালানোর সময় মানুষের ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়ে—এদের অসুবিধে দূর করার জন্যে প্রেসক্রিপশন নিবতে

পারি।

‘এর আগে সাবমেরিনে ঢেঁড়ে গভীর সাগরে গেছেন কখনও?’

‘হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ।’

কমান্ডারকে আগের চেয়েও মিয়মান দেবাল। একজন বিদেশী—বারাপ। একজন বিদেশী সিভিলিয়ান—বুথ খারাপ। কিন্তু একজন বিদেশী সিভিলিয়ান যার কিনা সাবমেরিন সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান আছে—সর্বনাশ! ‘ড্রিফট স্টেশন নভেলি সম্পর্কে আপনার এই যে আগ্রহ, সেটার কারণ কি, ডা. রানা?’

‘সোভিয়েত সরকারের কিছু কর্মকর্তা আমাকে ওখানে থাকার জন্যে অনুরোধ করেছেন।’

‘তা জানি। কিন্তু অনুবোধটা আপনাকে কেন, ডা. রানা?’

‘আকটিক সম্পর্কে আমার ধারণা আছে, বোধহয় তাই। এক্সপোজার, ফ্লুট বাইট বা গ্যাংগিনের শিকার লোকগুলোকে আমি হয়তো বাচাতে পারব, যা হয়তো সাবমেরিনের নিজস্ব ডাক্তারের পক্ষে কঠিন হবে।’

‘যদি কয়েকের নোটিশে আপনার মত ডাক্তার হাফ-ডজন যোগাড় করতে পারি আমি, গলার সুদ এতটুকু না চড়িয়ে বললেন কমান্ডার। ‘তারা কেউ বিদেশী তো হবেই না, সিভিলিয়ানও নয়।’ এদিক-ওদিক মাথা নাড়লেন তিনি, ‘উই, আপনিও আমাকে সমুদ্র করতে পারছেন না, ডা. রানা।’

পরিচিতি জটিল হয়ে উঠছে। আবার চেষ্টা করল রানা, ‘এই ধরনের মিটিং-রোলজিক্যাল স্টেশন সম্পর্কেও আমার প্রাথমিক একটা ধারণা আছে, কমান্ডার। তাছাড়া, নভেলির কমান্ডার আজামাত কিরিম আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ পুরানো বন্ধু।’

‘আই সি।’ চিত্রিত ভঙ্গিতে বললেন ক্যান্টেন রাইকড। ‘অথচ শুধু আপনি নিজেকে একজন সাধারণ ডাক্তার বলে দাবি করছেন?’

‘অনেক বিষয়েই কিছু কিছু টেকনিক্যাল অভিজ্ঞতা আছে আমার, বলল রানা। ‘কাজেই নানা ধরনের কাজে লাগতে আমার কোন অসুবিধে হয় না।’

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকলেন রাইকড।

‘কিন্তু আপনি যদি সাধারণ একজন ডাক্তারই হবেন, এই সার্টিফিকেটের ব্যাখ্যা কি হবে?’ কাগজগুলো এখনও হাতে রেখেছেন কমান্ডার, তা থেকে একটা টেনে বের করে ডেস্কে ওপর দিয়ে রানার দিকে বাড়িয়ে দিলেন তিনি।

‘মেসেজটা পড়ল রানা।’

‘ডা. মাসুদ রানার বিধ্বস্ততা সম্পর্কে কোনরকম সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।’

‘আপনি তাকে সম্পূর্ণ বিশিষ্ট, সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারেন। সাবমেরিন আর ক্রুদের জীবন বিপন্ন না করে সম্ভাব্য সব রকম সহায়তা সহযোগিতা নিতে হবে তাকে।’

‘মেসেজের নিচে লেখা রয়েছে চীফ অফ ন্যাভাল অস্পারেশন, মস্কো, ইউ এস এস আর।’

‘চীফ অব ন্যাভাল অস্পারেশনকে অসম্ভব ধন্যবাদ, সুকি হ্রসবে মেসেজটা ফেরত দিন রানা। এই রকম একটা ক্যারেন্টার সার্টিফিকেট পাবার পর আর কি চান আপনি, কমান্ডার? উনি হবার আর কি কারণ থাকতে পারে আপনার?’

‘আপনাকে তো আগেই জানিয়েছি, মস্কোর এই মেসেজও আমাকে সমুদ্র করতে পারেনি।’ তাড়া সুরে বললেন কমান্ডার রাইকড। ‘লেনিনগাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব আমার ওপর। আমি যদি মনি করি আপনাকে আরোহী হিসেবে নিলে লেনিনগাদকে বিপদের মুখে তেলে দেয়া হবে, সি এন ও-র অর্ডার আমি অগ্রাহ্য করতে পারি। স্পটে রয়েছি আমি, তিনি মন। তাঁর অর্ডার না মানলে হয়তো জবাবদিহি করতে হবে, কিন্তু সরাসরি তাঁর কাছে নয়।’

এই লোক ভাঙবে তবু মচকারে না, এইটুকু পরিষ্কার বুঝতে পারল রানা। সেই সাথে বুঝল, ওকে আরোহী হিসেবে নিতে না চাওয়ার পিছনে ব্যক্তিগত বা রাজনীতিগত কোন কারণ নেই, কমান্ডার রাইকড তাঁর সাবমেরিন আর ক্রুদের নিরাপত্তার কথাই শুধু ভাবছেন। তাকে সমুদ্র করতে পারে এমন কিছু বলার জন্যে রানার মাথার ডেতর কাজ শুরু হয়ে গেল। কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ থাকার পর হঠাৎ গলার স্বর একবারে খাদে নামিয়ে জানতে চাইল ও, ‘দরজাটা কি সাউন্ডপ্রুফ, কমান্ডার?’

দেখানেশি কমান্ডারও রানার গলার স্বর নকল করে ফিসফিস করে বললেন, ‘তা বলতে পারেন।’

‘যা বলছি, চাপের মুখে পড়ে বলছি,’ শুরু করল রানা। ‘এর জন্যে আমাকে দায়ী করা যাবে না।’

‘কেউ আপনাকে দায়ী করবে না।’

‘তখন তাহলে। আইস স্টেশন নভেলি এয়ার মিনিষ্ট্রির সম্পত্তি, কিন্তু কোয়ালিফায়ড মিটিং-রোলজিস্ট বলতে ওখানে আছে মাত্র দু’জন লোক। বাকি সবাই ওসর মিনিষ্ট্রির লোকজন।’

লাশ, নাকি জ্যাক একটা মানুষ, কমান্ডারকে দেখে বোঝা কঠিন। চোখের পাতা পড়ছে না, এক চুল নড়ছেন না, চেহারায়ে কোন ভাবও নেই। শীতল একটা পরিবেশ তৈরি এবং কিতাবে বজায় রাখতে হয়, ভালই জানা আছে তাঁর।

‘ওসর মিনিষ্ট্রির লোকজন এখানে মাত্রা আছে তারা কেউ সাধারণ কর্মী নয়, প্রত্যেকে যার যার ক্ষেত্রে দক্ষ বিজ্ঞানী। রাডার, রেডিও, ইনফ্রারেড এবং ইলেকট্রনিক কমপিউটার সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ এরা। একটা মিসাইল ছোঁড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে কাউন্ট-ডাউন সিগন্যাল ব্যবহার করা হয়, এ তো আপনি জানেনই। মার্কিনীরা যে কাউন্ট-ডাউন সিগন্যাল ব্যবহার করে, সেটা কি তা আপনাদের ওসর মিনিষ্ট্রি জেনে গেছে। কিতাবে জেনেছে জিজ্ঞেস করবেন না, কারণ আমারও তা জানা নেই। নভেলিতে বিশাল আকারের একটা ডিশ এন্টেনা আছে, যেটা কিনা ওই ধরনের যে-কোন সিগন্যাল ধরে আমাপ্রকারে কবতে পারে, শুধু কবাব প্রায় সাথে সাথেই। এরপর ওই বিশিষ্ট লোকেরা রাডার আর ইনফ্রারেড হোম-ইন ব্যবহার করে, কয়েক বগুনা হবার তিন মিনিটের মধ্যে ওটা কত উড়তে আছে, গতি এবং কোর্স সম্পর্কে বিস্তারিত সব জানা যাবে। যেটা বায়োস্কোপ সাফল্য কমপিউটার, কাজেই কোথাও একটুও ভুল হবার কোন সম্ভাবনা নেই। এর এক মিনিটের মধ্যে রাশিয়ার সমস্ত অ্যান্টি-মিসাইল স্টেশনে পৌঁছে যাবে ইশারা। আর এক মিনিটের মধ্যে সলিড-ফুয়েল ইনফ্রারেড হোম-ইন অ্যান্টি-মিসাইল রকেট বগুনা

হবে। এরপর আকাশ পথেই কোথাও, অনেক উচুতে থাকতে, বাবা নিয়ে ধ্বংস করে দেয়া যাবে মার্কিন মিসাইল। ম্যাপের দিকে এক নজর তাকালেই আপনি বুঝতে পারবেন, মার্কিনীদের মিসাইল ঘাঁটির প্রায় দোর-গোড়াতেই রয়েছে স্টেশন নভেলি।

‘এ বিষয়ে এই প্রথম শুনিছি আমি।’

‘আমিও, মনে মনে বলল রানা। গল্পটা এই যাত্র বানিয়েছে ও। দুইফট স্টেশন নভেলিতে ওবা যদি পৌছাতে পারে, ও মিথ্যা কথা বলেছে বুঝতে পেরে কমান্ডার নিশ্চয়ই অসন্তুষ্ট হবেন, কিন্তু তা নিয়ে এখন মাথা ঘামাবার দরকার নেই। এখন ওর একমাত্র কাজ ওখানে পৌঁছানো।’

‘ওখানে কি হচ্ছে সে-সম্পর্কে স্টেশনের বাইরে বোধহয় খুব বেশি হলে অট-দশজনের ধাক্কা আছে,’ বলল রানা। ‘এখন আপনি জানলেন। আপনার দেশের জন্যে এই স্টেশনের অস্তিত্ব কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ, আশা করি আপনাকে তা আর বুঝিয়ে বলতে হবে না। ওখানে খারাপ কিছু যদি ঘটে থাকে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা সামলে নিয়ে আবার স্টেশনটাকে চালু করতে হবে।’

‘তবু আমি বলব, আপনি সাধারণ কোন ডাক্তার নন,’ এই প্রথম হাসল কমান্ডারের চোখ। দেশের স্বার্থ উদ্ধার হবে বুঝতে পেরে লেনিনগ্রাদে রানার উপস্থিতি মেনে নিতে এখন তার আর কোন আপত্তি নেই।

মুদু নক হলো দরজায়। অনুমতি পেয়ে কেবিনে ঢুকল ম্যাক্সিম গ্যাকো। কমান্ডার তার আবার কারণ জানতে চাইলেন না দেখে রানা ধরে নিল, আগেই বোধহয় তাকে আসতে বলে রেখেছিলেন।

‘সাতো ছটির মধ্যে আমরা রওনা হতে পারব তো?’ জানতে চাইল রানা।

‘কাজ করতে ব্যক্তি আছে টর্পেডো লোড করার পর স্কাভার পাশে ভিড়ে কিছু ফুট-স্টোর আর কিছু অতিরিক্ত আর্থটিক কাপড়-চোপড় নেয়া। আমরা বোধহয় সাতো ছটির কিছু আগেই রওনা হতে পারব।’

একটু অরাক দেখল গ্যাকোকে, খানিক ইতস্তত করে জানতে চাইল সে, ‘কিন্তু স্যার, আপনি বলেছিলেন, প্লেনগুলো চেকিং আর আভারওয়াটার ট্রিম অ্যাডজাস্ট করার জন্যে উপন্যাসে একটা দ্রো-টাইম ডাইট দেবেন। সামনের টিউবে টর্পেডো না থাকায় ব্যালেন ঠিক নাও থাকতে পারে।’

‘কথাটা বলেছিলাম ডা. রানার সাথে আলোচ করার আগে,’ শান্ত সুরে জানালেন ক্যাপ্টেন রাইকড। ‘এখন আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্টেশন নভেলিতে পৌঁছাতে চাই। ইমিডিয়েট ট্রিম চেকিং দরকার কিনা সেটা দেখব আমি। দরকার না থাকলে সাগরে ফেঁদে কোম এক সময় চেক করে নিলেই হবে।’ একটু খেমে প্রসঙ্গ বদল করলেন ক্যাপ্টেন। ‘একজিকিউটিভ আর এঞ্জিনিয়ার কেবিনে ডা. রানার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। তাকে বথ দেখিয়ে নিয়ে যাব, গ্যাকো।’ রানার দিকে ফিরলেন। ‘আপনার বিলকেন এসই মাথো ওখানে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।’

‘তানাটা নিয়ে কি খুব বেশি ভাবতে হয়েছে?’ জানতে চাইল রানা।

কমান্ডারের চেহারাটা দেখানী ভাবতুকু একটি বাড়ল বলে মনে হলো। ‘কিন্তুকেসে কর্মবিরশন লক, জীবনে এই প্রথম দেখলাম।’ বলতে পারিনি কেনই হোক

সন্তুষ্ট হতে পারছিলাম না। মকোর সাথে আরও কিছু কথা আছে আমার, কাজেই কেবিন পর্যন্ত আমি আপনার সাথে যেতে পারছি না। ভাল কথা, ডিনার রাত আটটায়।’

‘ডিনারে আমি থাকছি না, ধন্যবাদ।’

‘লেনিনগ্রাদে কেউ সা-সিকনেসে ভোগে না, এ-ব্যাপারে আমি আপনাকে গারান্টি দিতে পারি।’

‘ব্যাপারটা তা নয়। পেট ভরার চেয়ে আমার বরং ঘুমটাই বেশি দরকার। একটানা পঞ্চাশ ঘণ্টা স্লেনে উড়তে হয়েছে। ভাল ঘুম হয়নি।’

‘তাই?’ মদু হেসে জানতে চাইলেন কমান্ডার। রানার মনে হলো, প্রায় সবারাফই হাসছেন তিনি। সেই সাথে ভাবল, এমন কিছু লোকও পাওয়া যাবে যারা বোকোর মত তার এই হাসিটার ভুল ব্যাখ্যা করে প্রচণ্ড ধাক্কা খাবে। ‘তাহলে তো খুবই ধকল গেছে শরীরের ওপর দিয়ে। তা, পঞ্চাশ ঘণ্টা আগে কোথায় ছিলেন আপনি, ডা. রানা?’

‘অ্যাক্টার্কটিকায়।’

গ্যাকোর পিছ পিছ কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল রানা। পিছনে না তাকিয়েও বুঝতে পারল, ওর দিকে অরাক চোখে তাকিয়ে আছেন কমান্ডার, মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে।

তিন

ঘুম ভাঙার পর শরীরটাকে তাজা, স্বরকার লাগল রানার। বিকটওয়াচ দেখল, সাতো নটা। তারিখ দেখে বুঝল, নব্বৈ থেকে ঘুমিয়ে পড়দিন সকালে ঘুম ভেঙেছে ওর।

কেবিনটা অন্ধকার। কট থেকে নেমে কয়েক সেকেন্ড হাতড়াতে হলো, তারপর বোতাম টিপে আলো জ্বলল। লেকটেন্যান্ট রুস্তভ বা এঞ্জিনিয়ার অফিসার, দু’জনের কাউকেই দেখল না কেবিনে। ও ঘুমিয়ে পড়ার পরে এসে ওর ঘুম ভাঙার আগে আবার তারা বেরিয়ে গেছে। হঠাৎ কান দুটো সজাগ হয়ে উঠল ওর। কোথাও কোন শব্দ, শ্বাস, দোলা বা গতির লক্ষণ নেই। ও যেন ঢাকায় ওর নিজের বাড়ির বেডরুমে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঘটনাটা কি? লেনিনগ্রাদ এখনও রওনা হয়নি কেন?

দাড়ি কামানো দরকার, কিন্তু সেটা এড়িয়ে গিয়ে ফোন্ডিং বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে চোখে-মুখে পানি ছিটিয়ে স্নিল ও। শার্ট টাইজার আর জুতো পরে বেরিয়ে এল কেবিন থেকে। কেউ নেই প্যাসেজে। কয়েক ফিট সামনে স্টারবোর্ডের দিকে একটা দরজা খোলা দেখে এগোল বেসিনকে। ভেতরে ঢুকই বুঝল, এটা অফিসার্স ওয়ার্ডরুম। একজন লোক এখনও তার বেকফাস্ট শেষ করিনি। ভয়জন যাসক বোধহয় একেই বলে। লোকটার সামনে তিনটে প্রেট—একটার ডজন খানেক সেক্স ডিন, একটায় সের প্যাচেক তাজা মাছ, আরেকটায় চিড়ির দারকনেট পাহাড়ের মত

উঠ হয়ে আছে। ধীরেস্থে, খাদ্য-বস্তুর প্রতিটি কণার স্বাদ নিয়ে চিবাবে। লোকটার সমস্ত আনন্দে অলস একটা ভঙ্গি আছে, ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে আছে খোলা একটা পত্রিকার পাতায়। বয়সে রানার চেয়ে বছর দশেক বেশি হবে, আকারে দ্বিগুণ। এরই মধ্যে পাক ধরেছে জুলফিতে। লেনিনজাদেব আর সবার মত এই লোকের মুখেও হাসি হাসি একটা ভাব আছে। তবে চেহারায় বুদ্ধির দীপ্তিও লক্ষ করার মত। রানাকে দেখতে পেয়েই খাওয়া ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে, একটা হাত বাড়িয়ে নিল।

‘আপনি নির্বাং ডাক্তার রানা। আমি কুডেনকো, মিখাইল কুডেনকো। বসুন, ডা. রানা! বসুন!’ কুডেনকোর চেহারা বা গলার সুরে আত্মরিকতার কোন অশ্রাব নেই।

‘ব্যাপারটা কি বলুন তো?’ হ্যাডশেক সেরে জানতে চাইল রানা। ‘থেকেম আছি কেন আমরা?’

দুঃখে শোকে কাতর দেখাল কুডেনকোকে। ‘আধুনিক যুগটাকে নিয়ে এই এক জ্ঞান। হয়েছে। ওষু ছোটো, ছোটো, উদ্ভাসের মত ছোটো! আরে বাবা, এত ছোটোছোটো করে পৌঁছোচ্ছো কোথায় ওনি? এই আমি আপনাকে বলে রাখলাম, নির্বাং...’

‘মাফ করবেন। এখনি ক্যাপ্টেনের সাথে দেখা করতে হবে আমার।’

ঘুরে দাঁড়াতে যাবে রানা, ওর কাঁধে একটা হাত রেখে বাধা দিল কুডেনকো। ‘শান্ত হোন, ডা. রানা। খোলা সাগরেই রয়েছি আমরা। নির্বাং খিদে পেয়েছে আপনার? বসুন, আমি আপনার ব্রেকফাস্ট আনিয়ে দিচ্ছি। এই, কে আছে?’

‘সাগরে? অন দি লেভেল? কিন্তু আমি তো কিছুই টের পাচ্ছি না।’

‘প্রিন্সো ফিট নিচে থাকলে টের পাবার কথাও নয়। কিংবা হয়তো চারশো ফিট নিচে রয়েছি আমরা। টের পাবার দরকারটাই বা কি? এসব ব্যাপার মেকানিকদের ওপর ছেড়ে দেয়াই ভাল নয়?’

‘কোথায় রয়েছি আমরা বলতে পারেন, মিস্টার কুডেনকো?’

‘নির্বাং পারি, দাঁত বের করে হাসল কুডেনকো। ‘শেষবার চেক করার সময় আমরা নরওয়েজিয়ান সী-তে ছিলাম। বার্জেনের কাছাকাছি।’

‘আপনার সাথে আমি কথা বলছি আজ মঙ্গলবার সকালে?’ ওকে বোকা বোকা দেখাল কিনা বলতে পারবে না রানা, কিন্তু নিজেকে ওর তাই লাগল।

‘নির্বাং। কিন্তু এটা জানার পর আপনি যদি হিসেব করে বের করতে পারেন আমাদের স্পীড কত, দূর্য করে সেটা গোপন রাখবেন।’ ডাক ওনে টেবিলের সামনে সাদা জ্যাকেট পরা একজন জুয়ান্স এসে দাঁড়িয়েছে, তার দিকে দিগে কুডেনকো বলল, ‘সার্কিন, ইনি আমাদের মেহমান, কাজেই সাবধান! এমন কিছু খাতে দিও না যাতে দেখে মিলবে উনি আমাদের বদনাম করতে পারেন।’

‘ডাক্তার সাহেব, একটা ত আপনিত যা একটা খাবার বলেন, আর কেউ তো—’

‘পূরানো প্যাচাল বাদ লাও। খমত লাগল কুডেনকো। রানার উকেশে তেঁকে মটকে হাসল সে। ‘তাবার চেহারাটা আমার খুবই করে বলে সার্কিনকে বলল, ‘খাবার না বললে এত ভাল খাবার চেষ্টামার হাত পেতে ছেলে...’

সার্কিনের চেহারা উজ্জল হয়ে উঠল। ‘ও, তাহলে এই ব্যাপার!’ ‘প্রশংসা করেছি, কাজেই ওর বাবার আর মুখে দেয়া যাবে না।’ ইতামায় কুডেনকো একেবারে মুবড়ে পড়ল।

‘রানার অর্ডার নিয়ে প্যাক্সির দিকে চলে গেল সার্কিন।

‘আপনি তাহলে ডাক্তার কুডেনকো?’ জানতে চাইল রানা।

‘নির্বাং। লেনিনজাদেব গেনিভেট মেডিকেল অফিসার। ফাঁকি-ছুকি নিয়ে দিবি কাটিয়ে দিছিলাম দিনগুলো, কিন্তু তা বুঝি আর কপালে সইল না। এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্যে তৈরি হতে হবে।’

‘ভুল বুঝেছেন, ডা. কুডেনকো, হেসে উঠে বলল রানা। ‘আমি কারও সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে আসিনি।’

‘সে আমি জানি, কথাটা ঠাট্টা করে বললাম।’ এত হাড়া তাড়ি এবং বাস্তবতার সাথে বলল কুডেনকো পরিষ্কার বুঝতে পারল রানা, এর মধ্যে কমান্ডার রাইকভের হাত আছে। তিনি হয়তো তার অফিসারদের ডেকে জানিয়ে দিয়েছেন, ডা. রানার সাথে কথা করার সময় সরাসরি সাবধান থাকতে হবে। ‘কিন্তু একটা কথা জেনে রাখুন, ডা. রানা আমাদের এই সাবমেরিনে রুগীর বড় অর্ডার। কেউ যদি অসুস্থ হয়, তাকে রুগী হিসেবে পাবার জন্যে আমাদের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যাওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। তাই আসুন, আমরা একটা চুক্তিতে আসি। প্রথম রুগী আপনার, পরেরটা আমার। রাজি? যদিও প্রথম রুগী পাবার জন্যে নির্বাং মাস তিনেক অপেক্ষা করতে হবে আপনাকে। কিন্তু অত দিন নিশ্চয়ই আপনি আমাদের সাথে থাকবেন না!’

‘রোগী পাবার জন্যে আমি লালায়িত নই, ডা. কুডেনকো, বলল রানা। ‘আমি ভাবছি, আপনার তাহলে সময় কাটে কিভাবে?’

‘আমার আসল কাজ হলো স্যাজিয়েশন আর আটমসফেরিক পলিটেশন চেক করা, এ দুটো বিষয়ে স্পেশালিস্ট বলতে পারেন আমাকে। আর মাঝে মাঝে লেকচার দিচ্ছি।’

‘লেকচার?’

‘কাজ না করলে নির্বাং পাগল হয়ে যাব না?’ কথার ফাঁকে হাত এবং মুখ চালু রেখেছে ডা. কুডেনকো। ডিম, মাছ, মাংস টপাটপ তার মুখের ভেতর অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। ‘সাবাদিন তো বসেই আছি, তাই সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি, ভূগোল, ইতিহাস, অস্ত্র এবং কখনও কখনও চিকিৎসা সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দিয়ে থাকি। শ্রোতারা বেশিরভাগই ঘুমার, কেউ কেউ নিজেনের মধ্যে বোকা-গরি করে।’

‘বোকা গেল, বুঝ আরামেই আছেন আপনি।’

‘কিন্তু লেকচার ছাড়াই বা আর কতটা সময় কাটানো যায়। তাই আইল মেশিনটাতে হবি হিসেবে নিয়েছি।’

‘আইল মেশিন?’

‘পরে দেখাব আপনাকে।’

রাজকীয় ব্রেকফাস্ট সারল রানা। বিরাম নেই, একমাগাতে বক বক করে চলেছে ডা. কুডেনকো। রানা এবার উঠে যাবে বুঝতে পেরে হাড়া তাড়ি বলল সে,

‘কমান্ডার বলেছেন, আপনি যদি ঘুরেফিরে স্তব দেখতে চান, আমি যেন আপনার গাইড হই।’ তা, দেখি কবে লাভ কি?’

‘ধন্যবাদ,’ বলল রানা। ‘চেষ্টার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান ও।’ ‘আগে আমি দাড়ি কামাব, কাপড় পবব, হারপূর কথা কলব কমান্ডারের সাথে।’

একটু মনঃকুগল দেখাল কুডেনকোকে। বলল, ‘আমরা চার-পাঁচদিন পর একবার দাড়ি কামাই। আপনি রোজ কামালেও অবশ্য আমাদের বলার কিছু থাকবে না। আর কাপড়-চোপরের কথা যদি বলেন, শার্ট প্যান্টই আমাদের ইউনিকর্ম। ভাল কথা, ক্যান্টেন বলে দিয়েছেন কোন ব্যাপারে আপনার যদি কোন প্রশ্ন বা কৌতুহল থাকে, জানালেই তিনি তার ব্যাখ্যা দেবেন।’

‘ধন্যবাদ।’

আধ ঘণ্টা পর সাগরের নিচে এই শহরটাকে দেখার জন্যে কুডেনকোর সাথে বেরুল রানা। এর আগে যেসব সাবমেরিন দেখেছে ও লেনিনগ্রাদের তুলনায় সেগুলোকে প্রস্তর যুগের বলে ধারণা হলো ওর। প্রথমেই লেনিনগ্রাদের আকারের কথা বিবেচনা করতে হয়। প্রকাণ্ড নিউক্লিয়ার রিঅাক্টরকে জায়গা দেয়ার জন্যে খোঁজটা এত বড় করে তৈরি করা হয়েছে যে এর ভেতর তিন হাজার টনের যে-কোন সাবমেরিন শিপ অন্যায়সে সেরেিয়ে যাবে। সাধারণ সাবমেরিনে থাকে একটা ডেব আর লোয়ার হোল্ড, কিন্তু লেনিনগ্রাদে রয়েছে তিন তিনটে ডেক। কুডেনকো রানাতে নিয়ে প্রথমে এল তার সিক-বে-তে। সার্জারীর জন্যে অত্যাধুনিক সমস্ত যন্ত্রপাতি রয়েছে এখানে। সিক-বে-তে কেবিন আছে, কিন্তু বোম্বা নেই। কেবিনগুলোতে দেয়ালে সাটা হয়েছে পৃথিবী বিখ্যাত কৌতুকাভিনেতাদের নানান হাস্যকর অভিব্যক্তির ছবি। সেগুলোর দিকে রানার দৃষ্টি আকর্ষণ করে কুডেনকো বলল, ‘এগুলো আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহ। মোত দেখাবার জন্যে রেখেছি। কিন্তু তবু রক্ষা পাই না।’

অফিসাল কোয়ার্টার আর ওয়ার্ডরুমের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে এসে এক ডেক নিচে জুদের লিভিং কোয়ার্টারে চলে এল ওরা। চতুর্দিকে চালির তৈরি ওয়ার্ডরুম আর স্বাক্ষররুমের পাশ দিয়ে হেঁটে এসে ঢুকল কু মেন্স রুমে।

‘জাহাজের হাট বলতে এটাকেই বুঝি আমি,’ হাত নেড়ে চারদিক দেখাল কুডেনকো। ‘ব্রেকড প্রোগ্রাম, রেডিও, প্রজেক্টর, মুক্তি থিয়েটার, কফি মেশিন, আইসক্রীম মেশিন, লাইব্রেরী, সবগুলো ইনডোর গেমের সরঞ্জাম—কি নেই এখানে?’ হাট বলতে আপনি যদি নিউক্লিয়ার রিঅাক্টরকে বোঝেন, আমি আপনার সাথে একমত হব না। বোম্ব খাওয়ার ফুল সম্পর্কে এখানেই আমি ভাবণ দিই।’

‘আর্টিসনজন লোক খান্সব টেবিলে বলে কফি আর খমপান করছে, কুডেনকোর চমক পড়া হলো তার হাস্যের কারণ। পানকো আর লোকটেনান্ট কুডেনকোর মধ্যে যা আলাপ-মতলা করেছে রানা, এই লোকজনোর মধ্যেও তাই দেখা গেল—হালি-বুলি, আচরণে কোনোমতন গাধার, পুষ্টিব্রতা বা নাড়াশিনেরের চিহ্ন নেই। এক এক করে প্রকোচের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল কুডেনকো। জানাল ডা, রানা বহুবাস্তি বাহিনীয়েন নেভার একজন ডাক্তার, লোডিয়েত সুরকারের বিশেষ আমন্ত্রণে অতিথিতা সঞ্চয়ের জন্যে কিছু দিন আমাদের সাথে থাকবেন। সাদেও নেই, ভাবল

রানা, ক্যান্টেন রাইকভের শিখিয়ে দেয়া কথা আউটে গেল কুডেনকো। মনে মনে খুশিই হলো ও। এখন আর সাবমেরিনারদের মধ্যে ওর উপস্থিতি সম্পর্কে অকারণ কোন কৌতুহল থাকবে না।

মেন হল থেকে বেরিয়ে ছোট একটা কম্পার্টমেন্টে ঢুকল ওরা।

‘এয়ার-পিউরিফিকেশন রুম,’ বলল কুডেনকো। ‘এর নাম ড্রাসিলি কুজত। আমাদের আদুর বাস্তের খবর কি, কুজত?’

‘ববর ভাল, ডাক্তার সাহেব। সি এ, ব্রিডিং স্টেডি অস জারটি-পার্টস এ-মিলিয়ন।’ একটা কথা বুকে কিছু টুকল সে, তাতে খস খস করে সেই কতল কুডেনকো। তারপর দু’একটা কথা বলে রানাকে নিয়ে বেরিয়ে এল কম্পার্টমেন্ট থেকে।

‘কলমের এক বোচার অর্ধেক দিনের কাজ সারা হয়ে যায় আমরা,’ বলল কুডেনকো। ‘গনের বস্তা, মাংস, গোল আলুর বস্তা, একশো রকমের টিনজাত খাবার—এসব দেখার আগেই আছে আপনার?’

‘নেই। কেন বলুন তো?’

‘আমাদের পায়ের নিচে, ফরওয়ার্ড ডেকের অর্ধেক জায়গা দখল করে আছে ওগুলো। ওই স্টোয়েজ হোল্ড আসলে ছোটখাট একটা স্টেডিয়াম। এত খাবার কেন, জিজ্ঞেস করতে পারেন। উত্তরটা হলো, সাংখ্যায় আমরা একশো জন, তিন মাস ধরে খেতে হলে প্রায় সবই নাবাড় হয়ে যাবে। ইমাজেলী দেখা দিলে কমপক্ষে তিন মাস যাতে সাগরে থাকতে পারি তার জন্যেই এই ব্যবস্থা। স্টোয়েজ হোল্ডে আমরা যাব না, অত খাবার এক জাহাজের জড়ো করা অবস্থায় দেখলে আমার খিদে নষ্ট হয়ে যায়। তারচেয়ে, চলুন, রান্নাঘরে টু মারা যাক।’

কুডেনকোর পিছু পিছু গ্যালিতে চলে এল রানা। মাঝারি একটা কামরা, সমস্ত তৈজসপত্র স্টেনলেস স্টীলের তৈরি, কলমল করছে। ওদের পায়ের আওয়াজ পেয়ে সাদা কোট পরা মোটাসোটা এক লোক ঘুরে দাঁড়াল। তার পাশ থেকে স্টুয়ার্ড সাসকিন নিচু গলায় কি যেন বলল তাকে। কুডেনকোকে দেখে হাসল সাদাকোট। ‘লাকের নমুনা চাকতে এলেন বুঝি, ডা, কুডেনকো?’

‘না। ডা, রানা, এর নাম ইলারিয়ন কাপুসটিব, চীফ কুক—আমার পেটের দুশমন। আই, লাভ হিসেবে কি ধরনের বিস খাওয়াচ্ছ আজ তোমরা?’

চীফ কুকের চেহারা হালির প্রাবন হয়ে গেল। ‘বিস নয়, ডাক্তার সাহেব, পুষ্টি। জীম সূপ, গরুর কোমরের মাংস, বোন্ট করা আলু আর গরু ইচ্ছে আপেল পাই।’

শিউরে ওঠার ডান করে রানাকে জিজ্ঞেস করল কুডেনকো, ‘লেনিনগ্রাদে আমরা সবাই কেন মোটা হয়ে যাচ্ছি, বুঝতে পারছেন তো?’ রানাকে নিয়ে বেরিয়ে আসতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে, বাহ তুলে দশ ইঞ্চি মোটা একটা রোগে টিউব দেখাল। গ্যালির ডেক থেকে লম্বার তার ফিট হবে সেটা। টিউবের বুনে ভারী একটা ঢাকনি রয়েছে, তিন জোড়া হু দিয়ে আটকানো।

‘প্রেশার কুকার?’ জানতে চাইল রানা।

‘দেখ তাই মনে হয় বটে, কিন্তু আসলে ওটা আমাদের আতর্জন্য গায়।’

আগেকার দিনে কয়েক ঘন্টা পর পর পানির নিচ থেকে মাথা তুলতে হত সাবমেরিনকে, তখন আবর্জনা ফেলা কোন সমস্যা ছিল না। কিন্তু আজকাল আমরা হস্তার পর হস্তা, কখনও মাসের পর মাস পানির তলায় থাকি, কাজেই আবর্জনা ফেলার নতুন ব্যবস্থা করতে হয়েছে। এই টিউব লেনিনগাদের একেবারে নিচে পর্যন্ত গেছে। টিউবের নিচের প্রান্তে ভারী একটা দরজা আছে, ওয়াটারপ্রুফ। এখানের এই দরজা, মানে ঢাকনি, আর নিচের সেই দরজা বোতাম তিপে খোলা যায়, কিন্তু এমনই ব্যবস্থা করা আছে দুটো দরজা একসাথে খুলবে না। যদি খোলে, নিশ্চয় লেনিনগাদের সবনাশ। চীফ কুকের সহকারী সাসকিন নাইলনের ব্যাগে আবর্জনা তুলে, সেই সাথে তবে একটা আশু দশ ইঞ্চি ইট...

ইট?

ইট। কাপুসটিন, শেষ গোণার সময় জাহাজে ক'টা ছিল?

এক-দুজারের কিছু বেশি, ডাক্তার সাহেব।

আবর্জনার সাথে ব্যাগে ইট দেয়া হয়, কারণ তা না হলে ওতলো পানির ওপর ভাসতে থাকবে। এমন কি শান্তিকালীন সময়েও আমরা চাই না কেউ আমাদের পজিশন জানুক। এক একবারে তিন কি চারটে ব্যাগ টিউবে ভরা হয়। তারপর বন্ধ করা হয় ওপরের ঢাকনি। নিচের ঢাকনি খুলে যায়, পাম্প করে পানিতে বের করে দেয়া হয় ব্যাগগুলোকে। ওতলো বেরিয়ে গেলে আবার বন্ধ করে যায় নিচের দরজা। সহজ, তাই না? রানার হাত ধরে তিন দিন কড়েনকো। 'আসুন, আসুন, এখনও অনেক সোরাধুরি বাকি।'

গ্যালি থেকে বেরিয়ে ভারী একটা ইস্পাতের দরজার সামনে এসে নীড়াল ওরা। এক একটা ক্র্যাম্পের ওজন হবে পনেরো-বিশ সের, মোট আটটা। সবগুলো নামিয়ে খোলা হলো দরজা। ভেতরে ঢুকে আবার সেতলোকে জায়া মত বগাতে হলো।

'ফরওয়ার্ড টর্পেডো স্টোরেরজ রুম,' ফিসফিস করে বলল কড়েনকো। ঘোলেটা বাজ, কয়েকটা টর্পেডো ব্যাকের একেবারে পা ঘেঁষে। সাত-আটটা বাজে লোকজন রয়েছে, সবাই ঘুমে। 'দেখতেই পাচ্ছেন, মাত্র ছ'টা টর্পেডো,' বলে চলল কড়েনকো। 'নিয়ম হলো, এখানে বারেটা আর টর্পেডো টিউবে চ'টা থাকতেই হবে। কিন্তু এই ছ'টাই এখন আমাদের স্কল।'

কেন?

সবে শেষ হয়েছে সোভিয়েত মহড়া, জানেন হতা? রানা মাথা নীকাতে আবার ঢুক করল কড়েনকো, 'ওই মহড়ায় নতুন ধরনের টর্পেডো নিয়ে হাঙ্গির ছিলাম আমরা—রেডিও-কন্ট্রোলড টাইপ। ওতলোর মধ্যে থেকে দুটো টর্পেডো ঠিক মত কাজ করেনি। আমাদের আডমিরাল হুকুম দিলেন, সবগুলো টর্পেডো নাশিয়ে চেক করতে হবে। গদান্ধ ফিরে এসে চেকিং-র কাজ শুরু হলো। কাজে আমাদের ডিপো শিপ, ওত একটা টিউব থাকে। চেকিং-র কাজ চলছিল, এই সময় ড্রিফট গ্রাইস স্টেশনের খবর এল। সাথে সাথে চেকিং-র কাজ বন্ধ করে দেয়া হয়। কমান্ডার রাইকত জোর দিয়ে বললেন, কম করেও হ'লি টর্পেডো ফিরিয়ে নিতে হবে জাহাজকে। ফিক কাব হাসল কড়েনকো, 'সাবমেরিনের কমান্ডাররা

টর্পেডো ছাড়া কোথাও বেরতে চান না।'

'তবে কি এই টর্পেডোগুলো কাজ নাও করতে পারে?'

'অকেজো কিনা তা জানতে হলে ওতলোকে ব্যবহার করতে হবে।'

'চেকিং-র কাজ তাহলে বন্ধ রাখা হয়েছে কেন?'

'বন্ধ রাখা হয়েছে, কারণ কোথায় জুটি আছে বের করার জন্যে একনাগাড়ে বাট ঘন্টা খেটে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল ওরা। একটু এদিক-ওদিক হলে টর্পেডো বিস্ফোরিত হতে পারে, তাই ক্লান্ত লোকদের নিয়ে চেকিং না করানোই ভাল।'

একপর দুটো ভারী দরজা পেরিয়ে ফরওয়ার্ড টর্পেডো রুমে চলে এল ওরা। স্কল একটা কামরা, টিউবে টর্পেডো ভরা আর নামানোর জন্যে যতটুকু প্রয়োজন তার বেশি জায়গা রাখা হয়নি। খাড়া দুটো ব্যাংকে তিনটে করে টিউব, ইস্পাতের ভারী ঢাকনি দিয়ে বন্ধ করা যুব। মাথার ওপর লোডিং রেল, সাথে মোটা চেইন কুলে আছে। কোন বাজ নেই, তারমানে এখানে কেউ শোয় না।

লেনিনগাদের পিছন দিকে এসে মেন হলে ঢুকল ওরা, ওদের সামনে এসে দাঁড়াল একজন নাবিক। কল, ডা, রানার জন্যে অপেক্ষা করছেন ক্যাপ্টেন। লোকটার পিছু পিছু চওড়া সিঁড়ি বেয়ে কন্ট্রোল রুমে চলে এল রানা। ইচ্ছে করেই পিছিয়ে পড়ল ডা, কড়েনকো। রেডিও রুমের বাইরে রানার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন কমান্ডার লিট রাইকত।

'মহি, ডক্টর, নিদ্দাদেবীর আরাধনায় কোন খুঁত থেকে যায়নি তো?'

উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল রানা, 'ব্যাপার কি, কমান্ডার?' ব্যাপার যে সত্যি কিছু একটা আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কমান্ডার হাসছেন না।

'নভেল সম্পর্কে মেসেজ আসতে শুরু করেছে। আগে অবশ্য ডিকোড করতে হবে। মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যাপার।'

কেমন যেন একটা ভয় ভয় লাগল রানার। কমান্ডার কি ডিকোড করার আগেই মেসেজের অর্থ ধরতে পেরেছেন? 'এর মধ্যে আমরা তাহলে পানির ওপর উঠেছিলাম?'

জানতে চাইল ও। পানির নিচে ডুব দেবার প্রায় সাথে সাথে সাবমেরিন তার রেডিও কন্ট্রোল হারিয়ে ফেলে।

'গদান্ধ ছেড়ে আসার পর? না। এই মুহূর্তে তিনশো ফিট পানির নিচে রয়েছি আমরা।'

'এটা কি রেডিও মেসেজ?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল রানা।

'নয়তো কি? সময় বদলেছে, ডা, রানা। ট্রান্সমিট করার জন্যে আজও আমাদেরকে পানির ওপর মাথা তুলতে হয়, কিন্তু সাগরের গহীন তলা, যেখান পর্যন্ত আমরা নামতে পারি, সেখান থেকেও রিসিভ করতে কোন অনুবিধে নেই। রাশিয়ার কোথাও পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী রেডিও ট্রান্সমিটার রয়েছে, ব্যবহার করছে একট্রনিক লো ফ্রিকোয়েন্সি, যেটা কিনা এই গভীরতায় অন্যায়সে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারে। আসুন, ডা, রানা, মেসেজ ডিকোড হবার আগে ড্রাইভারদের সাথে সাগনার পজিট্য করিয়ে দিই।'

কয়েকজন কন্ট্রোল-সেটার ড্রাইভার সাথে রানার পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো।

এখানে ডা. কুডেনকোর সাথে কমান্ডার রাইকডের একটা মিল দেখতে পেল রানা। অফিসার এবং সাধারণ কর্মী, সবার সাথে সহজ, হাসি-খুশি, মিলখোলা ব্যবহার, সবাই আলাদাভাবে যাতে মনে করে, সেই বোধহয় কমান্ডারের সবচেয়ে প্রিয়পাত্র। সবশেষে পেরিস্কোপ স্ক্রিনের কাছে বসে একজন অফিসারের সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। বয়স এত কম, মনে হলো এখনও হাইস্কুলে পড়ছে।

‘ইউবি এসিড,’ বললেন ক্যাপ্টেন। ‘এমনতে ওকে আমরা এক কানাকড়িও দাম দিই না, কিন্তু জাহাজ একবার বরফের নিচে পৌঁছলে আমাদের মধ্যে ওই হয়ে ওঠে সবচেয়ে দামী লোক। আমাদের নেভিগেশনাল অফিসার কি হে, আমাদের খোজ-খবর কিছু আছে, নাকি হারিয়ে গেছে?’

প্রটিং টেবিলের দিকে তাকাল এসিড। কাঁচের ভেতর নরওয়েজিয়ান সী-ব চার্ট, বিন্দুর মত খুঁদে একটা আলোর কণা দেখিয়ে বলল সে, ‘ওখানে রয়েছে আমরা, ক্যাপ্টেন। জাহাজ আর বিন্দু চেকিঙে রয়েছে, পজিশনে তুল পরিমাণ তুল হবারও সম্ভাবনা নেই।’

‘বিন্দু?’ জানতে চাইল রানা।

‘শিপ’স ইনারিশিয়াল নেভিগেশনাল সিস্টেম—এস.আই.এন.এস., এককালে ইন্টারকন্টিনেন্টাল মিসাইল গাইড করার জন্যে এই ডিভাইস ব্যবহার করা হত, ইদানীং সাবমেরিনকে গাইড করার জন্যে ওটার সাহায্য নেয়া হচ্ছে, বিশেষ করে নিউক্লিয়ার সাবমেরিনকে। আমি শুধু শুধু মুখ খরচ করব না, সুযোগ পেলে এসিডই আপনার কান ঝালাপালা করে ছাড়বে। চার্ট টেবিলের দিকে তাকালেন রাইকড। ‘আমরা কি খুব আস্তে-ধীরে যাচ্ছি, ডা. রানা?’

‘লেনিনগ্রাদের এই স্পীড, এখনও আমার বিশ্বাস হচ্ছে না,’ বলল রানা। ‘এ যেন চোখের নিম্নে কোথেকে কোথায় চলে এসেছি!’

‘বালটিক সাগর পেরিয়ে আসতে যতটা সময় লাগবে বলে আশা করেছিলেন ততটা লাগেনি, আটটার আগেই আমরা উত্তর সাগরে পড়েছিলাম। আমার ইচ্ছে ছিল ট্রিম অ্যাডজাস্ট করার জন্যে দ্রো টাইম ডাইভের আয়োজন করব, কিন্তু তার আর দরকার পড়েনি। নাকের দিকে বারোটা টপেডো কম থাকতেও লেনিনগ্রাদের পিছনটা ভারী হয়ে ডেবে যাচ্ছিল। আমাদের এই বাহিন আসলে এতই বড়, এখানে দেখানো দু’দশ টন কমবেশি হলেও তাতে কিছু আসে যায় না। কাজেই—’

কণার মাকখানে থেমে গিয়ে একজন নাবিকের হাত থেকে একটা সিগন্যাল শীট নিলেন কমান্ডার। সাবধানে, ধীরেসুস্থে পড়লেন সেটা। তারপর ঝুট করে মুখ তুললেন, হেঁটে গিয়ে দাঁড়ালেন কন্ট্রোল সেক্টরের নির্জন এক কোণে। রানা এগিয়ে আসছে দেখে ওর দিকে মুখ ফেরালেন তিনি। এখনও তাঁর মুখে হাসি নেই।

‘দুঃখিত,’ বললেন তিনি। ‘মেজর আজামাত কিরিম, স্টেশন নভেলির কমান্ডার। কাল বললেন, আপনার খুঁদে মনিষ্ট পুরানো বড়?’

রানা অনুভব করল, ওর মুখের ভেতরটা ওকিয়ে যাচ্ছে। মাথা ঝাঁকিয়ে ক্যাপ্টেনের হাত থেকে মেসেজটা নিল ও, পড়তে শুরু করল।

প্রাচীন যৌন সময় খনা-নয়-তার-পাচে ড্রিকট আইস স্টেশন নভেলির আরেকটা মেসেজ পাওয়া গেছে—খুঁদে দুর্বল আর ভাড়া ভাড়া, ডিসাইফার করা অত্যন্ত

কঠিন। এর আগের বডকাস্ট রিসিভ করেছিল ব্রিটিশ ট্রান্স ওশিয়া, এটাও ওই ওশিয়াই রিসিভ করেছে। মেসেজের যতটুকু পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে তা থেকে এইটুকু বোঝা যায়, মেজর আজামাত কিরিম, অফিসার কমান্ডিং, এবং অপর তিনজন লোক, যাদের নাম বলা হয়নি, হয় মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে, নয়তো মারা গেছে। এই চারজনের মধ্যে কে কে মারা গেছে, কিংবা কিভাবে মারা গেছে তার কোন আভাস পাওয়া যায়নি। আর সবাই, এদেরও সংখ্যা জানা সম্ভব হয়নি, পোড়া শরীর নিয়ে বোলা আকাশের নিচে পুকেছে। বারাতলাবার, ফুয়েল, আবহাওয়া এবং পরিবেশগত অবস্থা বা শারীরিক অক্ষমতা সম্পর্কে মেসেজে যা বলা হয়েছে তার পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি। জীবিতরা একটা ঘর থেকে বেরোতে পারছে না, কারণ আবহাওয়া খারাপ। তুষার ঝড়—শব্দ দুটো পরিষ্কার ধরা গেছে। মেসেজ রিসিভ করার পরপরই আইস স্টেশন নভেলির সাড়া পাবার চেষ্টা করে ওশিয়া, কিন্তু তার সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়নি। নোডিয়েত নৌ-বাহিনীর অনুরোধে ফিশিং গ্রাউন্ড ছেড়ে লিসনিং পোস্ট হিসেবে কাজ করার জন্যে ব্যারিয়ারের দিকে এগোচ্ছে ওশিয়া।

রানার হাত থেকে মেসেজটা নিয়ে কিছু গলায় আবার বললেন ক্যাপ্টেন রাইকড, ‘দুঃখিত, ডা. রানা।’

‘আজামাত কিরিমকে যতটুকু চিনি আমি,’ শান্ত গলায় বলল রানা, ‘সহজে হার মানার লোক সে নয়। নভেলিতে যদি একজন লোকও বেঁচে থাকে, তার আজামাত কিরিম হবারই সম্ভাবনা—অন্তত আমার তাই বিশ্বাস। চেষ্টা করলে তাকে আমরা হয়তো বাঁচাতে পারব। যেভাবেই হোক, নভেলির পজিশন জানতে হবে।’

‘সেটা হয়তো ওরা নিজেরাও জানে না,’ রাইকড বললেন। ‘জানেনই তো, ওটা একটা ড্রিফটিং স্টেশন। ওখানে আবহাওয়ার যা অবস্থা, শেখবার পজিশন জানার পর হয়তো কয়েকটা দিন পেরিয়ে গেছে। তাছাড়া, আমাদের জানা মতে, ওদের সোলারসিস্ট, ক্রনোমিটার এবং রেডিও ডিবেকশন ফাইন্ডার আওনে পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে।’

‘এক হুগা আগের পজিশন জানলেও চলবে,’ বলল রানা। ‘কি গতিতে এবং কোন দিকে ভেসে যাচ্ছে সে-সম্পর্কে ওদের একটা ধারণা না থাকার কোন কারণ নেই। আনুমানিক একটা কিছু হলেও চলবে। ওশিয়াকে বলা দরকার, ওরা যেন কোন বিরতি না নিয়ে ট্রান্সমিটার চালু রাখে। চেষ্টা করলে এখন শুধু ওরাই নভেলির সাড়া পেতে পারে। পজিশন চেয়ে ডাকতে থাকুক। এখন আপনি যদি পানির ওপর মাথা তোলেন, ওশিয়ার সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন?’

‘সন্দেহ আছে। ওশিয়া আমাদের প্রায় হাজার মাইল উত্তরে। আমাদের সিগন্যাল ধরবে, অত বড় রিসিভার নেই তার—মানে আমাদের ট্রান্সমিটার খুবই ছোট।’

‘বড় ট্রান্সমিটারের কোন অভাব নেই বি.বি.সি.-র, আপনারা নৌ-বাহিনীর স্কব-দফতরেও অনেক আছে,’ বলল রানা। ‘যাকে ইচ্ছে অনুরোধ করুন, সে যেন ওশিয়ার সাথে যোগাযোগ করে জানায়, নভেলির কাছ থেকে তার পজিশন জানতে হবে।’

‘কাজটা ওরাও সরাঁসরি করতে পারে।’
‘অবশ্যই পারে। কিন্তু উত্তরটা ওরা ওনতে পারে না। এপিয়া পারে—যদি কোন উত্তর থাকে।’
মাথা ঝাঁকালেন কমান্ডার রাইকড। ‘এখনি আমরা পানির ওপর উঠব।’ বলে হন হন করে চাইতিং স্ট্যান্ডের দিকে এগোলেন তিনি।
নিজের কেবিনে ফিরে এসে কটে শুয়ে পড়ল রানা।

চার

‘ওই দেখা যায় ব্যারিয়ার,’ বললেন কমান্ডার রাইকড।
উত্তর দিকে চলেছে লেনিনগ্ৰাদ, তার সিলিভার-আকৃতির প্রকাণ্ড কাঠামো একবার সম্পূর্ণ পানির তলায় তলিয়ে যাচ্ছে, পরমুহর্তে বিশাল এক একটা চেউয়ের মাথায় চেপে উঠে আসছে পানির ওপর। প্রচণ্ড শক্তি রাখে নিউক্লিয়ার-পাওয়ারড এঞ্জিন, কিন্তু এই মুহূর্তে তার বিশাল জোড়া-প্রপেলারকে খুব আস্তেই ঘোরাচ্ছে সে, স্পীড তিন নটেরও কম। ওরা বিজের যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে তিরিশ ফিট নিচে দুনিয়ার সেরা সোনার-ইকুইপমেন্ট লেনিনগ্ৰাদের চারদিকে পানিতে তীক্ষ্ণ নজর রাখছে, তবু ভাসমান কোন বরফের চাইয়ের সাথে ধাক্কা লাগার আশঙ্কা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না, তাই স্পীড বাড়ানোর কোন ঝুঁকি নিচ্ছেন না কমান্ডার। দুপুরের আর্কটিক আকাশ মেঘে মেঘে ঢাকা পড়ে আছে, আলো এত কম যে মনে হয় সন্ধে ঘনিয়ে আসছে। ব্রিজ থার্মোমিটার বলছে, সী টেম্পারেচার আটশ ডিগ্রী ফারেনহাইট, এয়ার টেম্পারেচার মোলো ডিগ্রী ফারেনহাইট। উত্তর থেকে ধেয়ে আসা জোর বাতাস ইম্পাত রঙের চেউয়ের মাথা থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সাদা মুকুট।

চেউয়ের মাথা থেকে বাতাসের হাতে চলে এসেই শক্তি বরফ হয়ে যাচ্ছে পানি, কনিং-টাওয়ারের খাড়া পায়ে বুলেটের গতিতে আছাড় খাচ্ছে সেগুলো।

ডাফল কোট আর অয়েলস্কিনের ভেতর ঠক ঠক করে কাঁপছে ওরা। ক্যানভাস উইন্ড-ডজারের আড়ালে গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওরা ক’জন। কমান্ডার রাইকডের লম্বা করা হাত অনুদলন করে দূরে তাকাল রানা। নাগরের একটানা গর্জন আর কনিং-টাওয়ারের গায়ে বরফ ভাঙার কান ফটানো আওয়াজ সবেও তার দোতে দোতে বাড়ি খাওয়ার শব্দ পরিষ্কার ওনতে পেরে ও।

দু’মাইলের কিছু এদিকে গোটা উত্তর দিগন্ত জুড়ে ধূসর-সাদা বস্তুর মোটা একটা সোখা দেখা গেল। দূর থেকে মনে হলো রেগাটা কোথাও তাইনি, সমরানে সমান আর মসৃণ। এর আগেও এই দেখা দেখেছে রানা, ওরান থেকেই পোলার আইস ক্যাপ-এর শুরু, যে বরফের টপি দুনিয়ার মাঝার দিকটাকে ঢেকে রেখেছে। বছরের এই সময়ে ওই বরফ সমাট বরবে দুনিয়ার ওদিকে আলাদা পর্যন্ত বিশাল একটা নিরেট অবিচ্ছিন্ন টুকরো হয়ে আছে। এই টুকরোর মিচ দিয়েই যেতে হবে

ওদেরকে। যেতে হবে কয়েকশো মাইল দূরে কোথাও হারিয়ে যাওয়া একদল লোককে খুঁজে বের করার জন্যে, যারা হয়তো এই মুহূর্তে মারা যাচ্ছে, কিংবা এরাই মধ্যে মারা গেছে।

শেব রিলে করা রেডিও মেসেজ পেয়েছে ওরা উল্লেখ্যশ ঘন্টা আগে। তাকপার থেকে অটুট হয়ে আছে নিরুত্তর। আইসস্টেশন নভেলির সাড়া পাবার জন্যে ব্রিটিশ ট্রান্স ওপিয়া গত দু’দিন থেকে প্রায় বিরতিহীন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু উত্তরের শূন্য খা-খা বরফের মরুভূমি থেকে নিরুত্তর ছাড়া কিছু আসছে না। কোন কথা নয়, কোন শব্দ নয়, নয় কোন সিগন্যাল, এমনকি দুবোটা কোন ফিসফাসও ওনতে পাওয়া যায়নি।

আঠারো ঘন্টা আগে আণবিক শক্তিচালিত মার্কিন আইসব্রেকার লভো ব্যারিয়ারের কিনারায় পৌঁছেছিল। বরফ ভেঙে ভেঙে ডোকার জন্যে আদা-জল খেয়ে বেপরোয়া একটা চেষ্টা চালায় ওরা। শীতের এই ওকালে আইস ক্যাপের বরফ এখনও তত পুরু আর ঘন হয়ে ওঠেনি, যেমন উঠবে মার্চের দিকে। অত্যন্ত মজবুত আর শক্তিশালী বলে লভোর সুখ্যাতি আছে, আঠারো ফিট উঁচু বরফ ভেঙে পথ করে নিতে পারে সে। অবশ্যওরা ভাল থাকলে বরফ ভেঙে সেই একেবারে নর্থ পোল পর্যন্ত পৌঁছে যাবার উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে তার। কিন্তু ভাসমান বরফের আকার আর ঘনত্ব সময়ের তুলনায় অস্বাভাবিক বেশি হওয়ায় তার সে-চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে। ব্যারিয়ার থেকে আইস ক্যাপের ভেতর দিকে চল্লিশ মাইল পর্যন্ত এগিয়েছিল সে, তারপর বিশ ফিট উঁচু আর সম্ভবত একশো ফিট গভীর একটা পাঁচিলের সামনে বাধা পেয়ে অভিযান বাতিল করে দিতে বাধ্য হয়। রিপোর্টে বলা হয়েছে, শেষ ক’মাইল পেরোতে গিয়ে পর পর কয়েকটা ধাক্কা খেয়ে মারা ফাকভাবে ক্ষতি হয়েছে তার বো’র, এবং পিছু হটে আইস প্যাক থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে প্রাপণে লুড়ে সে।

মার্কিনরা এখানেই থেমে থাকেনি। রাশিয়ানদের সাথে তারাও লং-রেঞ্জ বয়সের সাহায্যে গোটা এলাকার ওপর ব্যাপক তল্লাশী চালিয়েছে। গভীর মেঘ আর প্রবল তুষার ঝড়ের মধ্যে দিয়ে প্লেনগুলো তাদের অস্বাভাবিক শক্তিশালী রাডার নিয়ে কম করেও একশো বার খাওয়া আসা করেছে। কিন্তু কোথাও একটা রাডার সাইটিংয়ের রিপোর্ট পাওয়া যায়নি। বিশেষ করে স্ট্র্যাটেজিক এয়ার কমান্ডের বি-ফিফটি বয়সের ব্যর্থতা সংশ্লিষ্ট মহলের সবাইকে অবাক করে দেয়। বলা হয়, ঘন অন্ধকারেও নাকি দশ হাজার ফিট উঁচু থেকে একটা ঘরের সন্ধান বের করতে পারে তার রাডার। বি-ফিফটি-র ব্যর্থতার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, আঙন লাগার পর ঘরগুলোর বোধহয় আর কোন অস্তিত্বই নেই। বরফের ঢিবি আর বরফ মোড়া ঘর, রাডারের চোখ বোধহয় আলাদাভাবে এগুলোকে সনাক্ত করতে পারেনি। কেউ কেউ জানিয়েছে, তাদের ধারণা, তল্লাশীটা তুল জায়গায় ঢাকানো হয়েছে। সবচেয়ে হৃদয়যোগ্য ব্যাখ্যা এসেছে বয়সের পাইলটদের কাছ থেকে—এলাকাব ওপর ঘন মেঘ আর তুষারের মাতামাতিতে বাধা পেয়ে ছত্রাখান আর দিকভ্রান্ত হয়ে গেছে রাডারের ওয়েভ। কার্গু হাই হোক, আইসস্টেশন নভেলিকে এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। এমনভাবে হারিয়ে গেছে, যেন কোন কালে তার কোন অস্তিত্বই

ছিল না।

‘এখানে দাঁড়িয়ে বরফে জমতে থাকার কোন মানে হয় না,’ সাগরের গর্জন আর বরফ ভাঙার আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল কমান্ডার রাইকভের গলা। ‘বরফের তলায় ঢুকতে যখন হবেই, এখনি ঢুকে পড়া ভাল।’ বাতাসের দিকে পিঠ দিয়ে পশ্চিম দিকে তাকালেন তিনি। ওদিকে, সিকি মাইল দূরে একটা চওড়া আকৃতির ট্রলারকে দেখা গেল। গত দু’দিন থেকে আইস প্যাকের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে ওপিয়া—যান্ত্রিক কান পেতে তনছে, অপেক্ষা করে আছে। কিন্তু আর তার অপেক্ষা করার উপায় নেই, এবার তাকে ফিরে যেতে হবে নিজের ঠিকানায়। তার কুয়েলের রিজার্ভ শেষ হয়ে এসেছে।

‘এই মেসেজটা পাঠাও ওদের,’ পাশে দাঁড়ানো নাবিককে বললেন ক্যাপ্টেন। ‘ডাইভ দিতে যাচ্ছি আমরা, বরফের তলা দিয়ে এগাব। আগামী চারদিনের মধ্যে বোরোবার ইচ্ছে নেই, চোদ্দ দিন থাকার মত প্রস্তুতি নিয়ে যাচ্ছি।’ রানার দিকে ফিরলেন। ‘এই সময়ের মধ্যে ওদেরকে যদি বুজে না পাই—’ কথাটা তিনি শেষ করলেন না।

সম্রাতি জানাবার ভঙ্গিতে মাথা দোলাল রানা, কমান্ডার আবার মেসেজটা বলতে শুরু করলেন, ‘সহযোগিতার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ। ওভেরহা রইল। কামনা করি আপনারা যেন নিরাপদে ফিরে যেতে পারেন।’

সিগন্যালম্যানের ল্যাম্প মেসেজটা পাঠাতে শুরু করল। তারপর, ওপিয়া থেকে একটা উত্তরও এসে পৌঁছল।

‘কি বলল ওরা?’ জানতে চাইলেন কমান্ডার।

‘এই বরফের নিচে মাথা সামলে রাখবেন। শুভ লাক আন্ড শুভ বাই।’

‘সবাই নিচে,’ বললেন কমান্ডার।

মই বেয়ে ছোট একটা কম্পার্টমেন্টে নেমে এল রানা, তারপর একটা হ্যাচের ভেতর দিয়ে গলে বেরিয়ে এসে আরেকটা মই বেয়ে নামল সারমেরিনের প্রেশার হাউসে। এরপর আরেকটা হ্যাচ, আরেকটা মই—পৌঁছল লেনিনগ্রাদের কন্ট্রোল ডেকে। ওকে অনুসরণ করে এল কমান্ডার আর সিগন্যালম্যান। সবার পিছু পিছু এল লেফটেন্যান্ট কন্ডাক্টর, ওপরের ভারী, ওয়াটারপ্রুফ সবজা দুটো তাকেই বন্ধ করতে হয়েছে।

সারমেরিনের ডাইভ দেয়ার মুহূর্তটি খুব নাটকীয় করে দেখানো হয় দিনেয়ায়। কিন্তু কমান্ডার রাইকভের ডাইভিং টেকনিক অত্যন্ত সাদামাটা। কোনরকম বাস্তবতা নেই, উত্তেজনা নেই, চোখ কুচকে গাফা লোকজন কন্ট্রোল প্যান্ডলের ওপর ঝুঁকে পড়ল না, রুদ্ধশ্বাসে কেউ বলল না, ‘ডাইভ, ডাইভ, ডাইভ,’ তখন তখন শব্দ বেজে উঠল না ঘণ্টা। হাত বাড়িয়ে মাইক্রোফোন ধরলেন রাইকভ, শব্দ গলায় বললেন, ‘ক্যাপ্টেন বলছি। বরফের নিচে যেতে চাইছি আমরা। এখন ডাইভ দেব।’ মাইক্রোফোন ছেড়ে দিয়ে বললেন, ‘তিনশো ফিট।’

সাগরের দিকে খোলা সমুদ্র হ্যাচ, সারফেস ওপনিং এবং হালচ বন্ধ আছে কিনা চেক করার জন্যে আলোর পরিচালার ওপর চোখ বুলিয়ে মিল চীক ইলেকট্রনিক টেলিগ্রাফিয়ার। সবগুলো ডিস্ক লাইট নিচে গেছে, স্ট্রট লাইটগুলো

জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। এবার এক এক করে, আগের চেয়েও অলস ভঙ্গিতে, সবগুলো আলো চেক করল সে, তারপর ক্যাপ্টেনের দিকে ফিরে বলল, ‘স্ট্রেইট লাইন পাট, স্যার।’ মাথা ঝাঁকালেন ক্যাপ্টেন। জোরাল হিস হিস শব্দ করে স্ক্যানলিট ট্যাংক থেকে বেরিয়ে যেতে শুরু করল বাতাস।

দশ মিনিট পর এগিয়ে এসে রানার সামনে দাঁড়ালেন কমান্ডার। এই দু’দিনে নাবিক এবং মানুষ হিসেবে তাকে চিনে নিয়েছে ও। ভদ্রলোককে দারুণ পছন্দ হয়ে গেছে ওর, রীতিমত প্রজ্ঞা করতে শুরু করেছে। ফুদের সম্পূর্ণ আস্থা অর্জন করেছেন তিনি, তারা তাকে একাধারে বিশ্বস্ত বন্ধু, অভিভাবক এবং লীডার হিসেবে গ্রহণ করেছে। সবাই জানে তিনি সদাশাসনময়, হৃদয়টা কোমল এবং মহৎ। সারমেরিন সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ে বিপুল জ্ঞানের অধিকারী তিনি, খুঁটিনাটি বৈসাদৃশ্য তার দৃষ্টিকে ফাঁকি দেবে তার কোন উপায়ই নেই। ফুদের মুখে ওনে ইতিমধ্যে জেনেছে রানা, ক্যাপ্টেনের সবচেয়ে বড় গুণ, চরম বিপদেও তিনি উত্তেজিত বা বিচলিত হতে জানেন না। লেফটেন্যান্ট কন্ডাক্টর, লেনিনগ্রাদের একজিকিউটিভ অফিসার, যে কিনা কারও প্রশংসা করতে জানে না, তার মুখ থেকে শোনা গেছে, লিউ রাইকভ নাবিক দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ সারমেরিন অফিসার। কথাটা সত্যি হলে খুশি হবে রানা, কারণ এই পরিস্থিতিতে সেই রকম একজন লোকই দরকার ওর।

‘বরফের নিচে ঢুকতে যাচ্ছি আমরা, ডা. রানা,’ বললেন তিনি। ‘কেমন লাগছে আপনার?’

‘সাপের গর্তে ঢুকছি নাকি ইদুরের গর্তে, চোখে দেখতে পেলো বোধহয় একটু স্বত্তি বোধ করতাম।’

রানা যেমন কথায় বা আচরণে বুঝতে দেয়নি সে ক্যাপ্টেনকে পছন্দ করে, তেমনি ক্যাপ্টেনও রানাকে বুঝতে দেয়নি তিনিও রানাকে পছন্দ করতে শুরু করেছেন। যদিও রানার সাথে কথা বলার ভঙ্গি এবং পরিমাণ লক্ষ্য করলে ব্যাপারটা আঁচ করা যায়। মধুর একটু হেসে শুরু করলেন তিনি, ‘ইচ্ছে করলেই দেখতে পারি আমরা, লেনিনগ্রাদে আমাদের সাথে রয়েছে দুনিয়ার সেরা চোখ। এই চোখ নিচের দিকে দেখতে পায়, চারদিকে চোখ বুলায়, সামনে-পিছনে তাকায়, সোজা ওপর দিকে নজর ফেলে। নিচের দিকটা দেখে যে চোখ তার নাম ফ্যাদোমিটার বা ইকো-সাইটার। এর কাজ আমাদেরকে জানানো, কীলের নিচে পানির গভীরতা কতটুকু। এই মুহূর্তে আমাদের কীলের নিচে পাঁচ হাজার ফিট পানি রয়েছে, কাজেই কোন আভাবওয়াটার প্রজেকশনের সাথে ধাক্কা লাগার কোন সম্ভাবনাই নেই, তাবমানে, এই চোখের ব্যবহার এই মুহূর্তে একটা ফরমালিটি বৈ কিছু নয়। কিন্তু দায়িত্ব সচেতন কোন নেতিপেশন অফিসার বোতাম টিপে এই চোখ বন্ধ করে রাখবে না। সামনে এবং চারদিকে নজর রাখার জন্যে আমাদের রয়েছে একজোড়া সোনাল চোখ।’

মিটিমিটি হানছে রানা।

‘একটা সোনার ওপর দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে চলেছে, আরেকটা বো-র দু’দিকে পনেরো ডিগ্রী পক্ষে ওপর ফ্রান্সী চালাচ্ছে। সব ওনতে পায়, সব দেখতে পায়, রাজা নয়, নিরেট বাতর। বিশ মাইল দূরে একটা যুদ্ধ-জাহাজের ওপর কেউ একটা

হাতুড়ি ফেলুক, আমরা জানতে পারব। এটাও, ফরমালিটি ছাড়া কিছু নয়। যুদ্ধ-জাহাজ নয়, ওপরে ভেসে থাকা বরফের চাপে নিচের দিকে নেমে আসা আইস স্ট্যান্ডার্ডাইট খুঁজছে সোনার। যদিও বরফের নিচে পাঁচটা আর পোলার দিকে দুটো অভিযানে এ পর্যন্ত কোনো একটা আভ্যুত্থানের স্ট্যান্ডার্ডাইট বা দু'শো ফিটের বেশি গভীর বিজ্ঞ দেখিনি আমরা। এই মুহূর্তে আমরা তিনশো ফিট নিচে রয়েছি। তবু, চোখ জেলে রাখাই সবদিক থেকে ভাল।' কথা শেষ করে মৃদু হাসলেন কমান্ডার। তারপর বললেন, 'আপনার মুচকি হাসি দেখে বোঝা গেছে, এসব বিষয়ে আপনি আলিই জানেন। বাধা দিয়ে আমাদের কথা বলার আনন্দ থেকে বঞ্চিত করেননি, সেরেনো আমি কৃতজ্ঞ।'

এ প্রসঙ্গে কথা খরচ না করে জানতে চাইল রানা, 'বরফের সাথে না হোক, একটা তিমির সাথেও তো থাকা লাগতে পারে?' আসলে রসিকতা করল ও।

'আরেকটা সাবমেরিনের সাথে থাকা লাগতে পারে,' কথাটা বলার সময় কমান্ডারের মুখে হাসি দেখা গেল না। 'তার মানে হবে, দু'দলেরই ধ্বংস হয়ে যাওয়া। রাশিয়া আর আমেরিকা দুনিয়ার চাঁদির ওপর যেভাবে আলা-গোনা শুরু করেছে, আভ্যুত্থানের পোলার আইস স্ক্যাপ বাস্তব চৌরাস্তা হয়ে উঠতে যাচ্ছে।'

'তারমানে কি সত্যি...'

'দশ হাজার বর্গ মাইল আকাশে দুটো প্লেনের মুখোমুখি সংঘর্ষের সম্ভাবনা কতটুকু? কতজনে হিসেবে দেখা যাবে, কোন সম্ভাবনাই নেই। অথচ এ বছর এরই মধ্যে এ-ধরনের দুর্ঘটনা তিন-তিনটে ঘটে গেছে। তাই সোনার চোখ খোলা রাখি আমরা। কিন্তু ওপর দিকে নজর রাখে যে চোখ সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দেখবেন, আসুন।'

রানাকে নিয়ে কন্ট্রোল রুমের আফটার-স্টারবোর্ড প্রান্তে চলে এলেন কমান্ডার। এখানে ডা. ক্রুডেনকো একজন লোককে সাথে নিয়ে কাঁচ-ঢাকা একটা আই-লেভেল মেশিনের ওপর বৃকে আছে। মেশিনের বাইরের দিকে দেখা গেল সাত ইঞ্চি চওড়া কাগজের একটা রিবন, ঘুরছে। কালি লাগানো একটা স্টাইলান্স সেই রিবনের ওপর সরু, সরল রেখা টানছে। হাত বাড়িয়ে ক্যালিড্রেটেড কন্ট্রোল অ্যাডজাস্ট করল ক্রুডেনকো।

'সারফেস স্ক্যানোমিটার,' কমান্ডার বললেন। 'আইস মেশিন বলে এক ভাবে চেনে সবাই। এটা ডা. ক্রুডেনকোর পৈত্রিক সম্পত্তি নয়, অপারেট করার জন্যে দু'জন ট্রেনিং পাওয়া লোক আছে আমাদের, কিন্তু কোর্ট-মার্শাল না করা পর্যন্ত ডাক্তারকে এটা থেকে আলাদা করা যাবে না বলে অগত্যা তার হাতেই সাঁপে দিয়েছি।' দৈত্যো হাসি দেখা গেল কমান্ডারের মুখে, কিন্তু চোখ দুটো মুহূর্তের জন্যেও স্টাইলান্সের ওপর থেকে সরল না। 'ইকো-সার্টাইজিং মেশিনের মহতী কাজ করে এটা। বরফের গায়ের লেপে ফিট করে আসে প্রতিফলিত আলো যদি বরফ থাকে। সরু কালো রেখাটা দেখছেন, ওইটাই আসল হলো, ওপরে খোলা পানি রয়েছে। আমরা যখন বরফের নিচে চলে যাব, ওপর দিকে খাড়া একটা গতি যোগ্য হবে স্টাইলান্স, 'হাত ওধু যে বরফের উপস্থিতি ঘিরে পানি বই নয়, বরফ ওখানে কতটুকু পুরু তাও জানতে পারব।'

'চমৎকার।'

তারচেয়েও বেশি। বরফের নিচে এটা হয়ে উঠতে পারে লেনিনগ্রাদের জীবন অথবা মৃত্যুর কারণ। ড্রিফট আইস স্টেশন নভেলির জন্যে এটা জীবন-মৃত্যু তো বটেই। নভেলির পজিশন যদি শেষ পর্যন্ত আমরা জানতেও পারি, তার কাছে পৌঁছতে হলে আমাদেরকে বরফের এই ছাদ ফুঁড়ে ওপরে উঠতে হবে। বরফ কোথায় পাতলা তা একমাত্র এই মেশিনই আমাদেরকে জানাতে পারে।'

'বছরের এই সময়ে তবে কি খোলা পানি থাকে না? কিংবা এক-আধটা ফ্রাক-কোকর?'

'আমরা একে বলি পলিনাইয়া। নেই। মনে রাখতে হবে, আইস প্যাক কখনোই নিষ্ঠল নয়, এমনকি শীতকালেও নয়। সারফেস-প্রেশারের অদল-বদল কদাচ বরফকে ভেঙে মাঝখানে খোলা পানি এক্সপোজ করতে পারে। শীতের সময় ওখানে যে এয়ার টেম্পারেচার, খোলা পানি কতক্ষণ তরল থাকতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যায়। পাঁচ মিনিটের মধ্যে তার গায়ে পাতলা বরফের একটা চামড়া পড়ে যায়, এক ঘণ্টা মধ্যে সেই চামড়া এক ইঞ্চি পুরু হয়ে ওঠে, দু'দিন পর দেখা যায় সেটা এক ফুট পুরু হয়ে গেছে। এই রকম একটা পলিনাইয়ার দেখা যদি মেলে, যার বয়স তিন দিনের বেশি নয়, তাহলে সেটা ভেঙে বরফের ওপর উঠে যাবার ভাল সুবিধে হতে পারে।'

'কনিং-টাওয়ার একটা বাধা হয়ে দাঁড়াবে না?'

'আমরা নাবিকরা ওটাকে সেইল বলি। নিউক্লিয়ার সাবমেরিনের সেইল বিশেষ ভাবে মজবুত করে তৈরি করা হয় শুধু এই একটা কারণে, যাতে আর্কটিক বরফ ভেঙে ওপর দিকে উঠতে পারে। যদিও, অপারেশনটা খুব সাবধানে, আন্তে-বীরে সারতে হয়। কারণ, ধাক্কাটা প্রেশার হালেও গিয়ে পৌঁছায়।'

কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করে প্রশ্ন করল রানা, 'লেনিনগ্রাদ যদি খুব জোরে ওপর দিকে ওঠার চেষ্টা করে, প্রেশার হালের কি হবে? যতটুকু বুঝি, 'হ্যাৎ করে স্যালাইনিটি এবং এয়ার টেম্পারেচারে পরিবর্তন দেখা দিলে এর দরকার হতে পারে। আপনি হয়তো শেষ মুহূর্তে টের পেলেন পাতলা বরফের নির্দিষ্ট পয়েন্ট থেকে সরে গেছেন আরেক দিকে, এবং আপনার মাথার ওপর রয়েছে দশ ফিট নিরেট বরফ?'

'এ নিয়ে কথা তো বলবেনই না, চিন্তাও করবেন না। ঘাড়ের ওপর যে দায়িত্ব রয়েছে তাতে দুঃস্বপ্ন দেখা পোষাবে না আমার।' ভাল করে তাকাল রানা, কিন্তু কমান্ডারের চেহারায় হাসির কোন আভাস পেল না। আগের চেয়ে নিচু গলায় বললেন তিনি, 'আমরা যখন বরফের নিচে দিয়ে যাই, জরুরের সবাই এক-আধটা ভয় পায়ই। অস্ত্রত আমি পাই। জানি, আমাদের এটা দুনিয়ার সেরা সাবমেরিন, কিন্তু একশো একটা গোলযোগ দেখা দিতে পারে। রিফাইলিং, স্টীম টারবাইন কিংবা জেনারেটরের যদি কোন গোলমাল দেখা দেয়, ধরে নিতে হবে আমরা শেল। খোলা সাগরে এসব কোন সমস্যা নয়, ভুল করে পানির ওপর জেলে উঠতে পারি কিংবা সারফেসের কাছাকাছি থেকে ভিজেল ব্যবহার করে এমোতে পারি। কিন্তু ড্রিজেল ব্যবহার করতে হলে বাতাস দরকার হবে, এবং আইস প্যাকের নিচে ওই জিনিসটা

নেই। কাজেই, খারাপ কিছু একটা যদি ঘটেও, আমাদেরকে যেমন করে হোক একটা পলিনাইয়া মুখে বের করতে হবে ওপরে ওঠার জন্যে, যদিও বছরের এই সময় সেটা পাবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। আবার, পলিনাইয়াটা পেতে হবে আমাদের স্ট্যান্ডবাই ব্যাটারি শেষ হয়ে যাবার আগেই।

‘এসব কথা শুনে খুব উৎসাহ বোধ করছি।’

‘আসলে ঘাবড়াবার কিছু নেই।’ অনেককণ পর এই আবার কমান্ডারের মুখে হাসি দেখল রানা। ‘এ-ধরনের কিছু ঘটেনি কখনও, ঘটবেও না। ওহে, ডাক্তার কডেনকো, কিছু স্ববরাখবর দেবে নাকি?’

‘এই যে, ক্যাপ্টেন,’ সাড়া দিল ডাক্তার কডেনকো, ‘প্রথম বরফের টাই। আরেকটা। আসুন না, দেখে যান। ডা, রানা, আপনিও আসুন। আরেকটা?’

আইস-মেশিনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। স্টাইলস থেকে এখন মনু একটা হিস চিল শব্দ বেরিয়ে আসছে। খানিক আগে পর্যন্ত কাগজের ওপর হরাইজন্টাল রেখা আঁকছিল, এখন রেখাটা ঘন ঘন ওপর-নিচে ওঠা নামা করছে। এর মানে হলো, ওদের মাথার ওপর দিয়ে সারমেরিনের পিছন দিকে সরে যাচ্ছে বরফের টাই। একটা করে বরফের নিচে আসে জাহাজ, কাগজের ওপর সরল রেখাটা উঠে-নিচে হতে থাকে। বরফের ভাসমান দ্বীপ একের পর এক আসছেই, একসময় কাগজে আর সরল রেখার কোন অস্তিত্বই থাকল না।

‘আইস প্যাকের তলায় চলে এসেছি,’ বললেন কমান্ডার। ‘এবার আমরা লেনিনগ্রাদকে আরও গভীরে নিয়ে যাব। তারপর খুলে দেব ওর সমস্ত বাঁধন।’

লেনিনগ্রাদের সমস্ত বাঁধন খুলে দেবার অর্থ পরদিন খুব সকালে টেন পেল রানা। কাঁধে হাতের মনু স্পর্শ পেয়ে গভীর ঘুম থেকে জেগে উঠল ও। চোখ মেলতেই ওজারহেড লাইটে ধাধিয়ে গেল চোখ। আলো একটু সয়ে আসতে দেখল, চেহারায ক্ষমা-প্রার্থনার হাসি নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে আছে লেফটেন্যান্ট রুস্তভ।

‘দুঃখিত, ডা, রানা,’ গলায় আওয়াজে কিন্তু না আছে দুঃখ, না আছে ক্ষমা-প্রার্থনার সুর। ‘আমরা পৌঁছে গেছি।’

‘পৌঁছে গেছি? কোথায়?’

‘৮৫°৩৫’ উত্তর, ২১°২০’ পূর্ব—শেষ হিসেবে ড্রিফট স্টেশন নভেলির পজিশন। পোলার আইস ভেসে যাওয়ার গতি মনে রেখে নতুন করে এই আনুমানিক হিসেব বের করা হয়েছে। উঠে পড়ো।’

‘এরই মধ্যে?’ রিস্টওয়াচের ওপর চোখ বুলাল রানা। ‘এত তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেলাম?’

‘আমরা অল্প, এ বদনাম কেউ দিতে পারবে না। ক্যাপ্টেন আশা করছেন, লাগে থেকে দুনি আমালের কাজ যার করা হবে।’

‘এই এনাম বলে,’ নভেলির পজিশনে পৌঁছে গেছে মানে লেনিনগ্রাদ এবার বরফ ভেদ করে মাথাচাড়া দেবার চেষ্টা করবে। নভেলির সাথে রেডিও যোগাযোগ হবার সম্ভাবনা মশ হাজার ভাগেও এক ভাগ মাত্র, তবু যদি যোগাযোগ হয় বা মশ হবে, ওখানে রানা উপস্থিত থাকতে চায়।

কন্ট্রোল রুমে প্রায় পৌঁছে গেছে ওরা, এই সময় প্রায় ছিটকে পাসেসজওয়ের দেয়ালে পাকা খেতে যাচ্ছিল রানা। হাত-বেরেল ধরে শেখমুহুর্তে সামনে নিল বাট, কিন্তু পরমুহূর্তে আরেক দিকে কাত হয়ে পড়ল লেনিনগ্রাদ, যেন কোন ফাইটার গ্লেন হঠাৎ করে ব্রীক বাক নিতে শুরু করেছে। রানার জানামতে, কোন সারমেরিনের এই আচরণ করার কথা নয়।

‘আমার নাচ দেখবে বলে ভেবে এনেছ?’ জানতে চাইল রানা, ‘সামনে কোন বাধা ছিল, লেনিনগ্রাদ বোম্বাইয়ে সেটা এডান, তাই না?’

‘নিশ্চয়ই সম্ভাব্য কোন পলিনাইয়া। কিংবা বরফ ওখানে পাতলা দেখা গেছে। এ-ধরনের একটা কিছু দেখা গেলেই কুকুর যেমন তার লেজকে বাওয়া করে সেটাকে হারিয়ে ফেলার ভয়ে, আমরাও প্রায় তাই করি। এর জন্যে জুদের মধ্যে আমরা খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছি, বিশেষ করে তারা যখন সুপ বা কফি খায়।’

‘জুদের মধ্যে আমি থাকলে বিদ্রোহ করতাম।’

কন্ট্রোল রুমে ঢুকে রানা দেখল, দু’পাশে নৈভিগেটর আর একজন লোককে নিয়ে প্রুটিং টেবিলের পের বুক দাঁড়িয়ে আছেন কমান্ডার বাইকভ, কি যেন গভীর মনোনিবেশের সাথে লুক করেছেন তিনি। আরও সামনের দিকে সারফেস স্ক্যানারের সামনে দাঁড়িয়ে একজন লোক শান্ত, নিরুদ্ভিগ গলায় বরফের ধরন ঘোষণা করছে।

নিধে হয়ে দাঁড়ালেন কমান্ডার। ‘মর্নিং, ডা, রানা। ইউরি, মনে হয় এখানে হয়তো একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।’

এগিয়ে গিয়ে প্রুটিং টেবিলের সামনে দাঁড়াল লেফটেন্যান্ট। কাঁচ ঢাকা টেবিলের নিচে একটা চৌকো চার্ট দেখা গেল, বিন্দুর মত একটা আলোর কণা সেই চার্টের ওপর জ্বলজ্বল করছে। আলোর কণা চার্টের ওপর দিকে এগিয়ে এসেছে, কেউ একজন পেপিলের সুরা ডগা দিয়ে চিহ্নিত করে রেখেছে পথটাকে। কাগজের ওপর তিনটে লাল ক্রস চিহ্ন দেখল রানা। দুটো একেবারে গা বেঁয়ে। আইস মেশিনের দিক থেকে একটা শব্দ ভেসে এল, সাথে সাথে চার্টের ওপর পড়ল চার নতুন ক্রস চিহ্ন। রানা লুক করল ডা, কডেনকো নয়, আইস মেশিনে অন্য লোক রয়েছে।

মুখ তুলল লেফটেন্যান্ট। ‘ঠিক বলেছেন, ক্যাপ্টেন। হয়তো একটা সম্ভাবনা। তবে খুব সূচ লগছে আমার কাছে।’

‘আসলেও তাই,’ বললেন কমান্ডার। ‘কিন্তু গঠ এক ঘণ্টায় তারা বরফের মধ্যে এটাই প্রথম ব্লক। তাছাড়া, আরও বড় উজ্জব যান, পাতলা বরফের দেখা পাবার সম্ভাবনা ততই কমে আসবে। এটাকেই খুঁটিয়ে দেখা যাক। স্পীড?’

‘এক নট,’ সবচেয়ে অল্প-বয়েসী অফিসার ওসিপভ বলল।

কমান্ডার অর্থাৎ দিলেন, ‘অল বাক ওয়ান থার্ড।’

ক্রিপ্ত হাতে একজন জুকে ডাইনিং-স্টাভ বাকের দাঁড়ির সাথে সেরটি বেন্ট দিয়ে বেঁধে ফেলা হলো। লেনিনগ্রাদের দিকে বুক পড়ে এগিল কমান্ডার নির্দেশ দিল সে, ‘লেফটী ফুল হাউস।’

প্রুটিং চেক করার জন্যে টেবিলের ওপর বুক পড়লেন বাইকভ। আলোর কণা

আর ট্রেনিং পেলিল ফিরে আসছে, ফিরে আসছে চারটে ক্রস চিহ্ন দিয়ে তৈরি ত্রিভুজের প্রায় মাঝামাঝি জায়গায়। 'অল স্টপ,' বললেন তিনি। 'বাজার আমিডশিপ।' একটু বিরতি, তারপর আবার, 'অল অ্যাহেড ওয়ান থার্ড। নো। অল স্টপ।'

'স্পীড জিরো,' বলল ওসিপভ।

'টোয়েন্টি-ওয়ান...টোয়েন্টি ফিট।' ডাইভিং অফিসারের দিকে তাকালেন কমান্ডার। 'কিন্তু ধীরে-সুস্থে, ধীরে-সুস্থে।'

জোরান একটা যান্ত্রিক ওজন শোনা গেল। লেফটেন্যান্টকে জিজ্ঞেস করল রানা, 'ব্যালাস্ট খালি হওয়ার আওয়াজ?'

মাথা নাড়ল লেফটেন্যান্ট। 'ব্যালাস্ট খালি হচ্ছে বাটে, কিন্তু আওয়াজটা পাম্পের। ব্যালাস্ট থেকে পাম্প করে বের করে দেয়া হচ্ছে পানি—সব এক সাথে নয়, রয়ে-সয়ে। এতে করে ওপরে ওঠার গতি নিজেদের কন্ট্রোলের মধ্যে থাকে, সাবমেরিনের কীলও সমান রাখা সহজ হয়, সামনের দিকে বুকে বা পিছন দিকে ডেবে যাবার সম্ভাবনা কম থাকে। স্টার্ট বন্ধ করা একটা সারকে, কীল সমান রেখে ওপরে তোলা অনভিজ্ঞদের কাজ নয়। সাধারণ কোন সাব এই টেকনিক কাজে লাগাবার কথা ভারতেই পারে না।'

পাম্পের আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল। ট্যাংকে পানি ফিরে আসার শব্দ পেল ওরা। ডাইভিং অফিসার ওপরে ওঠার গতি কমিয়ে আনল। শব্দটা নিবৃত্ত হতে হতে মিলিয়ে গেল।

'সিকিউর ফ্রাডিং,' বলল ডাইভিং অফিসার। 'স্টেডি অন ওয়ান হানড্রেড ফিট।'

'আপ পেরিস্কোপ,' পাশে দাঁড়ানো জু-মানকে বললেন কমান্ডার।

টেনে অন করা হলো একটা ওভার হেড লিডার, হাই-প্রেশার অয়েলের হিসহিস শব্দে পেল সবাই, সেই সাথে স্টারবোর্ড পেরিস্কোপকে তার খোপ থেকে ওপরে তুলতে শুরু করল হাইড্রলিক পিস্টন। চকচকে সিলিন্ডার আকৃতির পেরিস্কোপ বেরিয়ে এল, হাতল ধরে বুকে পড়লেন কমান্ডার, চোখ রাখলেন আই-পীসে।

'একে অন্ধকার, তার ওপর আমরা রয়েছি সাগরের কয়েকশো ফিট নিচে, বরাফের তলায়—কি দেখতে পাবেন বলে আশা করছেন ক্যাপ্টেন?' জানতে চাইল রানা।

'বলা মুশকিল। সাগরের তলা পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে আছে। এটা একটা দুর্লভ ঘটনা। আকাশে টান থাকতে পারে, তারা থাকতে পারে—হ্যাঁ, তারার আলোও অনেক গভীর পর্যন্ত নেমে আসে। শুধু হয়তো ক্ষীণ একটা আলোর আভাস মাত্র, তবে পাতলা বরফ ভেদ করে নেমে আসতে পারে।' রানার দৃষ্টি কমান্ডারের দিকে আকৃষ্ট করল লেফটেন্যান্ট। 'লক্ষণ ভাল না। হ্যাড-লিট মুচডে পেরিস্কোপ লোকটাকে ওপর দিকে তাক করছেন উনি। আর পাশের ওই রোভামটা ফোকালিস্টের জন্যে। তারমানে, কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না।'

সিধে হলেন কমান্ডার। 'যন কালো অন্ধকার। হাল আর সেইল ফ্রাডলাইট

অন।' এক সেকেন্ড পর আবার তিনি আই-পীসে চোখ রাখলেন। প্রায় সাথে সাথে সিধে হলেন আবার, 'কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ক্যামেরা অন।'

লেফটেন্যান্টের দিকে ফিরল রানা। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে সাদা একটা ক্রীনের দিকে তাকাল। 'ফ্রাডলাইট টিভি, ডাক্তার। ডেকের ওপর বসিয়ে কাঁচ দিয়ে ঘিরে দেয়া হয়েছে ক্যামেরাটাকে, ওপর আর চারদিকে নজর বুলাতে পারে—রিমোট-কন্ট্রোলড।'

আপসা, ধূসর আর ছায়াহীন দেখাল টিভি ক্রীন। 'নতুন একটা ক্যামেরা কিনলেই পারতে।' বলল রানা।

'এরচেয়ে নতুন আর নামী ক্যামেরা বাজারে নেই,' হেসে উঠে বলল লেফটেন্যান্ট। 'আপসা লাগছে পানির জন্যে। বিশেষ একটা টেম্পারেচার আর লবণাক্ত পরিবেশে ফ্রাডলাইটের আলো পেলেও ক্যামেরার চোখে কিছু ধরা পড়ে না। যন কুয়াশার মধ্যে হেডলাইট জ্বলে গাড়ি চালানোর মত অবস্থা আর কি।'

'ফ্রাডলাইট অফ,' শান্ত সুরে বললেন কমান্ডার। টিভি ক্রীন সাদা হয়ে গেল। 'ফ্রাডলাইট অন।' আগের মতই ধূসর আর আপসা দেখাল আলোকিত পর্দা। ফোকাস করে একটা দীর্ঘস্থায়ী ফেলে লেফটেন্যান্টের দিকে ফিরলেন তিনি। 'কি বুঝ, ইউরি?'

'বেতন কাটা হবে না, এই অভয় দিলে আমি একটু করনার আশ্রয় নিতে পারি,' বলল লেফটেন্যান্ট। 'ক্রীনের বা কোণে ওটা বোধহয় আপসা মত আমি সেইলের মাথাটা দেখতে পাচ্ছি। বড় বেশি অন্ধকার, ক্যাপ্টেন।'

কমান্ডার জিজ্ঞেস করলেন, 'আমরা কি পজিশনে স্থির আছি?'

'বলতে পারছি না,' প্রুট থেকে মুখ তুলে বলল ওসিপভ। 'ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।'

'ড্যালেনকড?' আইস মেশিনের লোকটাকে জিজ্ঞেস করা হলো।

'পাতলা বরফ, ক্যাপ্টেন। এখনও।'

'জানাতে থাকো। ডাউন পেরিস্কোপ।' ভাঁজ করে হাতলটা ওপরে তুলে দিলেন কমান্ডার, ফিরলেন ডাইভিং অফিসারের দিকে। 'এমনভাবে ওপরে ওঠাও, সেইলের ওপর আমরা যেন এক কুড়ি ডিম রেখেছি, তার একটাতেও চিড়ু খরাতে চাই না।'

আবার শোনা গেল পাম্পের আওয়াজ। কন্ট্রোল রুমের চারদিকে তাকাল রানা। সবাই শান্ত, স্থির এবং যে যার কাজে মগ্ন। একেবারে নিচু গলায় বারবার আওয়াজে ড্যালেনকড: 'পাতলা বরফ, পাতলা বরফ।' রানার মনে হলো, বাতাসে টান টান হয়ে থাকা উত্তেজনাটুকু হাত বাড়ালেই স্পর্শ করা যাবে।

'নাইনটি ফিট,' ডাইভিং অফিসার জানাল।

'পাতলা বরফ, পাতলা বরফ।'

'ডেক ফ্রাড অফ, সেইল ফ্রাড অন।' এখনও কমান্ডারের কথায় বা চেহারাতে উত্তেজনার লেশমাত্র নেই। 'ক্যামেরা মোরাতে থাকো। সোনার?'

'অল ক্লিয়ার, সাথে সাথে জ্বাব দিল সোনার অপারেটর। 'অল ক্লিয়ার অল রাউন্ড।' কয়েক সেকেন্ড বিরতির পর হঠাৎ উত্তেজিত সুরে জানাল সে,

না—খামুন! কন্ট্রাক্ট ডেড আসটার্ন।

দ্রুত জানতে চাইলেন কমান্ডার, 'কত কাছে?'

'এত কাছে যে আন্দাজ করা কঠিন। খুব বেশি কাছে।'

'নি ইজ জাম্পিং?' তাঁর কাছে জানাল ডাইভিং অফিসার। 'এইটি ফিট, সৈতেনটি ফাইট। হয় আরও ঠাণ্ডা একটা পানির স্তর নতুনো অতিরিক্ত লবণাক্ততার মধ্যে গিয়ে পড়েছে লেনিনগাদ।'

'ভারী বরফ! ভারী বরফ! গলার শিরা ফুলে উঠল ড্যালেনকভের।'

'মুড ইমার্জেন্সী!' কমান্ডার গলার আওয়াজ এবার অর্ডারের মতই শোনাল।

হঠাৎ তৈরি বাতাসের চাপ অনুভব করল বানা। নৈশগতি ট্যাংকের পক্ষ খুলে দিয়েছে ডাইভিং অফিসার এবং ইমার্জেন্সী ডাইভিং ট্যাংকে টিন টিন পানি ঢুকছে। কিন্তু দেবি যা হবার হয়ে গেছে। সবাইকে টুলিয়ে দিয়ে ওপরের বরফের সাথে প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেলো বেনিনগাদ। স্বন স্বন কাঁচ ভাঙার আওয়াজ শোনা গেল, সবগুলো ওভারহেল্ড লাইট নিভে গেল। ভারী পাথরের মত পতন শুরু হলো সাবমেরিনের।

'স্লো নেগেটিভ টু দি মার্ক।' ডাইভিং অফিসার জানাল।

দু'শো ফিট, আড়াইশো ফিট—এখনও নেমে যাচ্ছে লেনিনগাদ। কারও মুখে কথা নেই, এক চুল নড়ছে না কেউ, সবাই স্থির চোখে তাকিয়ে আছে ডাইভিং স্ট্যান্ডের দিকে। পরিষ্কার বোধা গেছে, কোন আভ্যন্তরীণ প্রেশার রিজের সাথে ধাক্কা খেয়েছে লেনিনগাদের পিছনটা, একই সময় ওপরের ভারী বরফের সাথে টক্কর রেয়েছে তার স্টেইল। পিছনে যদি লেনিনগাদ ফুটো হয়ে বা ফেটে গিয়ে থাকে, যতক্ষণ না কোটি কোটি টিন পানির চাপে এটা চিড়ে-চাপ্টা হচ্ছে ততক্ষণ তার এই পতন থামবে না।

'তিনশো ফিট,' জানাল ডাইভিং অফিসার। 'সাড়ে তিনশো—এবার মস্তর হয়ে আসছে নামার গতি। ধানছে।'

এখনও নামছে লেনিনগাদ, অলস ভঙ্গিতে চাবশো ফুট মার্ক পেরিয়ে আসছে ক্রাউ। এই সময় এক হাতে টুল কিট, আরেক হাতে ল্যাম্প নিয়ে কন্ট্রোল রুমে ঢুকল গ্যাংকো।

'সব সময় আমি এর বিরোধিতা করে এসেছি,' বলল সে। 'মনে হলো প্রটেক্স ওপর ফুলে ধাকা নষ্ট ল্যাম্পের সাথে কথা বলছে। কারও দিকে না তাকিয়ে সেটা মেরামত করতে লাগে গেল। সাপরের পতীরে নাক গলবার অনুমতি দেয়া হয়নি মানুষকে। এটা প্রকৃতির বিরাট। এই আমি বলে রাখলাম, যতই নতুন নতুন টুবোজাহাজ বানাও, প্রকৃতি যখন প্রতিশোধ নেবে সব চূনবার হয়ে যাবে।'

'তুমি যদি বুকবফানি না খাওয়াও, পড়িই তাই হবে,' তিরু কণ্ঠে বললেন কমান্ডার, যদিও তার চেহারায়া বাগ বা সিরাজির কোন চিহ্ন দেখা গেল না। মনে মনে তিনি বোধহয় খুশিই হয়েছেন, যিনি টিন উল্লেখনার মধ্যে গ্যাংকোর কথাগুলো গুরুত্বপূর্ণ বানিকটা হালকা ভাবে এনে দিল। 'হোজিং?' ডাইভিং অফিসারকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

একটা আঙুল বাড়ী করে নিশেলে হকিন ডাইভিং অফিসার। মাথা কাঁকিয়ে হাত বাড়ালেন ক্যান্টেন, বাহিরের কোন থরে মুখের সামনে টোনে নিয়ে এলেন।

'ক্যান্টেন বলছি।' চেহারায়া বা বনার ভঙ্গিতে কোন বকম ব্যস্ততা বা অস্থিরতা নেই। 'বাক্স লাগার জন্যে দূষিত। কি ক্ষতি হয়েছে না হয়েছে এখনি রিপোর্ট করো।' তার পাশের একটা প্যানেলে সবুজ আলো জ্বলে উঠল, হাত বাড়িয়ে একটা সুইচ অন করলেন তিনি। সিলিঙের আড়াল থেকে ভেসে এল লাইটস্পীকার জ্যাক হলে ওঠার ঘড়ঘড় শব্দ।

'ম্যানুভারিং রুম।' আগার-লেভেল এগুনি রুমের পিছন দিকে ওটা। 'সবাসরি আমাদের মাথার ওপরে লেগেছে ধাক্কাটা। এক বাস্ক মোমবাতি, কিছু ডায়াল আর পজ লাগবে। চিত্তার কিছু নেই, মাথার ওপর এখনও হান আছে।'

'দ্যাবাদ, লেকটেন্যান্ট। সামলাতে পারবে তো?'

'পারব, কমারেড ক্যান্টেন।'

আরেকটা সুইচ অন করলেন কমান্ডার। 'স্টার্ন রুম?'

'এখনও জাহাজের সাথে আছি তো আমরা?' এক সেকেন্ড ইতস্তত করে, অত্যন্ত সাবধানে জানতে চাইল একজন লোক।

'আহ,' আশ্বাস দিয়ে বললেন রাইকভ। 'রিপোর্ট করার আছে কিছু?'

'জাহাজের নোংরা কাপড় নিয়ে পোল্যাডে ফিরতে হবে আমাদের, ক্যান্টেন। ধাক্কা লাগার বোধহয় অপমান বোধ করেছে, সেই থেকে ওয়াশিং মেশিনটা চালু হতে চাইছে না।'

মুদু হেসে সুইচ অফ করে দিলেন কমান্ডার। চেহারায়া উদ্বেগের কোন ছাপ নেই। রান্না ভাবল, লোকটার মুখের কোথাও নিশ্চয়ই ঘাম ওকাবার মেশিন লুকানো আছে। ওর নিজের অবস্থা—হাতের কাছে তোয়ালে থাকলে এতক্ষণে বোধহয় ভিজ্ঞে যেত সেটা।

লেকটেন্যান্ট রুমের সাথে কথা বলছেন কমান্ডার। 'কপাল মন্দ, বুঝলে। নোতের-বহুমুখী ধারা, ওখানে ওটা থাকার কথা ছিল না। টেম্পারেচারের আকস্মিক পরিবর্তন, হবার ছিল না। তার ওপর একটা প্রেশার রিজ, ওখানে থাকতে পারে বলে আশাই করিনি।'

'এখন আমরা—'

লেকটেন্যান্টের প্রশ্ন শেষ হবার আগেই উত্তর দিলেন কমান্ডার, 'আবার চেষ্টা করব।'

রান্নার ইচ্ছে হলো হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ডুক আর কপালের ঘাম মোছে, কিন্তু গর্ব জুগ হবে ভেবে ক্ষান্ত হলো ও। দু'শো ফিটে উঠে এল লেনিনগাদ। এখানে পনেরো মিনিট স্থির করে রাখা হলো তাকে। মদী জমাট বাধা থলিনাইয়ার আউটলাইন নিবৃত্তভাবে প্রটে না দেখা পর্যন্ত সাহুই হলেন না কমান্ডার। এরপর তার নির্দেশে লেনিনগাদকে একটা বাউটারি লাইনের ঠিক বাইরের পজিশনে নিয়ে আসা হলো। ধীরে-সুস্থে ওপরে ওঠার নির্দেশ দিলেন তিনি।

'ওয়ান হানড্রেড টোয়েন্টি ফিট,' মুদু কণ্ঠে বলল ডাইভিং অফিসার। 'ওয়ান হানড্রেড টোন।'

'ভারী বরফ, ড্যালেনকভের গলা। 'ভারী বরফ।'

অলস ভঙ্গিতে উঠে যাচ্ছে লেনিনগাদ। এরপর আবার যখন কন্ট্রোল রুমে

আসবে, মনে মনে ভাবল রানা, তোমাদের কথা ভুলবে না। রাইকভ বললেন, 'স্রোতের ধাক্কা ভেসে যাবার গতি হিসেব করতে যদি ভুল হয়ে থাকে, আবার একটা ধাক্কা খাব আমরা।' গাফোর দিকে ফিরলেন তিনি, এখনও সে ল্যাম্প মেরামতের কাজে ব্যস্ত। 'তোমার জায়গায় আমি হলে মেরামতের কাজটা আশাতত স্থগিত রাখতাম। কারণ, খানিক পর হয়তো আবার নতুন করে শুরু করতে হবে। তাছাড়া, হাতে আমাদের অত বেশি স্পেয়ারও নেই।'

'ওয়ান হানড্রেড ফিট,' বলল ডাইভিং অফিসার। তার চেহারা গম্ভীর হয়ে আছে, কিন্তু গলার সুরে হালকা একটা তার।

'পানির রঙ পরিষ্কার হয়ে আসছে,' হঠাৎ বলল লেফটেন্যান্ট রুস্তভ। 'দেখুন! মোলা রঙের পানি খুব বেশি না হলেও বেশ খানিকটা মল্ল হয়ে এসেছে। টিভি স্ক্রীনে সেইলের ওপরের কোণ দেখা গেল। পরমুহুর্তে আরও কিছু দেখতে পেল ওরা—সেইলের ওপর মাত্র বারো ফিট ওপরে, কদম চেহারার আইস রিজ।

ট্যাংকে পানি ঢুকতে শুরু করল। কি করতে হবে বলে দিতে হলো না ডাইভিং অফিসারকে। প্রথম বার এক্সপ্রেস এলিভেটরের মত ছুটে গিয়ে আরেক ধরনের পানির স্রবের সাথে ধাক্কা খেয়েছিল লেনিনগাদ, একজন সাবমেরিনারের জীবনে এই ধরনের ঘটনা একবার ঘটেলেই যথেষ্ট। 'নাইনটি ফিট,' রিপোর্ট করল সে। 'এখনও উঠছে।' ট্যাংকে আরও পানি ঢুকল। তারপর আওয়াজটা ধেমের গেল। 'আমরা থামছি। ঠিক নাইনটি ফিটের মাথায়।'

'রাখো ওখানে, আর বলতে হবে না,' টিভি স্ক্রীনের দিকে চোখ রেখে বললেন কমান্ডার। 'গা ভাসিয়ে সরে যাচ্ছি আমরা... আশা করি, পলিনাইয়ার তত্বর।'

'তা যাচ্ছি,' বলল লেফটেন্যান্ট রুস্তভ। 'কিন্তু আইস রিজ আর সেইলের মাথা, এই দুইয়ের মাঝখানে দুই মিটার বেশি ফাঁক আছে বলে মনে হয় না...'

'ভ্যালেনকভ?' রিপোর্ট চাইলেন কমান্ডার। কড়ে আঙুলের নখ দিয়ে নাকের ডগা চুলকাচ্ছেন তিনি।

'এক মিনিট, ক্যাপ্টেন। গ্রাফের চেহারা কেমন যেন কিছুটে দেখাচ্ছে... না, আমরা এড়াতে পেরেছি।' কন্ট্রোল রুমে যারা রয়েছে তাদের মধ্যে এই প্রথম একজনের কথায় এবং চেহারায় উত্তেজনা ফুটে উঠতে দেখল রানা। 'পাতলা বরফ! পাতলা বরফ!'

টিভি স্ক্রীনের দিকে তাকাল রানা। পর্দার ওপর দিয়ে মন্থর গতিতে সরে যাচ্ছে বরফের খাড়া কিনারা, সেই সাথে আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে ওপর দিকের পরিষ্কার পানি।

'আগ্রে-বীরে, আগ্রে-বীরে,' বললেন ক্যাপ্টেন। 'আইস ওয়ালের দিকে ঘোরাও ক্যামেরা, তারপর সোজা ওপর দিকে তোলা।'

পাম্পের আওয়াজ শোনা গেল। মাত্র দশ ফিট দূর বরফের নীচিল বীরে বীরে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে।

'এইটি-ফাইভ ফিট,' ডাইভিং অফিসার রিপোর্ট করল। 'এইটি।'

'বাক্সের কিছু নেই,' মৃদু কণ্ঠে বললেন কমান্ডার। 'স্রোতের আড়ালে চলে এসেছি আমরা।'

'সেভেনটি-ফাইভ ফিট।'

পাম্প থামতেই ট্যাংকে পানি ঢুকতে শুরু করল।

'সেভেনটি ফিট।'

প্রায় অচল হয়ে এসেছে লেনিনগাদ, ওপর দিকে এতই ধীর গতিতে উঠছে যে টের পাওয়া কঠিন। ওপর দিকে মুখ তুলল ক্যামেরা, মসৃণ বরফের একটা সিলিং ওটাকে স্পর্শ করার জন্যে নেমে আসছে। আরও পানি ঢুকল ট্যাংকে, সাবমেরিনের গতি আরও একটু কমল। মাথার ওপর বরফের সিলিং, লেনিনগাদের সেইল ধাক্কা খেলো তার সাথে। মৃদু একটা ঝাঁক অনুভব করল রানা। লেনিনগাদ স্থির হয়ে গেল।

'বিউটিফুলি ডান,' ডাইভিং অফিসারের প্রশংসা করলেন কমান্ডার। 'এবার বরফের গায়ে একটু চাপ দিয়ে দেখা যাক।'

মাত্রিক গুঞ্জন তুলে স্টার্ট নিল পাম্প। ট্যাংক থেকে পানি বেরিয়ে যাবার সাথে সাথে হালকা হতে শুরু করল জাহাজ, একটানা বাড়তেই থাকল পজিটিভ বয়্যাসি। কিন্তু বরফের সিলিং যেমন ছিল তেমনই থাকল। অপেক্ষার মুহূর্ত হলো দ্রুত পেরিয়ে যাচ্ছে, পাম্প করে বের করে দেয়া হলো আরও পানি, তবু অবস্থা আগের মতই, কিছুই ঘটছে না।

নিচু গলায় লেফটেন্যান্টকে বলল রানা, 'মেইন ব্যালান্স্ট খালি করছ না কেন? কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কয়েকশো টন পজিটিভ বয়্যাসি পেতে পারো। বরফের সিলিংটা চম্পি ইকি পুক হলেও নির্দিষ্ট একটা পয়েন্টে চাপ লাগলে না ভেঙে পারবে না।'

'সেই সাথে লেনিনগাদও ভাঙবে,' গম্ভীর সুরে বলল লেফটেন্যান্ট। 'হঠাৎ করে ওই পরিমাণ বয়্যাসি পেলে সোডাওয়াটারের বোতল থেকে ছিপি যেমন ছিটকে বেরিয়ে যায়, সেই রকম লাফ দিয়ে বরফ ভেদ করে শূন্যে উঠে যাব আমরা। প্রেশার হাল হয়তো বা ধাক্কাটা সামলে নেবে, আমি ঠিক জানি না—কিন্তু কোন সন্দেহ নেই বাডার একেবারে চিড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে যাবে।'

শান্তভাবে ডাইভিং স্ট্যান্ডের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন কমান্ডার, নিঃশব্দে চেক করলেন ডায়ালগুলো। এরপর কি করবেন তিনি, আন্দাজ করতে পারল না রানা। তবে উনি যে সহজে হাল ছেড়ে দেবার পাত্র নন, ইতিমধ্যে সেটা পরিষ্কার বুঝে নিয়েছে ও।

'যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়,' ডাইভিং অফিসারকে বললেন। 'পিছনে এত চাপ নিয়ে এখন যদি উঠে যাই, এটা আর ডুবোজাহাজ থাকবে না, উড্ডোজাহাজ হয়ে যাবে। আমরা যা আন্দাজ করেছি, তারচেয়ে অনেক বেশি পুক এই বরফ। একটানা চাপ দিয়ে দেখা হয়েছে, কাজ হয়নি। বোঝাই যাচ্ছে, তাঁর একটা ভেঁটা হালি হবে কাজ। পানি তবে আশি ফিট বা কাছাকাছি নামিয়ে আনো। একে হ্রস্ব করে খানিকটা বাতাস ভরো, তারপর খাড়ের মত একটা গলের লিফন কি বলে দেখা যাক।'

ন ওজনের ওয়ার-কন্ডিশনিং ইউনিট যে-ই বসিয়ে থাকুক, সব গতি উদ্ধার করেছে রানা। অনেকক্ষণ হয়ে গেল, সেটা

সার কাজ করছে না। এক-আধটি বাতাস যাও বা আছে, সাংঘাতিক গরম লাগছে তার ম্পর্শ। একে একে সবার মুখে তাকান ও, বুঝল, বাতাসের অভাবে কমাধি সবাই ভুগছে। শুধু কমান্ডার নিউ রাইকড বাদে। তার শরীরে শুধু ঘাম ওকানোর মেশিনই নয়, সম্ভবত একটা অগ্নিজেন সিনিভারও আছে। আত্মা, বরফের গায়ে ওঠো মারার সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় তার কি মনে ছিল, লেনিনখান তৈরি করতে মার্কিন ওনারের হিসেবে বরফ পড়েছে একশো বিশ মিথিয়ন ডলার, মানে, পাঁচশো চল্লিশ কোটি টাকা?

সেফটেন্যান্ট ক্রতুভের চোখ দুটো কুঁচকে ছোট হয়ে গেছে, তার চেহারা উদ্বেগের আর কোন চিহ্ন নেই। দাঁত দিয়ে নখ খুঁটিছে গ্যাকো, চোখাচোখি ইবার ভয়ে কারও দিকে তাকাচ্ছে না সে। কমান্ডার ঘামার পর নিশ্চিন্তা জমাট রেখে আছে কট্টল কমে।

সবার দৃষ্টি টিভি স্ক্রীনের ওপর স্থির হয়ে আছে। সেইল আর বরফের মাঝখানে একটা ফাঁক তৈরি হলো। পতনের গতি সামাল দেবার জন্যে চালু করা হলো পাম্প। বরফের ওপর ফ্রাডলাইটের আলো প্রথম দিকে উজ্জ্বল দেখালেও, লেনিনখান যত নিচে নামতে লাগল টিভির পর্দায় ঘান হয়ে এল আলোটা, কিন্তু আকারে বাড়তে লাগল। কয়েক সেকেন্ড পর স্থির হয়ে গেল সাবমেরিন।

‘হ্যা, এখনি,’ কমান্ডার বললেন। ‘আবার বোতের মধ্যে পড়ার আগেই।’
প্রচণ্ড চাপের মুখে হিন হিন আওয়াজ করে কমপ্রেসড এয়ার ঢুকতে শুরু করল ব্যালাস্ট ট্যাংক। অলস ভঙ্গিতে ওপর দিকে উঠতে শুরু করল লেনিনখান, বরফের ওপর ছোট আর উজ্জ্বল হয়ে উঠছে আলোটা।

‘মোর এয়ার,’ নির্দেশ দিলেন ক্যান্টেন।
প্রতি মুহূর্তে ওপরে ওটার গতি বাড়ছে লেনিনখানের। সেইল আর বরফের মাঝখানে ফাঁকটা দ্রুত ছোট হয়ে আসছে। পনেরো ফিট, দশ ফিট।

এক হাত দিয়ে প্লটিং টেবিলের কিনারা অপর হাত দিয়ে ওভারহেড ঘাব বার ধরল রানা। স্ক্রীনে দেখা গেল, ওদের দিকে ধেয়ে আসছে বরফ। হঠাৎ করে ছবিটা কাঁপতে আর নাচতে শুরু করল, তার এক কোণে খেলো লেনিনখান। আরও কিছু আলো নিভে গেল। কাঁপা একটা প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল সাবমেরিনের আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত। ছবিটা আবার ফুটল স্ক্রীনে, বরফের নিচে এখনও উত্তরত করছে সেইল। পরমুহূর্তে ধবধব করে কেঁপে উঠে একদিকে হেলে পড়ল লেনিনখান। পায়ের তলায় ডেকের চাপ অনুভব করল ওরা। টিভি থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল সেইল, তার জায়গায় দেখা গেল অন্ধত্ব সাদাটে একটা ভাব।

‘ফরটি ফিট! ফরটি ফিট!’ স্ক্রীনে ঘোমলা করল ডাইভিং অফিসার। মাপটা ধরা হয় কীল লেভেল থেকে, কীল আর সেইলের ওপা পর্যন্ত মোট ছাট ফিট। তারমানে কারো ভেদ করে উঠে আসছে লেনিনখান।

সব্বটের সময় কেউ তেমন আশ্চর্য হয়নি, ক্যান্টেন বিপদ কেটে যেতেও কারও চেহারা উল্লস করার মত সক্রিয় ভাব ফুটল না। মন বসে কমান্ডার বললেন, ‘স্যাফেলি গল।’

পকেট থেকে কমান্ড বের করল রানা, মুখের ঘাম মুছে কমান্ডারকে জিজ্ঞেস

করল, ‘এই রকম কি প্রায়ই ঘটে?’

‘আরে না!’ সহাস্যে বললেন তিনি। ফিরলেন ডাইভিং অফিসারের দিকে। ‘একবার যখন উঠতে গেরেছি, লক রাখতে হবে আবার যেন তলিয়ে না যায়।’

পরবর্তী কয়েক সেকেন্ড ট্যাংকে আরও কমপ্রেসড এয়ার ভরা হলো ডাকপের ডাইভিং অফিসার জানাল, তলিয়ে যাবার আর কোন ভয় নেই, ক্যান্টেন।

‘আপ গেরেফোপ।’

লক, চকচকে সিলভার টিউব যুদ্ধ যান্ত্রিক ওজন তুলে উঠে এল মোপ থেকে। আই গীসে চোখ রাখলেন ক্যান্টেন। তিন সেকেন্ড পর নিধে হলেন আবার। ‘ডাউন গেরেফোপ।’ রানার দিকে ফিরলেন। ‘বাতাসের ছোঁয়া পেতে না পেতে লেপের পানি জমে বরফ হয়ে গেছে। কিছুই দেখলাম না।’ ডাইভিং অফিসারের দিকে ফিরলেন। ‘চল্লিশ ফিটে স্থির হো?’

‘ইয়েস, ক্যান্টেন।’

‘ওড।’ কোয়ার্টারমাস্টারের দিকে ফিরলেন তিনি। গায়ে একটা অয়েল স্কিন চড়াচ্ছে সে। ‘তাজা একটা বাতাস চলবে নাকি, লুতিকড?’

‘ইয়েস, ক্যান্টেন।’ কোর্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে বলল কোয়ার্টার-মাস্টার। ‘তবে, একটা বোধহয় সব্ব করতে হবে।’

‘না বোধহয়,’ বললেন কমান্ডার। ‘তুমি ভাবছ, রিজ আর হ্যাচওয়ে ওঁড়ো বরফের গাদায় আটকে গেছে?’ এদিক ওদিক মাথা নাড়লেন তিনি। ‘বরফ এত মোটা ছিল, তাতে বড় বড় ফাটল ধরাই স্বাভাবিক, সেডলো জায়গা না পেয়ে গড়িয়ে পড়ে গেছে রিজ থেকে।’

একটা হ্যাচ খোলা হলো, হঠাৎ বাতাসের চাপ কমে যাওয়ায় কানে ভেঁ ভেঁ একটা আওয়াজ পেল রানা। দূর থেকে ভেসে এল আরেকটা হ্যাচ খোলার আওয়াজ। ভয়েস টিউব থেকে বেরিয়ে এল কোয়ার্টারমাস্টার লুতিকডের গলা, ‘অন ক্লিয়ার আপ টপ।’

‘আবটিনা তোলো,’ নির্দেশ দিলেন কমান্ডার। ক্রতুভের দিকে ফিরলেন। ‘ইউরি, ট্রান্সমিট শুরু করতে বলো। আতুল অসাড় না হওয়া পর্যন্ত ঘামতে নিষেধ করে দেবে। এখান থেকে কোথাও নড়ব না আমরা, যতক্ষণ ড্রিফট নৌশন নভেলির সাড়া না পাই।’

‘এখনও কেউ যদি ওখানে বেঁচে থাকে,’ বলল রানা।

‘হ্যা, তা বটে।’ কিন্তু রানার দিকে তিনি তাকাতে পারলেন না।

পাঁচ

লেনিনখানের বিজ্ঞের ওপর দাঁড়িয়ে ঠক-ঠক করে কাঁপছে রানা। আড়চোখে দ্যাকোর দিকে তাকান একবার। সে-ও কাঁপছে, কিন্তু তার দ্যত দু’পাটি পরস্পরের সাথে বাড়ি বাঁধে কিনা বুঝতে পারল না। ওর নিজের দ্যত খট-খট

আওয়াজ করছে, গ্যাকোর দাঁত বাড়ি খেলতে শব্দটা শুনতে পাচ্ছে না।

এই যে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে থেকে কষ্ট পাচ্ছে ওরা, এর জন্যে এককভাবে রানাই সম্পূর্ণ দায়ী। ড্রিফট স্টেশন নভেলির ওয়েড লেংথ বরাবর ট্রান্সমিশন চালু হবার পর আধ ঘণ্টা কেটে গেল, তবু যখন কোন সাড়া-শব্দ মিলল না, কমান্ডারকে ডেকে একটা সার্জেশন দিল রানা। বলল, নভেলি হয়তো আমাদের কল শুনতে পাবে, কিন্তু পাওয়ার কম হয়ে যাওয়ায় উত্তর পাঠাতে পারবে না। তবে, ওরা যে আমাদের কল শুনতে পেয়েছে সেটা জানাবার জন্যে বিকল্প একটা ব্যবস্থা নিতে পারে। ড্রিফট স্টেশনগুলো সাধারণত বকেট, রেডিও সনডেস এবং রকুনস রাখে। দলের একজন হয়তো হারিয়ে গেল, এই সময় দেখা গেল রেডিও কমিউনিকেশন কাজ করছে না, তখন বকেট ছুঁড়ে হারানো লোকটাকে ক্যাম্পের দিক নির্দেশ দেয়া হয়। সনডেস হলো রেডিও সহ বেলুন, আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য যোগাড় করার জন্যে আকাশের দিকে বিশ মাইল পর্যন্ত উঠতে পারে। আর রকুনস আসলে রেডিও বকেট, বেলুন থেকে ছোঁড়া হয়, সনডেসের চেয়ে অনেক উঁচুতে উঠতে পারে। এই রকম চাদের আলোয় ওই বেলুন একটা যদি ছাড়া হয়, কম করেও বিশ মাইল দূর থেকে দেখতে পাওয়া যাবে। তার ওপর বেলুনের সাথে যদি ফ্লোর থাকে, এর দ্বিগুণ দূরত্ব থেকেও দেখতে পাওয়া যাবে। রানার কথায় যুক্তি আছে টের পেয়ে প্রথম দফায় বিজ্ঞ থেকে নজর রাখার জন্যে কে ব্যক্তি আছে জিজ্ঞাস করলেন কমান্ডার। নিজের নাম প্রস্তাব করে রানা, এছাড়া কোন উপায় ছিল না। ওকে সঙ্গ বা পাহারা দেবার জন্যে নিজে থেকেই রাজি হয় গ্যাকো।

পোলার আইস ক্যাপ—এ যেন অদ্বিত অচেনা এক অলাদা জগৎ। নিবেট শব্দ বরফের রাজ্যে কোন কিছুই নির্দিষ্ট কোন আকার বা আকৃতি নেই। নিঃশব্দ, শূন্য, নিপ্রাণ আর জনমানবহীন। গা ছম ছম করতে লাগল রানার। আকাশে মেঘ নেই, কিন্তু তারাও নেই। এর কারণ কি বুঝতে পারল না ও। দক্ষিণ দিকেরেখার খুব কাছে ঘোলাটে, কুয়াশা ঢাকা চাঁদ কালো পোলার আইস ক্যাপের ওপর তার রহস্যময় আলো ফেলেছে। বরফের ওপর চাঁদের আলো লক্ষ-কোটি মোমবাতির মত জ্বলজ্বল করার কথা, কিন্তু তা করছে না। আকাশের এত নিচে চাঁদ, তার আলো বরফের এবড়োখেবড়ো শরীর আর ছোট কড়িচিবিতে লেগে লম্বা আকৃতির ছায়া ফেলেছে। হাজার হাজার তুষার ঝড়ের অত্যাচারে কর্কশ, অনুজ্ঞাল হয়ে আছে বরফের গা, আলো প্রতিফলনের ক্ষমতা কবেই হারিয়ে ফেলেছে।

বরফের গা ক্রমাগত একটা তুষার ঝড় বইছে। বরফের কুটিগুলো সাংঘাতিক ছুঁচাল, ইস্পাতের তৈরি খুঁদে বর্শার মত। ঝড়ের প্রকোপ হঠাৎ হঠাৎ বেড়ে উঠলে বিজে ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখানেও হামলা চালাচ্ছে তুষার কণা আর বরফের কুচি। তখন লেনিনগ্রাদের বিজ্ঞ ছাড়া বাকি অংশ দেখতে পাওয়া যায় না। সমতল নিবেট বরফের লেভেল থেকে বিশ ফিট ওপরে রয়েছে ওরা। বিজ্ঞ ব্যাচম্যানিটারে ফ্রস্টের হিসের পাওয়া গেল: -২১° এফ -৫৩°

বরফ চলালে চালু রাখার জন্যে ডেকের ওপর গা ঝুকে ওরা, মুঠো করা হাত দিয়ে ঘূলি চালাচ্ছে যে ঘায় বুকে। ক্যানভাস উইন্ডব্রেকের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে বটে, কিন্তু তুষার ঝড়ের আকস্মিক হামলা বা প্রচণ্ড শীত, কোনটা থেকেই রেহাই

পাচ্ছে না। গলস পরিহার রাখার জন্যে দু'চার নৈকেত পর পর আঙুল দিয়ে উলটে হচ্ছে কাঁচ। নিগূহের প্রতিটি অংশে নজর বুলাচ্ছে ওরা। এই নিঃশব্দ, বৈরী বরফের রাজ্যে কোথাও না কোথাও একদল লোক মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে, ওদের মুহূর্তের অমনোযোগিতা বা গলস আপসা হয়ে থাকার মত সামান্য একটা কারণে এ-বার তাদের বেঁচে যাবার শেষ আশা চিরতরে নিভে যেতে পারে।

চোখের পলক ফেলতেও ভয় করছে রানার, যদি কিছু দেখার সুযোগ হারায়। শেষ পর্যন্ত ব্যথা শুরু হলো চোখে। আপসা হয়ে এল দৃষ্টি। পালা করে নজর রাখার নির্দিষ্ট আধ ঘণ্টা সময় পেরিয়ে গেল। কিছুই দেখতে পারিনি ওরা। বিজে ওঠার সময় কোন কথা হয়নি গ্যাকোর সাথে, দু'জনের আরেক দলকে দায়িত্ব নিয়ে কন্ট্রোল রুমে নেমে আসার সময়ও তার সাথে কোন কথা হলো না।

রেডিও রুমের বাইরে কমান্ডার রাইকভের সাথে দেখা হলো রানার, একটা ক্যানভাস টুলে বসে আছেন। অতিরিক্ত কাপড়-চোপড়, ফেস কভারিং আর গলস খুলে স্যুয়ার্ড তথা চীক কুকের সহকারী সাসকিনের হাত থেকে গরম এক মগ তফি নিল রানা। রক্ত চলাচল শুরু হওয়ায় হাত আর পায়ে ব্যথা শুরু হলো, কিন্তু চেহারা তার কোন ছাপ ফুটতে দিল না ও

‘আরে, আপনার কপালে রক্ত কেন? কাটল কিভাবে?’ চেহারা উদ্বেগ নিয়ে জানতে চাইলেন রাইকভ।

‘কিছু না, উড়ন্ত বরফ কুটির শত্রুতা,’ ঠাট্টার সুরে বললেও, খুব ক্রান্ত আর হতাশ দেখাল রানাকে। ‘ক্যান্টেন, ট্রান্সমিট করতে গিয়ে আমরা শুধু শুধু সময় নষ্ট করছি। নভেলির লোকদের যদি মাথা গোঁজারই ঠাই না থাকে, কিভাবে আমরা ওদের সিগন্যাল পাব বলে আশা করতে পারি? খাবার আর আশ্রয় ছাড়া ঘণ্টা কয়েকের বেশি কারও পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয় ওখানে। আমি আর গ্যাকো মাত্র আধ ঘণ্টা ছিলাম, মরতে মরতে ফিরে এসেছি।’

‘কি জানি!’ চিন্তিত দেখাল কমান্ডারকে। ‘অ্যামুভসেনের কথা ভাবুন, ভাবুন স্ট্রট আর পোয়ারীর কথা। তারা সেই একেবারে পোল পর্যন্ত হেঁটে গিয়েছিল।’

‘সম্পূর্ণ অন্য ধাতুতে গড়া মানুষ ছিল তারা, ক্যান্টেন। আর তা না হলে, সূর্য ওদের ওপর রোদ ঢেলেছিল। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বলে, ওখানে আধ ঘণ্টা থাকা মানেই জীবনের ওপর ঝুঁকি নেয়া।’

কয়েক নৈকেত রানার দিকে তাকিয়ে থাকলেন রাইকভ, চেহারা কোন ভাব নেই। ‘আপনি বলছেন, ওদের কোন আশা নেই?’

‘যদি আশ্রয় হারিয়ে থাকে, প্রাণও হারিয়েছে।’

‘কিন্তু আপনি আমাকে বলেছেন, মৃদু কষ্টে স্বরণ করিয়ে দিলেন কমান্ডার, ট্রান্সমিটারে পাওয়ার সাপ্লাই দেয়ার জন্যে ওদের কাছে নাইফ লেলের একটা ইমার্জেন্সী পাওয়ার প্যাক আছে। এই ব্যাটারি নাকি যে-কোন আবহাওয়ার অনেকদিন পর্যন্ত ভাল থাকতে পারে। দিন কয়েক আগে ওরা যখন ওদের প্রথম এস, ও এস, পাঠাল, নিশ্চয়ই এই ব্যাটারিই ব্যবহার করেছে। সেটা তো ভাড়াভাড়ি শেন হয়ে যাবার কথা নয়।’

কমান্ডার বা বলতে চান তা এতই পরিষ্কার যে রানার আত্ম উত্তর দেয়ার

প্রয়োজন করে না। ব্যাটারি শেষ হয়নি, শেষ হয়ে গেছে মানুষ।

‘আমি আপনার সাথে একমত,’ শান্তভাবে বলে চললেন ক্যাপ্টেন। ‘অযথা সময় নষ্ট করছি। তলি-তলি ভাঙিয়ে আমাদের হয়তো দিগে যাওয়াই উচিত। ওরা সাড়া না দিলে ওদেরকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়।’

রানার দু’হাতের ভেতর পরম মগা লাফানো করছে। চুমুক দেবার সময় ঠোট পুড়ে গেল ওর। দ্রুত মাথা নাড়ল ও। বলল, ‘একটু ভুল হলো। ওরা সাড়া না দিলেও ওদেরকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব।’

কমান্ডারের ডুক ডুক উঠল। ‘কিভাবে?’

‘নভেলির ওদেরকে আমরা যদি রেডিওর সাহায্যে জাগাতে না পারি, এই এলাকার চারদিকে বিশ মাইল পর্যন্ত পায়ে হেঁটে তল্লাশি চালাবার মানসিক প্রস্তুতি আমার আছে।’

‘কি? কি বললেন?’ শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল কমান্ডারের। এমন চোখে তাকালেন, রানাকে যেন তিনি এই প্রথম দেখছেন। ‘নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছেন আপনি।’

কমান্ডারের হতভম্ব ভাবটাকে গ্রাসা না করে আবার বলল রানা, ‘তবু যদি ওদেরকে না পাই, আরেকটা পলিনাইয়া ধরে আরেক এলাকায় উঠব আমরা, আবার তল্লাশি চালাব। ওদের খোজ পাবার জন্যে দরকার হলে গোটা শীতকালটা এখানে থেকে যেতে পারি আমি।’

কয়েক সেকেন্ড কমান্ডারের মুখে কোন কথা যোগান না। তারপর মৃদু কহে বললেন, ‘তা সম্ভব নয়, ডা, রানা। এই মধ্য শীতে আমার লোকদের আমি পোলার আইন ক্যাপে তল্লাশি চালাতে পাঠাব, তাও পায়ে হেঁটে...’ এদিক ওদিক মাথা নাড়লেন তিনি, ‘ইউহু। জুদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।’

‘আপনাকে কেউ তা খেলতে বলাছেও না, কমান্ডার রাইকড,’ গভীর সুরে বলল রানা।

‘হোয়াট? তারমানে আপনি একা যাবেন?’ চোখে বাজোব অবিশ্বাস নিয়ে রানার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন কমান্ডার। ‘আপনার কি মাথা ব্যাপ হযেছে?’

প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলল রানা, ‘মস্তো থেকে আমার সম্পর্কে আপনাকে কি বলা হয়েছে, মনে আছে তো, কমান্ডার? লেনিনগ্ৰাদ আর জুদের নিরাপত্তা বিপন্ন না করে সম্ভাব্য সব রকম সাহায্য-সহযোগিতা দিতে হবে আমাকে, তাই না? লেনিনগ্ৰাদ এখানে আছে, তাতে তার বা জুদের নিরাপত্তা বিপন্ন হচ্ছে, একথা আপনি বলতে পারেন না। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত লেনিনগ্ৰাদ এখানে থাকুক। আরও সাহায্য দরকার আমার...’

‘কিন্তু এর আমি কোন মানে স্বীকৃতি পাচ্ছি না।’ ডেকের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন কমান্ডার, হঠাৎ মৃদু সুরে রানার চোখে তাকালেন। ‘এই আপনি বলছেন, ওদের কোন আশা নেই, তারপরই আবার বলছেন, ওদেরকে খুঁজে বের করার জন্যে গোটা শীতকালটা এখানে কাটিয়ে দিতে পারেন।’ হঠাৎ থমকে গিয়ে কি যেন ভাবলেন তিনি, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, ‘আচ্ছা, এরা তো সোভিয়েত ইউনিয়নের লোক, আপনার স্বদেশী কেউ নয়, তাই-ইব্রানদার হওয়া তো দূরের

কথা। এদের ব্যাপারে এত কেন মাথা ব্যথা আপনার? নিজের জীবন বিপন্ন করতে চাইছেন, কারা বা স্বার্থটা কি?’

ওখানে আমার একজন বন্ধু আছে, যে একবার আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিল, যাকে সাহায্যের কোন সুযোগ ছাড়তে রাজি নই আমি—কিন্তু হাসাকর আর অবিশ্বাস্য পোনাবে বলেই হোক, কিংবা অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনা করেই হোক কথাগুলো বলল না রানা। ‘কাজ হাতে নিয়ে সেটা অর্ধেক নেরে অর্ধেক ফেলে রাখা আমার নীতি নয়। স্বীকার করছি, এ ব্যাপারে সোভিয়েত নেতীর নীতি সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই।’

ঠাট্টা চোখে দীর্ঘ পনেরো সেকেন্ড রানার দিকে তাকিয়ে থাকলেন কমান্ডার রাইকড। তারপর ধীরে ধীরে মৃদু হাসি ফুটে উঠল তার ঠোটে। ‘সোভিয়েত নেতী এত সহজে অপমান বোধ করে না, ডা, রানা। আমার পরামর্শ, সময় থাকতে খুঁটা দুয়েক ঘুমিয়ে নিন। সত্যিই যদি নর্থ পোলার দিকে হাঁটা দিতে চান, এই ঘুমটা আপনার কাজে লাগবে।’

‘আর আপনি? আপনি তো সারা রাত বিছানার ধারেও ঘোঁষেননি।’

‘আমি বরং আরেকটু অপেক্ষা করি,’ ইঙ্গিতে রেডিও ক্রমটি দেখালেন তিনি। ‘ইন কেস যদি কোন সিগন্যাল আসে।’

‘কি পাঠাচ্ছে ওরা? মেস কল সাইন?’

‘সেই সাথে পজিশন আর সকেটের অনুরোধ। সাড়া পাওয়া গেলে সাথে সাথে জানাব আপনাকে। শুভ নাইট, ডা, রানা। না, ভুল হলো। শুভ মর্নিং।’

সকাল আটটার ঘুম থেকে উঠে পরম পানি দিয়ে গোসল সারল রানা। ‘অফিসার ওয়ার্ডরুমে ঢুকে দেখল ডেক অফিসার আর ব্রিজ ওয়াচার লেফটেন্যান্টকে যাদ দিয়ে লেনিনগ্ৰাদের সব ক’জন অফিসার বেকফাস্ট টেবিলে উপস্থিত। নিরুজ্জ, নিরানন্দ একটা পরিবেশ, সবাই কেমন যেন মনমরা। কেউ কেউ এইমাত্র নিজের কেবিন থেকে বেরিয়ে এল, চোখে এখনও ঘুম লেগে রয়েছে। কেউ কেবিনের দিকে হাঁটা দিল, পড়ে পড়ে ঘুম দেবে। তেমন কোন কথা হচ্ছে না, দায়সারা গোছের হু-হু দিয়ে কাজ সারছে সবাই। খাবারের ব্যাপারেও তেমন আদর নেই কারও। ভোজন রসিক ডা, কডেনকোকেও ম্রিয়মান লাগল, চেহারা দেখে যেন হলো, কোন কিছুতেই আঁজ তার জ্বলি নেই। নভেলির সাড়া পাওয়া গেছে কিনা জিজ্ঞেস করার দরকার হলো না। বোঝাই যায়। রিস্টওয়াচ দেখল রানা। পাঁচ ঘটীর ওপর হলো একটানা ট্রান্সমিট করা হচ্ছে। কেউ কাউকে স্মরণ করিয়ে দিল না, কিন্তু সবাই উপলব্ধি করতে পারছে, শেষ এস. ও. এস. পাঠাবার পর এই যে এতগুলো ঘটী পেরিয়ে গেছে, এরপর আর ওদের বেঁচে থাকার কোন আশা নেই।

ওয়ার্ডরুমে নিরুজ্জ পরিবেশ অব্যক্তির হয়ে উঠল। একে একে বাকী পড়াত ওর কল সবাই। প্রথমে বেরিয়ে গেল ডা, কডেনকো, যাবার সময় বিভ্রান্ত করে বলে গেল, সিক বে-হেড একজন রোগী আছে। তার পিছু পিছু গেল লেফটেন্যান্ট বুলিন, ট্রান্সমিট অফিসার। যাবার আগে কমান্ডারের সাথে কিছু কথা বলল সে। গত দু’দিন থেকে তার লোকজন দিনে বারো ঘটী করে খাটছে, কিন্তু

টের্পেডোগুলোয় এখনও কোন ক্রটি খুঁজে পায়নি তারা। আরেকজন অফিসার লেফটেন্যান্ট রুস্তভকে ছুটি দেয়ার জন্যে বেরিয়ে গেল, রুস্তভ বিজ্ঞ থেকে চারদিকে নজর রাখতে গেছে। শুভে যাবার নাম করে বেরিয়ে গেল আরও তিনজন অফিসার। ব্রেকফাস্ট টেবিলে থাকল মাত্র তিনজন—কমান্ডার রাইকভ, রানা আর ওসিপভ। সারাটা রাত জেগে আছেন কমান্ডার, কিন্তু লক্ষ করল রানা, তাঁর চোখ লাল হয়নি, চেহারা যুগ বা ক্রান্তির কোন ছাপও নেই।

স্টয়ার্ড সারসকিন নতুন করে এক পট কফি নিয়ে এসে কাপে ঢালছে, এই সময় সবাইকে চমকে দিয়ে খড়ের গতিতে ওয়ার্ডরুমে ঢুকল কোয়ার্টার মাস্টার। দরজাটা ভাঙল না, তার কারণ অস্বাভাবিক মজবুত সেটা।

‘ওদেরকে আমরা পেয়েছি!’ চিৎকার জুড়ে দিল সে। ‘ওরা সাজা দিয়েছে!’ হঠাৎ বৃষ্টি, এভাবে চিৎকার করাটা উচিত হচ্ছে না। টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল সে। প্রচণ্ড উত্তেজনা চেপে রাখার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে। এরপর গলা একেবারে খাদে নামিয়ে ফিসফিস করে বলল সে, ‘ড্রিফট স্টেশন নভেলির সাথে রেডিও যোগাযোগ হয়েছে, ক্যাপ্টেন!’

রেডিও ক্রমে সবার আগে ঢুকলেন কমান্ডার রাইকভ, কিন্তু তার কারণ প্রতিযোগিতার শুরুতে রানা আর ওসিপভের চেয়ে এক পা এগিয়ে ছিলেন তিনি। দু’জন অপারেটর তাদের ট্রান্সমিটারের ওপর খুঁকে রয়েছে, কানে এয়ারফোন। একজনের কপাল ট্রান্সমিটার ছুঁই ছুঁই করছে, আরেকজন গভীর মনোযোগ দিয়ে শোনার ভঙ্গিতে একদিকে কাত করে আছে মাথা। প্রথম জন মেসেজ প্যাডে কি যেন লিখছে লক্ষ করে তার কাঁধের ওপর দিয়ে উকি দিল ওরা।

‘ডি, এস, এম,’ বারবার এই তিনটে অক্ষর লিখছে অপারেটর। ডি, এস, এম—ড্রিফট স্টেশন নভেলির আনলারিং কল সাইন, জানে রানা। চোখের কোণ দিয়ে কমান্ডারকে দেখতে পেয়ে প্যাডের ওপর কলম চালানো বন্ধ করল অপারেটর।

‘সিগন্যাল পাওয়া গেছে, ক্যাপ্টেন—কোন সন্দেহ নেই। অত্যন্ত দুর্বল আর ছাড়াছাড়া, কিন্তু...’

‘সিগন্যালের কথা বাদ দাও!’ ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে অনুমতি পায়নি, তবু ধমকের সুরে কথা বলল ওসিপভ। চেষ্টা করেও গলার উত্তেজিত ভাবটুকু গোপন করে রাখতে ব্যর্থ হলো সে। ‘বিয়ারিং পেয়েছে কিনা সেটাই আসল কথা। পেয়েছে?’

দ্বিতীয় অপারেটর ঝট করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। এতক্ষণে তাকে চিনতে পারল রানা। পিনি। বিষয় এবং তিরস্কার ভরা দৃষ্টিতে ওসিপভের দিকে দু’সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল সে, তারপর বলল, ‘নিশ্চয়, লেফটেন্যান্ট। ওদের বিয়ারিং পেয়েছি আমরা। সবচেয়ে আগে ওই কাজটাই করেছে। ও ফরটি-ফাইভ, এক আধ টন এমিক এমিক হতে পারে। বলাই বাহুল্য, এটা উত্তর পূর্ব দিকে।’

‘ঘনত্বান, পিনি,’ শুরুসে, ঠাণ্ডা গলায় বললেন কমান্ডার। ‘ও ফরটি-ফাইভ উত্তর পূর্ব দিকেই—লেফটেন্যান্ট অফিসার বা আমাদের তা জানা আছে। পজিশন?’

কাঁধ ঝাকিয়ে সহকর্মীর দিকে ফিরল পিনি। লোকটার মাথার মস্ত একটা টাক,

চকচক করছে। ‘কিছু জানা গেল, মিশকিন?’

‘কিছু না!’ ঘাড় ফিরিয়ে ক্যাপ্টেনের দিকে তাকাল মিশকিন। ‘বিশ-পেটিশ বার পজিশন জানতে চাইলাম, কিছুই বলে না। বারবার শুধু নিজের কল সাইন পাঠাচ্ছে। আমার মনে হয়, আমাদের সিগন্যাল তনতে পাচ্ছে না সে। আমরা যে ওনচি, তাই হয়তো জানে না। এমনও হতে পারে, রিসিভ করার জন্যে এরিয়াল সুইচ অন করেনি।’

‘তা সম্ভব নয়,’ ক্যাপ্টেন বললেন।

‘এই লোকের বেলা সম্ভব,’ জোর দিয়ে বলল পিনি। ‘প্রথম দিকে আমরা ভেবেছিলাম সিগন্যালটাই দুর্বল। তারপর মনে হলো, সম্ভবত অপারেটরই দুর্বল বা অসুস্থ। তাও নয়, আসলে অপারেটর লোকটা একেবারে আনাড়ী।’

‘বুলে কিভাবে?’

‘বোঝা যায়,’ ধরুন—‘হঠাৎ থেমে গেল পিনি, শক্ত হয়ে উঠল তার পেশী, হাত উঠিয়ে মিশকিনের কনুই ছুঁলো সে।

ওপর-নিচে মাথা দোলাল মিশকিন। বলল, ‘পেয়েছি। লোকটা বসছে, “পজিশন জানা নেই”।’

সাথে সাথে কেউ কিছু বলল না। লোকটা নভেলির পজিশন দিতে পারেনি, সেটা এই মুহূর্তে হেমন তরুতরু বললে মনে হলো না। ঘুরে দাঁড়িয়ে রেডিওরুম থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল ওসিপভ। কয়েক সেকেন্ড পর তার গলা শোনা গেল। বিজ টেলিফোনে দ্রুত কথা বলছে সে।

কমান্ডার রাইকভ ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন রানার দিকে। ‘বেলুনের কথা বলছিলেন। নভেলিতে থাকার কথা। ওগুলো মুক্ত বেলুন, নাকি বন্দী?’

‘দু’রকমই।’

‘বন্দীগুলো কাজ করে কিভাবে?’

‘লক খুলে দিলে উইন্ড ঘুরতে থাকে, নাইলন কর্ড নিয়ে উঠে যায় বেলুন। কর্ডের গায়ে একশো আর হাজার ফিটের মাপ লেখা আছে।’

‘ওদেরকে পাঁচ হাজার ফিট পর্যন্ত একটা বন্দী বেলুন ছাড়তে বলব আমরা। সাথে ফ্লোর থাকবে। ওরা যদি গ্রিশ বা চব্বিশ মাইলের ভেতর কোথাও থেকে থাকে, সেটা আমাদের দেখতে পাবার কথা—কি ব্যাপার, মিশকিন?’

‘আবার সিগন্যাল পাঠাচ্ছে। খুব ভাড়া ভাড়া, অনেক কিছুই শোনা যাচ্ছে না। “দোহাই লাগে, তাড়াতাড়ি করো”। দু’বার শোনা গেল—“দোহাই লাগে, তাড়াতাড়ি করো”।’

‘এটা পাঠাও,’ বললেন রাইকভ। বেলুন ছাড়ার অনুরোধ জানিয়ে ছোট্ট একটা মেসেজ ভেরি করে দিলেন তিনি। ‘একেবারে আন্তে-ধীরে পাঠাতে হবে।’

মাথা ঝাকিয়ে ট্রান্সমিট করতে শুরু করল মিশকিন।

ছুটে রেডিওরুমে ফিরে এল ওসিপভ। ‘চাঁদ ভোবেনি,’ দ্রুত কণ্ঠে বলল সে। ‘সিগন্যালের ওপর দু’এক জিহ্বা এখনও আছে। একটা সেলুলোইট নিয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছি আমি, মুন-সাইট দেব। ওদেরকেও তাই নিতে বলুন। তাতে করে অক্ষাংশের ব্যবধানটুকু জানতে পারব আমরা। যদি বুঝি আমাদের ও ফরটি-ফাইভে রয়েছে

ওরা, হুলাশীর এলাকা এক মাইলের মধ্যে ছোট হয়ে আসবে।

‘ভাল সাফেশন, চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে,’ বললেন ক্যাপ্টেন। আরেকটা মেসেজ ডিকোড করলেন তিনি। প্রথমটার পরপরই সেটা ট্রান্সমিট করল মিশকিন।

এরপর উভয়ের জন্যে অধীর উত্তেজনায় অপেক্ষা। এক দুই করে দশ মিনিট কেটে গেল। একে একে সবার দিকে তাকাল রানা। বিষয় জান এবং অনামনস্ব দেখাল সবাইকে। বুঝতে অসুবিধে হয় না, প্রত্যেকে এরা লেনিনিস্টদের রেডিওর সঙ্গে থাকলেও সবার মন পাড়ে রয়েছে ড্রিফট আইন স্টেশন নাভিলিতে।

অবশেষে আবার প্যাডের ওপর জ্যাক হয়ে উঠল মিশকিনের হাত। কিন্তু তা মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্যে। এবারও তার গলাব সুঁরে কোনরকম উত্তেজনা বা ভাবাবেগের রেশ থাকল না, কিন্তু কেমন যেন কাঁপা শোনাগল। বলল, ‘...সব বেলুন পাড়ে গেছে। চাঁদ নেই’।

‘চাঁদ নেই।’ শব্দ দুটো ওসিপভের মুখে হাশাকারের মত শোনাগল, ‘তারমানে নিচয়ই ওদের আকাশে খুব মেঘ করেছে। কিংবা তুমুল ঝড়...’

‘না,’ বলল রানা। ‘এখানকার স্থানীয় আবহাওয়ায় ওরকম আকাশ-পাতাল পার্থক্য দেখা যায় না। পঞ্চাশ হাজার বর্গমাইলের ভেতর সবখানে একই রকম আবহাওয়া থাকবে। ওদের আকাশ থেকে চাঁদ ডুবে গেছে। শেষবার ওরা নিজেদের যে পজিশন জানিয়েছিল সেটা ছিল আন্দাজ করা, বড় রকমের ভুল ছিল তাতে। আমরা যা ভেবেছিলাম তারচেয়ে কম করেও একশো মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে রয়েছে ওরা।’

মিশকিনকে নির্দেশ দিলেন রাইকড, ‘রকেট আছে কিনা জিজ্ঞেস করো।’

‘লাভ?’ এনিক-ওনিক মাথা নাড়ল রানা। ‘ওরা যেখানে আছে বলে ব্যত্যা করছি সেখান থেকে রকেট ছোঁড়া হলে আমাদের দিপ্তরেকবার ওপর উঠবে না সেটা। আর যদি ওঠেও, আমরা দেখতে পাব না।’

‘তবু, আশা করতে দোষ কি?’

‘যোগাযোগ হারিয়ে ফেলছি, ক্যাপ্টেন,’ জানাল মিশকিন। ‘স্বাভাবিক সম্পর্কে কি যেন বলছিল, কিন্তু শোনা গেল না।’

‘জিজ্ঞেস করো এমন কোন রকেট আছে কিনা যেটা এখনি ভুড়তে পারবে? কুইক।’

পরপর চারবার মেসেজটা পাঠাল মিশকিন। তারপর একটা জবাব পেল। ‘...দু মিনিট।’ হয় লোকটা সাংঘাতিক অসুস্থ হয়ে পড়েছে নতুনো তার ব্যাটারির অবস্থা শেষ। এইটুকুই—‘দু মিনিট’।

নিশ্চয়ই মাথা ঝাকিয়ে রেডিওর থেকে বেরিয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন। কিছু নিল রানা। রকেট আর বিনকিউলার নিয়ে জিজ্ঞেস উঠে এল ওরা। সাথে সাথে এমন ওপর আলিয়ে পড়ল প্রচণ্ড ঝড়। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বহুদূর করে কাঁপতে শুরু করল ওরা। দেখতে দেখতে ভূমধ্যস কণার সাদা হয়ে গেল কাপড়-চোপড়। কাঁপা হাতে জাইনোবিপিটার কম্পাসের কাঁপা খুললেন রাইকড, ও করটি ফাইন্ড এন্ড লুইন দেখে নিয়ে ওতচার লোক দু’জনকে কোথায় আর কি দেখতে হবে জানিয়ে

দিলেন।

এক মিনিট পেরিয়ে গেল। দু মিনিট। পাঁচ মিনিট। বরফ কুচি-ভরা অন্ধকারে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ব্যাধা করতে শুরু করল রানার চোখ। মুখের খোলা অংশ সম্পূর্ণ অসাড় হয়ে গেছে। বুঝল, বিনকিউলার নামাবার সময় ওটার সাথে খানিকটা চামড়াও উঠে আসবে।

জি-ক্রি-ভোন বেজে উঠল। বিনকিউলার নামালেন রাইকড, চামড়া-ওঠা লাগতে দুটো বড় দেখা গেল তার চোখের চারপাশে। জানতে পেরেছেন বলে মনে হলো না—ব্যাধা শুরু হবে আরও পরে। রিসিভার তুলে কিছু তনলেন, চেহারা দেখে মনের ভাব টের পাওয়া গেল না। রিসিভার রেখে ফিরলেন রানার দিকে। ‘রেডিওর মে চলুন, ডা. রানা।’ ওয়াচারদের দিকে তাকালেন। ‘তোমরাও। রকেট ছোঁড়ার পর তিন মিনিট পেরিয়ে গেছে।’

বিষয় মনে নিচে নেমে এল ওরা। একটা গ্লাস গজ্ঞে নিজের চেহারা দেখে গম্ভীরভাবে মাথা দোললেন রাইকড। ‘মাথা গোঁজার ঠাই ওদের না খেতেই পারে না। কিছু ঘর টিকে গেছে। তা না হলে অনেক আগেই মারা যেত ওরা।’ রেডিওর মে চুকলেন তিনি। ‘যোগাযোগ আছে?’

‘এই আছে, এই নেই,’ বলল পিনি। ‘আশ্চর্য ব্যাপার, ক্যাপ্টেন। এ ধরনের দুর্বল যোগাযোগ একবার কেটে গেলে তা আর জোড়া লাগে না, একেবারে হারিয়ে যায়। কিন্তু এ লোকটা বারবার ফিরে আসছে।’

‘হয়তো ব্যাটারি নেই-ই আর,’ বলল রানা। ‘হয়তো শুধু একটা হ্যাড-অপারেটিং জেনারেটর আছে, তাও এক একবারে দু’পাচ সেকেন্ডের বেশি চালাবার শক্তি নেই তার।’

‘হতে পারে,’ বলল পিনি। ‘মিশকিন, শেষ মেসেজটা বলো ক্যাপ্টেনকে।’

‘বলল, “ক্যান্ট লেট মেনি টুর্স”। কিছু বুঝলাম না। আমার মনে হয় আসলে মেসেজটা এই রকম হবে—“ক্যানট লাক্ট মোন আওয়ার”। এছাড়া আর কি হতে পারে বুঝতে পারছি না।’

রানার দিকে একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিলেন রাইকড। ‘মিশকিনকে বললেন, “প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর, ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে, কল সাইন পাঠাতে বলো ওদেরকে। বলো, খুব বেশি হলে ছয় ঘন্টার মধ্যে আবার আমরা যোগাযোগ করব, চার ঘন্টার মধ্যেও করতে পারি।’ বের্রাকি, পিনি। কতটুকু নিখুঁত ছিল ওটা?’

‘সম্পূর্ণ, ক্যাপ্টেন। বারবার চেক করে দেখেছি। ফলটি-ফাইন্ড।’

রানাকে নিয়ে রেডিওর থেকে কন্ট্রোল সেন্টারে বেরিয়ে এলেন কমান্ডার। পিছনে ওসিপভ।

‘ড্রিফট স্টেশন নাভেলি চাঁদ দেখতে পাচ্ছে না। ডা. রানার কথা মত আবহাওয়া অবস্থা সবখানে যদি প্রায় সমান হয়, ওদের চাঁদ দেখতে যা পারার কারণ হলো, ওদের আকাশ থেকে চাঁদ ডুবে গেছে। আমাদের চাঁদ কতটা ওপরে সেটা জানি, ওদের বের্রারিংও জানা আছে—তাহলে নাভেলির মিনিমাম দূরত্ব কতটুকু, ওসিপভ?’

‘ডা. রানা যা বললেন, একশো মাইল,’ দ্রুত হিসেব করে বলল ওসিপভ।

‘কমপক্ষে’।

‘এই জায়গা ছেড়ে ও ফরটি বরাবর একটা কোর্স ধরব আমরা। একশো মাইল এগিয়ে আরেকটা পলিনাইয়া পাবার চেষ্টা করব। একজিকিউটিভ অফিসারকে ডেকে ডাইভ দেবার জন্যে তৈরি হতে বলো।’ রানার দিকে ফিরে হাসলেন ক্যাপ্টেন। ‘ক্রস-বেয়ারিং নেবার সুযোগ পাব আমরা। তার সাথে নিখুঁতভাবে হিসেব করা একটা বেস লাইন থাকলে, ত্রাসীর এলাকা একশো গজের মধ্যে ছোট হয়ে আসবে।’

‘বরফের নিচে একশো মাইল মাপবেন কিভাবে?’ জানতে চাইল রানা। ‘মানে, মাপটা কতটুকু নিখুঁত হবে?’

‘কাজটা ইনারিশিয়াল নেভিগেশন কমপিউটারের। তার হিসেব কতটুকু নিখুঁত, বললে বিশ্বাস করবেন না। রাশিয়ার উপকূল থেকে ডাইভ দিয়ে অস্ট্রেলিয়ান উপকূলের যেখানে মাথা তুলতে চাই তার পাঁচশো গজের মধ্যে পৌঁছতে পারি। মাত্র একশো মাইল পেরোবার বেলায় খুব বেশি হলে বিশ গজ এদিক-ওদিক হতে পারে।’

রেডিও এরিয়াল নামিয়ে ফেলা হলো, বন্ধ করে দেয়া হলো হ্যাটজলো, পলিনাইয়ার মাথা থেকে নিচে নেমে এসে ও ফরটি কোর্সে রওনা হতে পাঁচ মিনিটের বেশি লাগল না লেনিনগ্রাদের। ডাইভিং স্ট্যাডে বসে সিগারেট ফাঁকছে হেলমসম্যান দু’জন, কিছু কথুছে না। অটোমেটিক ইন্টারলকের সাথে ইনারিশিয়াল নেভিগেশন সিস্টেম জাহাজের স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোলস পরিচালনা করছে। এই প্রথম জাহাজের এ-মাথা থেকে সে-বা পর্যন্ত ভারী একটা কাপুনি অনুভব করা গেল। মেসেজের বলা হয়েছে—‘ক্যান্ট লাস্ট মেনি আওয়ার্স’। ফুল স্পীডে ছুটছে লেনিনগ্রাদ।

সারাতা সকাল কন্ট্রোলরুম ছেড়ে বেরুল না রানা। ডা. রুডেনকোর কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি দিয়ে বেশিরভাগ সময়টা কাটাল ও। সিক-বে-তে মিনিট দশেক কাটিয়ে আইস মেশিনের গীটে এসে বসেছে রুডেনকো। নভেলিতে যে বা খারাপ এখনও টিকে আছে তাদের বাঁচা-মরা নির্ভর করছে এই আইস মেশিনের ওপর। নভেলির পজিশনে ক্রস-বেয়ারিং নিতে হলে একটা পলিনাইয়া ধরে ওপরে উঠতে হবে ওদেরকে। পলিনাইয়া না পেলে ক্রস বেয়ারিং পাওয়া সম্ভব নয়। ক্রস বেয়ারিং না পেলে নভেলিকে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। একটা প্রগাথার বার বার ঘুরেফিরে এল রানার মনে, ‘আঙনের হামলা থেকে ক’জন বেঁচে গেছে ওরা? মেসেজ পাঠাবার ধরন দেখে মনে হয়, দু’একজনের বেশি বাঁচেনি।’

আশি মাইলের মধ্যে মাত্র দু’বার কালো সুরু রেখা দেখা গেল স্টাইলাসে। এর মানে, মাথার ওপর পাঁচলা বরফ। প্রথম পলিনাইয়া আকাবে এতই ছোট, দেড়ার ছে, একটা ডিগ্রি নৌকা ও গুলবে না। দ্বিতীয়টা আরও ছোট।

দুপুরের ব্যান্ড পর। স্পীড কমিয়ে আনতে বললেন রাইকভ। কাপুনিটা পোনে গেল। রুডেনকোকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘কি বকম মনে হচ্ছে?’

এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল রুডেনকো। ‘ভাল নয়, সবখানে ভারী বরফ।’

দরকারের সময় একটা পলিনাইয়া আমাদের কোলে এসে পড়বে, এতটা

আমরা আশা করতে পারি না,’ রাইকভ বললেন। ‘প্রায় পৌঁছে গেছি আমরা। খিট সার্চ পদ্ধতি অনুসরণ করব। পূর্বে পাঁচ মাইল, পশ্চিমে পাঁচ মাইল, উত্তর দিকে প্রতিবার সিকি মাইল করে বেশি।’

ওক হলো সার্চ। এক ঘণ্টা কাটল। দু’ঘণ্টা। তিন ঘণ্টা। ওসিপভ এবং তার সহকারী প্রতিটি টেবিল থেকে মুহূর্তের জন্যেও মুখ তোলেনি, সাগরের তলায় ত্রিস-ক্রস সার্চ ওক করার পর লেনিনগ্রাদের প্রতিটি নড়াচড়া অত্যন্ত যত্ন এবং নিষ্ঠার সাথে ট্রেন করছে ওরা। বিকেন চারটে। সাধারণ আলাপচারিতা, কন্ট্রোলরুমের বিভিন্ন গ্রুপের মাঝখান থেকে উঠে আসা শুভ্রন, কখন থেকে কে জানে, সম্পূর্ণ খেমে গেছে। রুডেনকোর ভারী বরফ, এখনও ভারী বরফ, একমেয়ে আর নিস্তেজ হয়ে এসেছে।

পাঁচটা। কেউ আর কারও দিকে তাকাচ্ছে না। কন্ট্রোলরুমের ভেতর জমাট বেঁধে গেছে নিস্তেজতা। ভারী বরফ, এখনও ভারী বরফ। সন্যাসাময় ক্যাপ্টেন রাইকভ। অনেকক্ষণ হলো তিনিও হাসতে তুলে গেছেন। কখনো চোখে একজম লোককে দেখতে পাচ্ছে রানা, এই একজন লোকই বেঁচে আছে ড্রিফট স্টেশন নভেলিতে।

হাড়গিলে চেহারা হয়েছে লোকটার, সাবামুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, ফুটে-বাইটে ক্ষতবিক্ষত হয়ে আছে চেহারা। কোটির ভেতর ঢুকে যাওয়া চোখ ক্রান্তিতে বুজে আসতে চাইছে। পেটে কিছু পড়েনি, পেট আর পিঠ এক হয়ে এসেছে। শেষ দু’এক আউস শক্তি যা আছে তাই দিয়ে জেনারেটরের হাতল ঘোরাবার চেষ্টা করছে, তারপর নিশ্চয় আঙুল দিয়ে ট্র্যাপমিটারের চারি টিপে কল সাইন পাঠাচ্ছে—‘হুয়ার রুডের একটানা হাহাকার শ্রানির মধ্যে সাহায্য নিয়ে কেউ এল কিনা শোনার জন্যে মাথা নিচু করে আছে সে।’

কিংবা, কে জানে, কল সাইন পাঠাবার মত কেউ হয়তো আর নেই ওখানে। ড্রিফট স্টেশন নভেলিতে কাজ করার জন্যে সাধারণ লোকজনকে পাঠানো হয়নি, কিন্তু এমন একটা সময় আসে যখন কিনা সবচেয়ে দুঃসাহসী, কঠিন প্রাণ, সব কিছু সহ্যে পারে এমন লোকও সমস্ত আশা ছেড়ে দিয়ে মৃত্যুকে মেনে নেবার জন্যে গুয়ে পড়ে। কে জানে, নভেলির এই লোকটাও হয়তো তাই করেছে। ভারী বরফ, এখনও ভারী বরফ।

সাড়ে পাঁচটা। শান্ত পায়ে হেঁটে এসে রানার পাশে দাঁড়ালেন রাইকভ। রুডেনকোর কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি দিয়ে জানতে চাইলেন, ‘কতটা পুরু বরফ—গড়ে?’

‘বারো থেকে পনেরো ফিট,’ বলল রুডেনকো। তার গলার সুর ক্রান্ত, নিস্তেজ। ‘পনেরোর কাছাকাছি।’

একটা কোনোর ত্রিসিটার তুললেন কমান্ডার। ‘লেকটেন্যান্ট বুলিন? আশা এখানে ক্যাপ্টেন। টর্পেডো নিয়ে কাজ করছিল তোমরা, ওগুলো রেডি আছে?—চারটে? ওহ। স্ট্যান্ড বাই টু লোড। আর ত্রিশ মিনিট সার্চ করা হবে, তারপর তোমার ওপর ছেড়ে দেয়া হবে বাশাগটা।—হ্যাঁ, তাই। বরফের পায়ে আমরা একটা গর্ত তৈরি করব।’ ত্রিসিটার বেধে দিলেন তিনি।

'পনেরো ফিট পুরু বরফ, চাটখানি কথা নয়,' আপনমনে বিভবিড় করে উঠল লেনফোর্টের রুস্তভ। তারপর ক্যান্টেনের দিকে তাকাল। টর্পেডো ছুঁড়ে গর্ত করা সম্ভব বলে মনে করছেন আপনি?

'জানি না,' একটু অধৈর্যের সাথে বললেন রাইকভ। 'চেষ্টা করে না দেখা পর্যন্ত বুঝব কিভাবে?'

'এর আগে কেউ চেষ্টা করেনি?' জানতে চাইল রানা।

'না। অতীত সোভিয়েত নৌ-বাহিনীর কেউ করেনি। মার্কিনীদের কথা বলতে পারি না। ওরাও বোধহয় করেনি।'

'আজারওয়াটার শক-ওয়েভ লেনিনগ্রাদের ক্ষতি করবে না?'

'জাহাজ থেকে হাজার ফিট দূরে চলে যাবার পর রিমোট-কন্ট্রলের সাহায্যে ওয়র-হেডের বিশ্লেষণ ঘটাব আমরা। এমনভাবে ওটা বড়না হয়ে আটশো ফিট না যাওয়া পর্যন্ত সেফটি ডিভাইসের তালি খোলে না, ওই তালি খোলার পরই ওয়র-হেডটাকে সশস্ত্র বলা যায়। বিশ্লেষণের সম্মুখীন হতেই মূব করে থাকবে আমাদের বো। তাছাড়া, লেনিনগ্রাদের খোল এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে, হাজার হাজার টন চাপ সহ্য করতে পারবে সে। শক-ওয়েভের ধাক্কা যা লাগবে সেটা নগণ্য।'

'খুব ভারী বরফ,' খামখেয়ালি শোনাল ডা. ক্রুডেনকোর গলা। 'ত্রিশ ফিট, চল্লিশ ফিট, পঞ্চাশ ফিট। খুব, খুব ভারী বরফ।'

'পঞ্চাশ ফিট!' হতাশ সুরে বলল রানা। 'কক্ষের নিচের স্তরে খুব বেশি হলো একটু চিড় ধরতে পারবে আপনার টর্পেডো।'

'এরচেয়ে পাতলা বরফের একটা বড় এলাকা বেছে নেব আমরা, তারপর হাজার ফিট পিছিয়ে এসে টর্পেডো ছাড়ব...'

'পাতলা বরফ!' চিৎকার নয়, মিসফিসে শোনাল ডা. ক্রুডেনকোর কণ্ঠস্বর। 'পাতলা বরফ! না-না-না! ক্রিয়ার ওয়াটার! পরিষ্কার, স্বচ্ছ পানি! কি সুন্দর পরিষ্কার! পরিষ্কার পানি!'

সেই মুহূর্তে রানার মনে হলো, হয় আইস মেশিন নয়তো ডা. ক্রুডেনকোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু ডাইভিং প্যানেলে যে অফিসার বসে রয়েছে তার মনে এ-ধরনের কোন সন্দেহ দেখা দেয়নি। পেছনের দিকে এত দ্রুত ঘুরতে শুরু করল লেনিনগ্রাদ, খপ করে হ্যাডরেইল ধরে ফেলে কোনরকমে পতনটা ঠেকাল রানা। সম্পূর্ণ মূরে গিয়ে ফেলে আসা পথ ধরে এগোল লেনিনগ্রাদ, ইঞ্জিনের আওয়াজ কমে এল, প্রথ হয়ে এল গতি। ডা. ক্রুডেনকোর নির্দেশিত স্পটে ফিরে এল ওরা। স্থির হয়ে গেল লেনিনগ্রাদ।

'ক্রুডেনকো?' বাড়ী চাইলেন রাইকভ।

'পরিষ্কার, পরিষ্কার পানি,' সাথে সাথে রিপোর্ট করল ক্রুডেনকো। 'বিশেষ সতর্ক, কিন্তু আমাদেরকে তাই দেখান জনো মাথের ওড়না।'

'একশো পঞ্চাশ ফিট,' রাইকভ বললেন।

চলু হয়ে গেল লাশপ। ধীরে ধীরে ওপর নিচের উঠতে শুরু করল লেনিনগ্রাদ। ট্যাংকে ভরা কিছু পানি ফিরে এল। স্থির হয়ে চলে গেল সারমেরিকা।

'আপ পেরিস্কোপ,' নির্দেশ দিলেন ক্যান্টেন।

মুদু হিস হিস শব্দ করে উঠে এল পেরিস্কোপ। আই-পীসে চোখ রেখে তিন সেকেন্ড কিছু দেখলেন রাইকভ, তারপর সিঁদে হয়ে রানার দিকে ফিরলেন। 'সুন্দর দৃশ্য, দেখুন।'

দেখল রানা। দু'দিকেই নিরেট, নিকম্ব কালো আধার, সেই দু'পাটি আধারের মাঝখানে কলাপাতা রঙের একটা করে ডোরা। পোলার প্যাঁকে একটা খোলা মুখ।

তিন মিনিট পর আকটিক মহাসাগরের ওপর ভেসে উঠল ওরা। নর্থ পোল মাত্র আড়াইশো মাইল দূরে।

ছয়

লেনিনগ্রাদের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে বরফের ঢিবি, এক একটা প্রায় পঞ্চাশ ফিট উঁচু, সেইলের মাথা ছাড়িয়ে উঠে গেছে আরও বিশ ফিট। এত কাছে, যেন হাত বাড়ালেই কাছের ঢিবিটাকে ছোঁয়া যাবে। ঢিবিগুলো একত্রে বেঁধে, কিনারা ভাঙা, সারি সারি সাজানো রয়েছে পশ্চিম দিকে অনেক দূর পর্যন্ত। আরও দূরে ফ্রাড লাইটের আলো পৌঁছুল না, ওশিকটা শুধু অন্ধকার।

খুব দিকে একেবারে কিছুই দেখল না ওরা। খালি চোখে ওদিকে পাঁচ-সাত সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার মানে হবে চিরকালের জন্যে অন্ধ হয়ে যাওয়া। গপলসের সামনে থেকে মুহূর্তের জন্যে হাত সরালে সেটার গায়ে কাঁটাকুটির দাপ পড়ে যাবে। লেনিনগ্রাদের এক পাশের আড়াল থেকে একবার উঁকি দিল রানা, মাত্র এক সেকেন্ডের জন্যে। মাথা নিচু করে, হাত দিয়ে চোখ ঢেকে রাখল ও। কি দেখল ঠিক বুঝল না। কালো পানি? নাকি অন্ধকারে বিস্তৃত বরফ?

তীব্র বাতের একনাগাড় হাফাকারে বান পাতা দায়। ব্রিজ অ্যানিমিটারে বাতের গতি ঘটায় ষাট মাইল। এর আগের তুষার-বাতের সাথে এই প্রলয়-মতোব কোন তুলনাই হয় না। ওদের সামনে এটা যেন একটা বরফ কুটির দেয়াল, সেই আকাশ পর্যন্ত ঠেকে আছে, দেয়ালের গা থেকে তীব্রবেগে ছুটে আসছে ডগায় ছুরির ধারাল পাত সহ বরফের বর্ষা। হাতে কাঁচ বা হাডবোর্ড থাকলে ভেঙে চুরমার হয়ে যেত। বাতানের শো-শো শব্দকে চাপা দিয়ে অনবরত কানে বাজছে বরফ ভাঙার আওয়াজ। মাইলের পর মাইল নিরেট, শক্ত বরফের গায়ে চিড় ধরছে—সে এক ভয়ানক গভীর আর ভারী দ্রিম-দ্রিম গর্জন, ওনতে ওনতে বুকের রক্ত পানি হয়ে আসে। ক'মাইল, কত শত মাইল দূরে শত-সহস্র কোটি টন বরফ বিস্ফোরিত হচ্ছে, আন্দাজ করার সাধ্য নেই কারও।

'দু'জনেই কি পাগল হয়ে গেলাম? আসুন, পানিয়ে বাচি।' রানার কানের কাছে মুখ সরিয়ে নিয়ে এসে চিৎকার করতে হলো ক্যান্টেন রাইকভকে, 'তবু কোনরকমে চলতে পেল রানা।'

কন্ট্রোল রুমে নেমে এসে বড়ে যেন প্রাণ ফিরে এল ওদের। পাতলা হুড, স্বাক্ষ

আর গগনস খুলে ফেলল ওরা। রানার দিকে তাকিয়ে এদিক-ওদিক মাথা নাড়লেন রাইকড। "অপচ লোকে বলে আর্কটিক নাকি 'হোয়াইট সাইলেন্স'। এর আগেও তো আর্কটিকে এসেছি, কিন্তু এমন তুলফালম কাও আর দেখিনি। হ্যাঁ, ঠাণ্ডার কাপনি ধরে যায়, ঝড়ও থাকে, কিন্তু বরফের ওপর একটা হাঁটাচাঁটা করতে পারিনি এমন ঘটনা কখনও ঘটেনি। ক্যাপ্টেন স্ট্রট কেন যে মারা গিয়েছিলেন, এখন বুঝতে পারছি।"

"হ্যাঁ, অবস্থা বিশেষ সুবিধের নয়, মন্তব্য করল রানা, তারপরই জানতে চাইল, 'আমরা এখানে কতটুকু নিরাপদ, ক্যাপ্টেন?'

কাঁধ ঝাকালেন রাইকড। "বলা কঠিন। বাতাস আমাদেরকে পলিনাইয়ার পশ্চিম দেয়ালের গায়ে সাঁচিয়ে রেখেছে, আর স্টারবোর্ডের দিকে হয়তো পঞ্চদশ গজের মত খোঁচা পানি রয়েছে। আপাতত আমরা নিরাপদ, এটুকু বলা বোধহয় তুল হবে না। কিন্তু আপনিও তো দেখলেন, আইস প্যাক জ্যাক হয়ে উঠেছে, নড়াচড়া করছে—তায় এই আড়মোড়া ভাঙা, এর চেয়ে বিপজ্জনক আর কি হতে পারে? আমরা যে গর্তের মুখে ভেসে রয়েছি, এর বয়স এক ফটাও নয়। প্রশ্ন হলো, বলল যাই হোক, এর আশু কতটুকু?"

"কতটুকু?"

"কেউ জানে না। পোলার আইস প্যাকের মন-মজির ওপর নির্ভর করে। চাপ পড়লে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে এই গর্ত জন্মগ ছোট হতে হতে একেবারে ডুবাট হয়ে যেতে পারে। যতই কিনা মজবুত করে তৈরি হয়ে থাকুক জেনিনথাদের ধোর, দশ লক্ষ টন বরফ যদি এর গায়ে হেলান দেয়, কতক্ষণ তা সহ্যে পারবে?"

"হুঁ।"

"যদি কয়েকের মধ্যে কিছুই হয়তো ঘটবে না, আবার হয়তো দু'চার মিনিটের মধ্যে এখান থেকে চলে যেতে হতে পারে আমাদের। যাই ঘটুক, পুর পাঁচিল স্টারবোর্ডের দশ ফিটের মধ্যে চলে এসেছে দেখলেই গর্তের নিচে নেমে যাব আমরা। বরফের চাপ লাগলে একটা জাহাজের কি অবস্থা হতে পারে সেটা নিশ্চয়ই আপনি বোঝেন।"

"সুবি। চিড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে যায়। বরফের সাথে বছর কয়েক দুনিয়ার চাঁদিয়ে ঘুরে বেড়ায়, তারপর একদিন ছাড়া পেয়ে আর্কটিক মহাসাগরের অন্তরতলে তলিয়ে যায়, নোজা দু'মাইল নিচে।"

"সেরকম একটা কিছু যদি ঘটেই, কমান্ডার রাইকডের পদোন্নতির আশা খুলোয় নুতাবে! মচকি হেসে বললেন রাইকড। "আমার মনে হয়—"

"ক্যাপ্টেন! চিৎকারটা এল রেডিওরুম থেকে। 'ক্যাপ্টেন, ব্রীজ!'

রেডিওরুম থেকে ওরা দেখল, দরজার দিকে অর্ধেক ফিরে চেয়ারে বসে আছে পিনিন, চোখের দুই কোণ দুই কানের লতি দুই হুই করছে। বাজানো বা হাতে এয়ারফোন, নেটা নিয়ে কানে তোকালেন রাইকড। কয়েক সেকেন্ড হলেন তিনি, তারপর মাথা ঝাকালেন।

"ডি.এল.এম. মদু কণ্ঠে বললেন। "ডি.এল.এম., ডা. রানা। নভেলির কল সাইন।" পিনিনের দিকে তাকালেন। "বেরাশিং পেয়েই? ওহ।" হাড় ফেরালেন

কোয়ার্টার মান্ডারের দিকে। "নুতিনভ, নেভিগেটিং অফিসারকে তাকাতাড়ি আসতে বলো।"

"এবার আমরা ওদের সবাইকে উদ্ধার করতে পারব, ক্যাপ্টেন," একগাল হাসল পিনিন। পরমুহুর্তে প্রকাণ্ড মুখ ভারী, গভীর হয়ে উঠল, "যাই বলুন, ওরা ওখানে যারা রয়েছে—বাপের বাটা! প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করে টিকে আছে!"

"ঠিক বলেছ।" অন্যমনস্ক দেবাল রাইকডকে। চোখ দুটো আধবোজা, গভীর মনোযোগ দিয়ে কি যেন শোনার চেষ্টা করছেন।

সাবমেরিনের বাইরে প্রলয়কণ্ঠী তুফানের মাতামাতি চলেছে, বাইরের গায়ে ছুটে এসে গৌণে যাচ্ছে যেন লাস-কোটি ধারাল বরফছুরি। সেই শব্দই কেড়ে নিচ্ছে ক্যাপ্টেনের মন, বুঝতে পারল রানা।

"হ্যাঁ, ঠিক বলেছ—বাপের বাটা। টু-ওয়ে কনটাক্ট রয়েছে এখনও?"

মাথা নাড়ল পিনিন। হাড় ফিরিয়ে নিল। মুখে আর হাসিটা ফিরে এল না। রেডিওরুম থেকে ক্যাপ্টেনের হাতে একটা কাগজ ধরিয়ে নিল ওসিপভ, সাথে সাথে প্রুটিং টেবিলের কাছে ফিরে গেল আবার। তার পিছু পিছু রেডিওরুম থেকে বেরিয়ে এল ওরা। এক দেড় মিনিট পর মুখ তুলে ওদের দিকে তাকাল ওসিপভ, বলল, "কেউ যদি সাত্তা ভ্রমণে বেরুতে চান, এটা একটা সুযোগ।"

"এত কাছে?" জিজ্ঞেস করল রাইকড।

"এতই কাছে। পাঁচ মাইল পূবে, আধ মাইল কম বা বেশি হতে পারে। ব্রাডহাউন্ডের মত গন্ধ ঠকে ঠকে চলে এসেছি আমরা, কি বলেন ডা. রানা?"

"আসলে ভাগ্য আমাদের সাহায্য করেছে," মদু কণ্ঠে বললেন রাইকড। রানার সাথে ফিরে এলেন রেডিওরুম। "যোগাযোগ হলো?"

"ওদের আমরা হারিয়ে ফেলেছি, ক্যাপ্টেন।"

"একেবারে?"

"মিনিট খানেকের জন্ম পেয়েছিলাম, তারপর অশ্পষ্ট হতে হতে মিলিয়ে গেল। ডা. রানার কথাই বোধহয় ঠিক—হ্যাড্র-অপারেটিং জেনারেটর ব্যবহার করেছে ওরা।" একটু থেমে, কথাগুলো আবার বলল, "আমার ছয় বছরের মেয়েটা ওই রকম একটা জেনারেটর চালায়—একটানা পাঁচ মিনিট চালিয়েও একটু হাঁপায় না।"

রানার দিকে তাকালেন রাইকড, কিন্তু কথা না বলে ঘুরে দাঁড়ালেন। রানা তাঁকে অনুসরণ করে খালি ডাইভিং স্ট্রাভে চলে এল। বিজে ওঠার খোঁচা হ্যাচ থেকে তুফান আর বরফ-বিশ্বোষণের আওয়াজ ভেসে আসছে, চিৎকার না করলে কারও কথা শোনার উপায় নেই।

"ভাবছি, ঝড়টা থামবে কখন।"

"থামবে, তাই বা ভাবছেন কেন?" জানতে চাইল রানা। "আমার কেবিনে শীতের কাপড়-চোপড়, একটা মেডিকেল কিট, আর ফ্রাঙ্ক পঞ্চাশ হাউস মেডিসিন্যাল অ্যানকোহল আছে। ইমার্জেন্সী রেশন তর্র ত্রিণ পাউডারের একটা প্যাকেট নিতে পারেন আমাকে?"

ধতমত বেয়ে গেলেন রাইকড। "মানে?"

গম্বীর দেখান রানাকে। 'আপনি জানেন।'

'এই পাগলামির কোন মানে হয় না, ডা. রানা।'

'কি ধরনের পাগলামি, জানতে পারি? ফরওয়ার্ড প্যানেজওয়ারের নিক থেকে একটা দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল লেফটেন্যান্ট রুস্তম।'

'ডা. রানা বলছেন, কাঁধে বাগ মুলিয়ে নভেলির দিকে রওনা হবেন—পায়ে হেঁটে।'

'আবার ওদের পাড়া পাওয়া গেছে?' রানার ব্যাপারটা আপাতত ভুলে গেল রুস্তম। 'কল-বেয়ারিং?'

'ওসিপভ বলছে, পাঁচ মাইল।'

'হোয়াট! পাঁচ মাইল! মাত্র পাঁচ মাইল?' পরমুহর্তে কেউ যেন একটা বোতাম টিপে দিয়ে তার চেহারা থেকে সমস্ত আনন্দ বিখ্য আর উত্তেজনার আলো নিভিয়ে দিল। বীরে ধীরে মাথা নাড়ল সে। রান সূরে বলল, 'আবহাওয়ার যা অবস্থা, পাঁচ মাইল আর পাঁচশো মাইল একই কথা। এমন কি বুড়ো আনুভূতসেনও এই অবস্থায় আবহাওয়াই দশ কদম ঘুরে আসতে রাজি হতেন না।'

'কিন্তু ডা. রানার ধারণা, উনি আনুভূতসেনের রেকর্ড ভাঙতে পারবেন,' ওকনো, নিরস কণ্ঠে বললেন রাইকড। 'পায়ে হেঁটে পৌঁছুতে চান ওখানে!'

রানার দিকে অনেককক্ষ তাকিয়ে থেকে কি যেন বিবেচনা করল রুস্তম, 'আবহাওয়ার রাইকডের দিকে ফিরল। 'অবস্থা যদি এতটাই খারাপ হয়ে থাকে, অনুমতি দিন, একে আমরা সেলের ভেতর আটকে রাখি।'

'শেষ পর্যন্ত তাই না করতে হয়!'

মনের ভেতর জমে ওঠা বাগ বিস্ফোরণের মত রানার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল। নাতিদীর্ঘ একটা বক্তৃতা দিয়ে ফেলল ও, 'এখানে আমরা প্রাকৃতিক শোভা দেখতে বা ঠাণ্ডা হাওয়া খেতে আসিনি, ক্যান্টেন রাইকড। নেষ্টন নভেলিতে মানুষজন রয়েছে—এখন হয়তো বেশি নয়, অল্পত একজন রয়েছে। লোকটা অসুস্থ, মারা যাচ্ছে। এই মুহূর্তে তাকে বাঁচাবার জন্যে কি দরকার তা বোঝানো জেনো আপনার ডাক্তার হবার দরকার নেই। এক আউস অ্যালকোহল, কিছু খাবার, গরম একটু কফি আর দু'একটা ওষুধ। এই সামান্য ক'টা জিনিস সময় মত না পৌঁছুলে লোকটা মারা যাবে। আর কিছু না হোক, মানবতার খাতিরে তাকে সাহায্য করা দরকার। সাথে কাউকে যেতে বলছি না আমি, ওধু মস্তোর অর্ডার স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলতে চাইছি জু এবং লেনিনগ্রাদের নিরাপত্তা বিপন্ন না করে আমাদের সাহায্য করুন। বাধা দেয়ার হুমকি দিচ্ছেন—এই কি আপনার লক্ষ্যসমূহের নমুনা?'

মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকলেন রাইকড। কি ডাবছেন কে জানে।

'বানাকে ঠেকাতেই হবে ক্যান্টেন।' জরুরী আবেদনের সূরে বলল লেফটেন্যান্ট রুস্তম। 'কেউ যদি নিজের মাথায় পিগুন তৈরিতে টিগার টিপতে যায়, কিংবা কেউ যদি নিজের গলায় কুণ্ড ঢালাতে চেষ্টা করে—আপনি তাকে বাধা দিচ্ছেন না? বানাও ঠিক তাই করতে চাইছে। সেক্ষেপাংলানি—আত্মহত্যা করতে চায়। ঋতু করে ফিরল রানার দিকে, রানি হঠাৎ উঠেছে চেহারা। 'আনন্দের বোনে আছি অথচ সেনার অপারেক্টর ডিউটি দিচ্ছে—কেন জানো? বরফ পাঁচিল তফাতে

রয়েছে, কিন্তু কাছে সরে আসতে দেখলেই রিপোর্ট করার জন্যে। লেনিনগ্রাদের নিরাপত্তা বিপন্ন হয়নি, কিন্তু পাঁচ সেকেন্ড পর হবে না তাই বা কে বলতে পারে? তাছাড়া, এই কাজের মধ্যে বিজে উঠে বিশ সেকেন্ড টেকাই যেখানে সম্ভব নয়, কিভাবে ভাবব তুমি...?'

মুদু কণ্ঠে রাইকড বললেন, 'এইমাত্র বিজ থেকে নেমে এলাম আমরা।'

'আবহাওয়ার যেতে চাইছে ও?' অসহায় ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রুস্তম। 'যা বলছি—ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

'আরেক কাজ করা যেতে পারে,' রাইকড বললেন। 'এখান থেকে নিচ নেমে আরও বানিক সামনে গিয়ে আরেকটা পলিনাইয়া খুঁজে নিতে পারি। সেখান থেকে নভেলি এক-আধ মাইল দূরে হলে একটা ব্যবস্থা করতে করা যাবে।'

'বড়ের গাদা থেকে আলপিন খুঁজতে চাইছেন আপনি,' বলল রানা। 'এটা পেতে হয় ঘন্টা লেগেছে, তার ওপর ভাগটাও ভাল ছিল। আর, টর্পেডোর কথা ভুলবেন না। গোটা এলাকায় একশো ফিট পুরু বরফ ভাসছে। বরফের ওপর আবহাওয়া তুলতে কয়েক দিন লেগে যেতে পারে। কিন্তু আমি শেলে দুই, খুব বেশি হলে তিন ঘন্টার মধ্যে পৌঁছে যাব।'

'কিন্তু প্রথম একশো গজ পেরোবার আগেই যে তুমি জমাট বরফ হয়ে গিয়ে মারা যাবে, তার কি?' প্রশ্ন করল রুস্তম। 'ছোট গর্তের ভেতর পড়ে পা ভাঙতে পারো, তার কি? বরফ কুচি লেগে চোখ দুটো নষ্ট হয়ে গেলে, তখন? আর দেখতে না পেয়ে কোন পলিনাইয়ার ভেতর পড়ে যদি তলিয়ে যাও, তখন কি হবে? তুমিও জানো, পানিতে পড়লে ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে নিশেট বরফ হয়ে যাবে পরীরে। একটু দম নিয়ে আবার শুরু করল সে, 'না হয় ধরে নিলাম, এসব কিছুই ঘটবে না, বহাল তবিয়েই থাকবে তুমি, কিন্তু অল্প অবস্থায় পাঁচ মাইল দূরের একটা নির্দিষ্ট জায়গায় কিভাবে তুমি পৌঁছুবে বুঝিয়ে দাও আমাকে।'

রানা কথা বলল না দেখে আবার শুরু করল সে, 'মনে রেখো, তোমার মত জেনী একজন লোকের পক্ষেও আধ-টন ওজনের একটা জাইরো পিঠে করে হয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আর এই অক্ষাংশে ম্যাগনেটিক কম্পাস কোন কাজেই আসবে না। আমরা যেখানে রয়েছি সেখান থেকে ম্যাগনেটিক নর্থ পোল যথেষ্ট দক্ষিণে, এবং অনেকটা পশ্চিমে। তবু যদি ছাই কোন ধরনের বেয়ারিং ওটা থেকে তুমি পেয়েও যাও, অক্ষতার আব এই কাজের মধ্যে ক্যাম্পটা খুঁজে খেঁজ করতে কিভাবে? ওটা থেকে মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে থাকলেও জানার উপায় নেই কোন দিকে কতদূর যেতে হবে তোমাকে। এত সন্দের পরও তুমি যদি পৌঁছুতে পারো, ফেরার পথটা চিনবে কিভাবে? ক্যাম্পের কিতে ছাড়তে ছাড়তে এগোবে, নাকি পাঁচ মাইল লম্বা সূতো? উই, একে পাগলামি বলা যথেষ্ট নয়—এ প্রকল্পে শোনাওঁমি, নিবৃত্তি।'

'সব বিশ্বাস করলাম,' বলল রানা। 'পা ভেঙে যেতে পারব। ভুলে যেত পারি। বরফ হয়ে যেতে পারি। কিন্তু এসব ঝুঁকি আমি নিতে চাই। পথ বুজিয়ে নিয়ে এখানে পৌঁছানো বা ফিরে আসা—এর জন্যে আত্মীয় প্রদীপের কোন দরকার হবে না। নভেলির রেডিও বেয়ারিং রয়েছে তোমাদের হাতে, ঠিক কোথায় রয়েছে

নভেলি তোমরা তা জানো। যে-কোন ট্রান্সমিটারের রেডিও বেয়ারিং ভিত্তি প্যারো তোমরা। আমাকে শুধু সাথে করে একটা বিলিভার ট্রান্সমিটার নিয়ে যেতে হবে। তোমাদের সাথে যোগাযোগ থাকবে আমার, তোমরা আমাকে নভেলির বেয়ারিং জানাবে। পানির মত সহজ।

‘হয়তো তাই,’ বলল রুস্তভ। ‘কিন্তু অসুবিধে একটাই, ও-ধরনের কোন রেডিও আমাদের নেই।’

‘আমার ব্রিফকেসে আছে,’ বলল রানা। ‘ওয়াকিং-টকি। বিশ মাইল রেঞ্জ।’

‘অবাক হবার কিছুই নেই,’ বিক্রপের সুরে বলল লেফটেন্যান্ট। ‘আরও সব নানা ধরনের আশ্চর্য জিনিসের সাথে কেমন করে জানি এসে গেছে ওটা, তাই না, ডাক্তার?’

‘হ্যাঁ, রানার সাথে কি আছে না আছে সেটা আমাদের বিবেচ্য বিষয় নয়,’ গলার আওয়াজ শুনে বোঝা গেল রুস্তভের নিন্দা করছেন রাইকভ। যদিও প্রথম দিকে তিনি ঠিক এর উল্টো কথাই ভেবেছেন। ‘উনি একা যেতে চাইছেন, সেটাই আমাদের যথাব্যথার কারণ। হ্যাঁ, রানা, আপনার এই উদ্ভট প্রস্তাব আমরা মেনে নিতে পারি না।’

‘কেউ আপনাকে মেনে নিতে বলছেও না,’ বলল রানা। ‘আমার যাওয়া না যাওয়ার ব্যাপারে আপনার অনুমতি দরকার করে না। আমি শুধু বলছি, আমার পথ থেকে সরে দাঁড়ান। এবং যা যা লাগে তার একটা প্যাকেট তৈরি করে দিন। যদি না দেন, ওটা ছাড়াই যেতে হবে আমাকে।’ কথা শেষ করে সেখানে আর দাঁড়ান না রানা, নিজের ফেবিনে ফিরে এল। ভেতরে ঢুকে প্রথমেই তানা লাগিয়ে মিল দরজায়। এবার কমবিনেশন মিলিয়ে ব্রিফকেসের তানা খুলল, উচু করল চাকমিটা। ভেতরে চাব ভাগের তিনভাগ জায়গা দখল করে আছে আর্কটিকে টিকে থাকার উপযোগী গরম কাপড়-চোপড়। কোটি টাকা দিলেও এর চেয়ে ভাল কাপড় পাওয়া যাবে না কোথাও।

লম্বা একটা আড্ডারওয়ার, উলেন শার্ট, কবডুরা ট্রাউজার, তরুণর খাটি নিক দিয়ে কিনারা মোড়া তে-সেলাই উলের একটা পারকা পড়ল ও। বা বগলের একটু সামনে এবং নিচে তেরছা মুখো একটা পকেট আছে পারকায়, ডান দিকের পকেটটা আরেক সাইজের। ব্রিফকেস থেকে ব্রুত তিনটে জিনিস বের করল ও। একটা থ্রী-টু ক্যালিবরের ওয়ানথার পি. পি. কে ডাবল-আকশন অটোমেটিক পিস্তল, পারকার বা পকেটে ঢুকে গেল। বাকি দুটো ম্যাগাজিন ব্রুপ, ঢুকল ডান পকেটে।

বাকি কাপড়-চোপড় পরতে বেশি সময় লাগল না। ঘন করে বোনা দু'জোড়া উলেন মোজা, ফেল্ট আন্ডারসু এবং সবশেষে ফার-আউটার পারকা আর ট্রাউজারের জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে ক্যান্ডিবা, হুডের জন্যে উলভারিন, বুটের জন্যে সোলাকিন, অফ গ্রাউন্ডের জন্যে বের্লিন ডিম্বারের চামড়া। গলায় ব্রো-মাক্স আর বগলস খুলিয়ে নিল ও, ফার পারকার ভেতরের পকেটে ভরল ওয়াটারপ্রুফ ফ্ল্যাশলাইট। ওয়াকিং-টকি বের করে ব্রিফকেস বন্ধ করে দিল ও। কমবিনেশন স্টেট করারি আর কোন দরকার ছিল না, তবু সেট করল—ওর চলে যাবার পর সময়

কাটাবার জন্যে একটা কাজ থাকল ক্যাপ্টেনের। তানা খুলে ফেবিন থেকে বেরবার আগে ব্যাকসাকে মেরিসিন কেস আর ইম্পাটের তৈরি একটা ফ্লাস্ক ভরে নিল ও। ফ্লাস্কে আলকোহল রয়েছে।

কন্ট্রোলরুমে সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন ক্যাপ্টেন। রুস্তভ ও। ওদের সাথে আরও দু'জনকে দেখা গেল, গ্যাকো আর পিনিন। রুস্তভ, গ্যাকো আর পিনিন—প্রকাণ্ডস্টী বলতে জাহাজে এই তিনজনই।

সোজা এগিয়ে এসে ক্যাপ্টেনের সামনে দাঁড়াল রানা। জানতে চাইল, ‘প্যাকেটটা আমি পাবি?’

‘এই শেখবার অফিশিয়ালি বলছি—এটা রেকর্ড হয়ে থাকবে—’ বললেন রাইকভ, ‘আপনি যা করতে চাইছেন তা আত্মহত্যারই নামান্তর। বেচ্যে ফিরে আসবেন তার কোন আশা নেই। এতে আমার বিবেকের সায় নেই।’

‘বেশ তো, সাক্ষীদের উপস্থিতিতে কথাগুলো রেকর্ড হয়ে গেল। আমার প্যাকেট?’

‘আমার বিবেকের সায় নেই,’ এমনভাবে বলে চললেন রাইকভ, যেন রানার কথা শুনেই পাননি, ‘ফারগ, জাহাজে হঠাৎ করে একটা সংকট দেখা দিয়েছে। এই খানিক আগে আমাদের একজন ইলেকট্রনিক টেকনিশিয়ান আইস মেশিনের স্টাটিন ক্যালিব্রেশন টেস্ট করতে গিয়ে আবিষ্কার করেছে, ওভারলোড কয়েলটা কাজ করছে না। ইলেকট্রনিক মোটর জ্বলে গেছে। এর কোন স্প্যায়ার নেই। কাজেই, একবার যদি নিচে নামতে বাধ্য হই আমরা, পর চিনে আবার ওপরে ওঠা সম্ভব হবে না। তারমানে বরফের ওপর যারা থেকে যাবে, তারা শেষ।’

ওকে ঠেকাবার চেষ্টা করছেন ক্যাপ্টেন, সেজন্যে তাঁকে দোষ দেবার কিছু নেই। কিন্তু ভুলনোক ওকে বরা একটু নিরাশই করলেন। এরচেয়ে ভাল কোন গর ফাঁদতে পারলেন না। ‘আমার প্যাকেট, কমান্ডার। পাব ওটা?’

‘তবু আপনি যেতে চান? যা বললাম তা শোনার পরও?’

‘ঠিক আছে,’ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল রানা, ‘প্যাকেট ছাড়াই তাহলে যেতে হয় আমাকে।’

‘আমার একজিকিউটিভ অফিসার, টর্পেডোম্যান গ্যাকো আর বেডিওম্যান পিনিন,’ গাভীরের সাথে বললেন রাইকভ, ‘ব্যাপারটা পছন্দ করছে না।’

‘কে কি পছন্দ করল না করল তাতে আমার কিছু আসে যায় না, ক্যাপ্টেন।’

‘বলছে, এই রকম একটা নুঁকি ওরা আপনাকে নিতে দেবে না।’

একজন হলে কথা ছিল, দু'জনকেও হয়তো সামলাতে পারবে রানা, কিন্তু তিন তিনটে দানবের সাথে পেরে ওঠা সম্ভব নয়। সাথে পিস্তলটা আছে সত্যি, কিন্তু সেটা বের করতে হলে প্রায় বিব্রত হতে হবে ওকে। সে-সুযোগ ওরা তাকে দেবে বলে মনে করার কোন কারণ নেই। তাছাড়া, পিস্তল বের করতে পারলেই বা কি? মিছে হুমকিতে ভয় পাবার পাত্র রুস্তভ, গ্যাকো বা পিনিন নয়। ওরা ওদের কর্তব্য পালন করছে মাত্র, এই অবস্থায় তো আর গুলি করা সম্ভব নয়।

‘এক শর্তে যেতে পারেন আপনি,’ বললেন রাইকভ। ‘ওরা আপনার সঙ্গে যাবে।’

‘স্বৈচ্ছা নির্বাসনে’ বলল গ্যাকো। ‘আমরা তিনজন।’

ক্যাপ্টেনকে বলল রানা, ‘আমি ওদের চাই না।’

‘আত্মত্যাগের কৃতিত্বটুকু একা নিতে চান উনি,’ বলল পিনি। ‘এমন স্বার্থপর মানুষ তুমি আর দেখিনি।’ রানার দিকে ফিরল। ‘অস্তুর থেকে না হোক, অস্তুর মৌখিক একটা ধন্যবাদ জানানো উচিত ছিল আপনার, ডা. রানা।’

‘আপনি আপনার ক্রুদের নিরাপত্তা বিপন্ন করতে চাইছেন, ক্যাপ্টেন,’ বলল রানা। ‘মস্ত্র থেকে কি নির্দেশ দেয়া হয়েছে মনে নেই?’

‘কিন্তু একজন ডাক্তারকে আকর্ষক স্বাদের মধ্যে ছেড়ে দিয়েছি, এই কথা জানাজানি হয়ে গেলে সোভিয়েত নৌ-বাহিনী দুনিয়ার কাছে মুখ দেবারে কিভাবে?’

‘সোভিয়েত নৌ-বাহিনীর মুখ রক্ষার জন্যে আপনার ক্রুরা কি নিজেদের জীবন বিপন্ন করবে? ওদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখেছেন?’

‘আমরা স্বৈচ্ছায় রাজি হয়েছি,’ বলল পিনি। ‘গ্যাকোর দিকে তাকান, চেহারা দেখে মনে হয় না, বীরোচিত কিছু করার জন্যেই জন্ম হয়েছে ওর?’

‘ভেবে দেখেছি, আমরা রওনা হবার পর বরফ যদি কাছে সরে আসে, আর ক্যাপ্টেন যদি জাহাজ নিয়ে নিচে নেমে যেতে বাধ্য হন—কি হবে তখন?’

‘ও-কথা মুখেও আনবেন না!’ আঁতকে উঠল গ্যাকো। ‘পিনিম যাই বলুক, আমি আসলে অতটা সাহসী নই।’

হাল ছেড়ে দিল রানা। বুঝল ওদেরকে ঠেকানো যাবে না। তাছাড়া, গ্যাকোর মত, নিজেকে ও তার অতটা সাহসী মনে হলো না। ওরা সাথে যাবে বুঝতে পেরে মনে মনে অস্তি এবং ভরসা পেল ও অনেকখানি।

রাইকভ বললেন, ‘তাহলে, ডা. মাসুদ রানা?’

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। ‘ঠিক আছে, যাবে,’ বলল ও। ‘কিন্তু এর জন্যে পরে কেউ যেন আমাকে দায়ী না করে।’

এতক্ষণে হালি ফুটল রাইকভের মুখে।

সাত

প্রথম প্রতিবাদ এল রুস্তভের কাছ থেকে। হাল ছেড়ে দিল বললে তুল বলা হবে, কেন না হাল ছেড়ে দেয়া কাকে বলে জানা নেই তার। আসলে ওদের চারজনের মধ্যে সে-ই প্রথম সুবুদ্ধির পরিচয় দিল। পিছন থেকে রানার হাত ধরে ফেলল সে, অর্ধাঙ্গি রানার মাথার কাছে সরিয়ে নিয়ে এল, স্নো মাস্ক নামিয়ে টেচিয়ে বলল, ‘আর এক পা-ও নয়। এবার পানো।’

পালটা আওয়াজ করে বলল রানা, ‘ওই পাচিলটা, এখানে গিয়ে।’ কথাটা রুস্তভ ভুলতে পেল কিনা বোঝা গেল না। নিলকরেন্দ্রা থেকে ছুটে আসা বরফ-ঝড়ের মধ্যে মুহূর্তের জন্যে স্নো মাস্ক খুলেই আবার সেটা নিয়ে ঢেকে নিয়েছে মুখ। তবে রানার কোমর পেঁচিয়ে পাকা রশিটা ছেড়ে দিল সে। পথ দেখিয়ে আবার এগিয়ে চলল

রানা।

রুস্তভ, গ্যাকো আর রানা গত আড়াই ঘণ্টা ধরে ওদের একজন পানো করে রশির আগা নিয়ে সামনে থাকছে, বাকি তিনজন পরস্পরের কাছ থেকে পিছিয়ে আছে দশ গজ। সবার পেছনে পিনি। সামনের লোকটা পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হলো বিপদ দেখা দিলে পিছনের ওরা যেন তার প্রাণ বাঁচাতে পারে। সেই রকম বিপদ এরই মধ্যে দেখা দিয়েছে একবার। চিড় ধরা বরফের ঢালের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছিল রুস্তভ। একে অন্ধকার, তার ওপর শব্দ বড়, চোখের সামনে নিজের হাতও দেখতে পাওয়া যায় না। ঢালের মাথায় উঠল, তারপর শক্ত বরফ মনে করে যেখানে রুস্তভ রানতে গেল সেখানে কিছু না থাকায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে, কিনারা থেকে ঝপ করে পড়ে গেল আট ফিট নিচে। রশিতে টান পড়ায় প্রচণ্ড এক ঝাঁক খেলো সে, সেই সাথে ঝাঁক খেলো রানা আর গ্যাকো।

প্রচণ্ড বাতাস এইমাত্র বরফের ছাল উড়িয়ে নিয়ে গেছে, টলমল করছে কালো পানি, তার ওপর দু’মিনিট বুলে থাকল রুস্তভ। রানা আর গ্যাকো রশি টেনে ঢালের ওপর তুলে আনল তাকে। কেউ কিছু বলল না, কিন্তু বুঝতে পারল বাকি থাকল না, নতুন জীবন ফিরে পেয়েছে রুস্তভ। একে সাব-জিরো টেম্পারেচার, তার ওপর বরফ-ঝড়, পানিতে পড়া মাত্র নিশ্চিত মৃত্যু। এই পরিস্থিতিতে পানি থেকে সদ্য তোলা লোকের কাপড়-চোপড় আর কাপড়-চোপড় থাকে না, শক্ত বরফের বর্ম হয়ে ওঠে। সেই বরফ না ভাঙা যায়, না শরীর থেকে খোলা যায়। অবশ্য, এক নিমেষে প্রায় একশো ডিগ্রী কম টেম্পারেচারের সংস্পর্শে আসার সাথে সাথেই মারা যায় লোকটা, তখন আর তাকে বরফ মুক্ত করা না করায় কিছু আসে যায় না।

এই ঘটনার পর সাবধান হয়ে গেল ওরা। পাঁচ ফুট লম্বা এক টুকরো রশি কালো পানিতে চুবিয়েই তুলে নিয়ে ধরা হলো বাতাসের দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যে লোহার মত শক্ত রত হয়ে গেল সেটা, অন্ধের যষ্টি হিসেবে কাজেও লাগানো হলো সেটাকে।

কখনও টলতে টলতে এগোল রানা, কখনও হামাগুড়ি দিল, নিত্তেজ হয়ে আসা বাতাস হঠাৎ এক একবার ফুসে উঠলে তাল হারিয়ে পড়ে গেল ঢালের মাথা থেকে একেবারে নিচে। হামাগুড়ি দিয়ে এগোবার সময় হঠাৎ বুলল, বাতাসের আগের সেই তেজ আর নেই, নিলকরেন্দ্রা থেকে ঝাঁক ঝাঁক বুলেটের মত বরফ কুড়িও ছুটে এসে ওর গায়ে পড়ছে না। বলেছিল বটে ওই পাচিলটা, কিন্তু সেটা কোথায় বা কতদূরে না জেনেই বলেছিল। হাতের বরফ-লাঠি নিয়েই কিছুটা সাবধানে লাগতেই বুলল, সামনে ডাসমান বরফের খাড়া প্রাচীর।

পাচিলের আড়ালে চলে এসে গগলস কপালে তুলল রানা। পকেট থেকে ক্যামফ্লাইট বের করে জ্বালল। অন্ধের মত সামনে হাত বাড়িয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে ওরা। গগলস কোন কাজেই আসেনি, লেনিনগ্রাদ থেকে নামার সাথে সাথে ওদের মাথায় চটের ঝাল পরিবেশ দেয়া হয়েছে বললে তুল বলা হবে না। রুস্তভের দিকে তাকাল রানা, তিনজনের মধ্যে সেই সবার আগে রয়েছে। গগলস, স্নো মাস্ক,

হুড়, কাপড়-চোপড়—পা থেকে মাথা পর্যন্ত তার শরীরের সামনেটা পুরু, নিরেট বরফে ঢাকা পড়ে গেছে। হাত-পা নড়ছে, তাই এখানে-সেখানে কিছু ফাটল ধরেছে। খট খট, মুড়মুড় আওয়াজ হচ্ছে, পাচ ফিট দূর থেকেও শুনেতে পেল রানা।

পাচিলের আড়ালে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে পড়ে থাকল ওরা। চকচকে সাদাটে-ধূসর রঙের একটা খরস্রোতা নদী মাথার চার ফিট ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। তুমার-ঝড়। রানার বা দিকে উঠে বসল গ্যাকো, মাথা নিচু করে বরফ মোড়া ফাব দেখাল, তারপর সমাদম যুগি দিতে শুরু করল বুকে।

খপ করে তার হাত ধরে ফেলল রানা। 'করো কি?'

'কেন, কি হয়েছে?' স্নো-মাস্কের ভেতর থেকে গ্যাকোর গলা ভোতা শোনাল। দাতে দাতে বাড়ি বাওয়ার শব্দটাও অস্পষ্ট।

'ঝড়টাকে ওই করফাই তো তেঁকিয়ে রেখেছে, ইনসুলেটরের কাজ করছে। ওটা না থাকলে এতক্ষণে মরে ভুত হয়ে যেত। কই দেবি হাত আর মুখ দেখাও আমাকে।'

একে একে তিনজনকে পরীক্ষা করল রানা, ওকে পরীক্ষা করল রুস্তভ। ভাগ্য ওদের এখনও ভালই বলতে হয়। ঠাণ্ডায় নীল এবং কাতর হয়ে পড়েছে বটে, কিন্তু ফ্রন্ট-বাইট এখনও হামলা চালাতে পারেনি কারও ওপরেই। ওদের ক্রান্ত চেহারা আর ঘন ঘন হাঁপানো দেখে মনে মনে ভয়ই পেল রানা। খেঁয়েদেয়ে মোটা-তাজা হয়েছে, কিন্তু শারীরিক খাটা-খাটনি কম বলে দম বাড়েনি। পিঠে চল্লিশ পাউন্ড প্যাফেট নিয়ে এই পরিস্থিতিতে আড়াই ঘণ্টা টিকে গেছে, সেটাই আশ্চর্য। কিন্তু এরপর?

'ফেরার রাস্তাও বন্ধ, তাই না, রানা?' হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল লেফটেন্যান্ট। 'এদিকে, এগোবার শক্তিও নেই আমাদের। উপায়?'

'ডা, রুডেনকোর লেকচার মন দিয়ে শুনলে আজ আর তেঁকতে না,' বলল রানা। 'ভাল-মন্দ খেয়ে গায়ত্রী শুধু চর্বি জমিয়েছ, একটুতেই কাহিল হয়ে পড়বে না তো কি!'

'একটুতেই, না?' রাকোর সাথে জানতে চাইল গ্যাকো। 'আপনার অবস্থা কি, শুনি? কাহিল হয়ে পড়েননি?'

'কাহিল?' অবাক হবার ভান করল রানা। 'আমি? আমাকে তুমি নদীর পুতুল ভেবেছ নাকি? শুধু রুস্তভ বলল, আর তাছাড়া তোমাদের বেহাল অবস্থা লক্ষ করে মনে দয়া হলো বলেই না এখানে থেমেছি আমি। আরও পাঁচ-সাত ঘণ্টা একটানা হাঁটতে পারি আমি, একটুও ক্রান্ত হব না।' ডাঁহা মিথো কথা। ওর নিজের অবস্থাও ওদের চেয়ে কোন অংশে ভাল নয়। ক্রান্তির জন্যে ওদেরকে লজ্জা পাওয়ানোই উদ্দেশ্য। ওর, তাতে যদি ওদের ভেতর কিছুটা শক্তি ফিরে আসে।

'এখানে আমরা পনেরো মিনিট জিরিয়ে নেব, তার বেশি এক সেকেন্ডও নয়। বেশিক্ষণ হাত-পা গুটিয়ে থাকা মানে বরফ হয়ে যাওয়া।' রাকস্যাক থেকে মেডিকেল অ্যানাকোহল বের করল ও।

'ও কি?' এক সেকেন্ড ইতস্তত করে জানতে চাইল রুস্তভ। 'ওনোই লোয়ার টেম্পারেচারে অ্যানাকোহল সাংঘাতিক ক্ষতি করে।'

'আমিও শুনেছি। আবার এর উল্টোটাও শুনেছি। এটাই নিয়ম। মানুষের সমস্ত আচরণ সম্পর্কে একদল ডাক্তার যা বলে আরেকদল সেটার ঘোর বিরোধিতা করে। ওদের এসব খেলার আমাদের না জড়ানোই ভাল। তাছাড়া, এটা ঠিক অ্যানাকোহল নয়, ফাইন স্কচ হুইস্কি।'

'সে-কথা আগে বলবে তো।' খুশি হয়ে উঠল রুস্তভ। 'গ্যাকো আর পিনিনের জন্যে একটু কম করে ঢালো—অভ্রাস নেই কিনা? কিছু বনলে পিনিন?'

ওয়াক-টকির এরিয়াল খাড়া করে পার্শ্বকার ঘাড়ের নিচে এরারফোন আটকে নিয়েছে পিনিন, মাইক্রোফোনটা দু'হাত দিয়ে ঘিরে নিয়ে কথা বলছে। রেডিও এক্সপার্ট, কাজেই ওয়াক-টকিটা তার কাছেই থাকা দরকার। সার্বমেরিন থেকে রওনা হবার আগেই সেটা তাকে গছিয়ে দিয়েছে রানা। ওটা তার কাছে আছে বলেই একবারও সবার আগে পথ চলেতে দেয়া হয়নি তাকে। পানির সংস্পর্শে এলে ওই রেডিও শেষ, সেই সাথে ওদের সমস্ত আশা ভরসারও ইতি—কারল ওটা ছাড়া ওরা যে শুধু ড্রিফ্ট স্টেশন নভেলিকে বুজে-পাবে না তাই নয়, পথ চিনে লেনিনগ্রাদে ফিরে যাবারও আর কোন উপায় থাকবে না। আকার এবং আকৃতিতে পিনিন মাঝারি সাইজের একটা গরু, নিজেকে রক্ষা করার সামর্থ্য তার ভালই আছে, কিন্তু তবু সবাই তার সাথে এমন আচরণ করে এসেছে, সে যেন মোম দিয়ে তৈরি সবার আদরের পুতুলটি।

'কঠিন ব্যাপার, লেফটেন্যান্ট,' বলল পিনিন। 'রেডিও ঠিকই আছে, কিন্তু এই বরফ-ঝড় ডিসটার্ব করছে—না, এক সেকেন্ড!'

মাইক্রোফোনের ওপর মাথা নামাল পিনিন, ঝড়ের আওয়াজ থেকে আড়াল করতে চাইছে সেটাকে। 'পিনিন বলছি...পিনিন। ...হ্যা, থেমে আছি আমরা, কিন্তু ডাক্তার রানা বলছেন, আমরা পারব। ...লাইনে থাকুন, তাঁকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিই।' মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল সে, 'কতদূর এসেছি জানতে চাইছে ওরা।'

'চার মাইল,' আন্দাজ করল রানা। 'সাড়ে তিন বা সাড়ে চারও হতে পারে।'

মাইক্রোফোনে আবার কথা বলল পিনিন, চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল রানা আর রুস্তভের দিকে, ওরা দু'জন মাথা নাড়তে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল সে। বলল, 'নেভিগেটিং অফিসার বলল, যেখানে থাকার কথা তার চেয়ে নাকি চার-পাঁচ ডিগ্রী উত্তরে সরে এসেছি আমরা। আবার-এগোবার সময় দক্ষিণ দিকে সরে না গেলে কয়েকশো গজ দূর থেকে পাশ কাটিয়ে যাব নভেলিকে।'

লেনিনগ্রাদের কাছ থেকে শেষবার বেয়ারিং পজিশন পেয়েছে ওরা ঘণ্টাখানেক বা তারও আগে। রেডিও যোগাযোগ ছাড়া দিক নির্দেশ পাবার একমাত্র উপায় বাতাসের সাহায্য নেয়া। বাতাস কোন দিক থেকে আসছে, কি তার গতি এসব যাচাই করা সহজ হয়ে ওঠে যদি সেটা অব্যবহৃত মুখে এসে লাগে। কিন্তু ওদের মুখ একে ঢাকা, তার ওপর ঠাণ্ডার অসাড়, বাতাস কোন দিক থেকে কতটা জোরে আসছে অনুভব করা প্রায় অসম্ভব। তাছাড়া, বাতাস আগে কোন দিক থেকে বইছিল, এখন কোন দিক থেকে বইছে, বানিক পত্র কোন দিক থেকে বইবে তা জানারও কোন উপায় নেই। কথাটা রুস্তভকে বলল রানা।

'হু, গম্ভীর গলায় বলল রুস্তভ। 'এই অবস্থায় গোলক বাঁধায় পড়ে ঢুকব

খাওয়ারই বেশি সম্ভাবনা।' দু'টোক দুইখি শিলে থক থক করে কাশতে লাগল সে। ফ্রান্সের টুপিটা রানার হাতে ফিরিয়ে দিল। 'তবু তুমি মনে করো, আমরা পারব?' 'ভাগ্যের সাহায্যে একটি তো লাগবেই। আচ্ছা, তোমার কি মনে হয়, আমাদের বোঝা খুব বেশি ভারী? কিছুটা হালকা করে নেবে?'

আশি পাউন্ড খাবার, একটা স্টোভ, ত্রিশ পাউন্ড কমপ্রেসড-ফুয়েল ট্যাবলেট, একশো পাউন্ড অ্যালকোহল, একটা তাঁবু, আর ভারী একটা মেডিকেল কিট বয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওরা। বোঝা হালকা করার জন্যে এর কিছুই ফেলে যেতে চায় না রানা, কিন্তু ফেলে যদি যেতেই হয়, মনে মনে চাইছে পরামশটা ওদের তরফ থেকেই আসুক।

'না,' বলল রুস্তভ। 'সম্ভবত পেটে দুইখি পড়ায় তার অবস্থার উন্নতি হয়েছে। গলার আওয়াজ আগের চেয়ে জোরাল শোনাচ্ছে, দাত দু'পাটির সংঘর্ষও কমেছে।'

'শিও থাকতেই ধারণাটার গলা টিপে মারুন,' বলল পিনি। 'আমার পিঠের ওপর বোঝাটা অত্যাচার করছে সত্যি, কিন্তু কিপদের বুককে ফেলে যেতে রাজি নই আমিও।'

'তুমি কি বলো?' প্রশ্নটা গ্যাকোকে করল রানা।

'কথা না বলে এনার্জি বাঁচাচ্ছি আমি। পিনিরকে বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে আগে হোক পরে হোক একজনকে দরকার হবে তো।'

ঝাপসা, দাগ পড়া গলস চোখে তুলল ওরা। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে এক এক করে উঠে দাঁড়াল তিনজন। পাঁচিল ঘুরে যেতে হবে, তাই দক্ষিণ দিকে রওনা হলো।

এর আগে এত বড় পাঁচিলের সামনে পড়েনি ওরা। তবে সাধুনা এই যে নথিক কোর্স ধরতে হলে দক্ষিণ দিকে সরে যেতে হবে ওদেরকে, যাচ্ছেও তাই। ঝড়ের জোহল ওদের গায়ে এসে লাগছে না, তাতে শক্তিও অনেক কম খরচ হচ্ছে। প্রায় চারশো গজ এগোবার পর হঠাৎ করে শেষ হয়ে গেল পাঁচিল, বাতাসের ধাক্কায় আরেকটু হলে উড়েই যাচ্ছিল রানা। তাল সামলে উঠতে পারেনি তখনও, চোঁচিয়ে সাবধান করে দিল ওদেরকে। পিছন থেকে রশি টান টান করল ওরা। এরপর সহজেই শক্ত বরফে সিঁধে হয়ে দাঁড়াতে পারল রানা। বাতাসের দিকে মুখ করল ও, শরীরটা সামনের দিকে ঝুকিয়ে বাতাসের গায়ে ছেঁড়ে দিল নিজেকে—এভাবে এগোনো সহজ, হঠাৎ ছিটকে পড়ার ভয়মন ভয় নেই। ওখু লক্ষ রাখতে হয় বাতাসের গতি হঠাৎ করে কমে যাচ্ছে কিনা।

পরের এক মাইল পেরোতে আধ ঘণ্টারও কম সময় লাগল। আগের চেয়ে অনেক সহজে এগোতে পারছে ওরা। বরফের ঢিবি, কূপ, ফাটল ইত্যাদি এড়াবার জন্যে মাঝে মাঝে ঘুর পথ ধরতে হলো, তা না হলে আরও বেশি এগোতে পারত। ওদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হোঁচট খেলো গ্যাকো। নিজের ওপর এমন রাগ হলো তার, শেষবার আছাড় খেয়ে কিছুক্ষণ আর সে উঠলই না, হামাগুতি দিয়ে অনুসরণ করল ওদেরকে।

সবচেয়ে বেশি ক্লান্ত বোধ করছে রানা। পা দুটো লীলাবত মত ভারী মনে হচ্ছে। আঙুল ঘরে গেছে, প্রতিটি পদক্ষেপের সাথে পায়েক পাতা থেকে উঠে পড়ছে তাঁবু বাঁধা অনুভব করল ও। বামলে হয় না? একটু জিরিয়ে নিলে হয় না? কখনই এ

ধরনের দুর্বলতা জাগল মনে, আজামাত কিরিনের বউ-ছেলে-মেয়ের চেহারা স্মরণ করল ও। সাথে সাথে হাঁটার গতি বেড়ে গেল ওর। আজামাত কিরিন, আমি আসছি ভাই... ততক্ষণ দিকে থাকবি তো?

শেষবার যেটার আড়ালে বিশ্বাস নিয়েছিল ওরা এই পাঁচিলটা তার চেয়েও উঁচু। এখানে এসে মাথা ওজেকে রানা। একটু পরই ঝড়ের দাপট কমে গেল। একে একে ওর সাথে যোগ দিল রুস্তভ, পিনি আর গ্যাকো। লেনিনখানের সাথে যোগাযোগ করে পজিশন চেক করতে বলল রানা। কাজে নেগে গেল পিনি। সবার জন্যে দু'টোক করে দুইখি বরাদ্দ করল রানা। রুস্তভ আর গ্যাকোকে একটু বেশি করে দিল, কারণ ওরা দু'জনেই ক্লান্তির একবারের চরমে পৌঁছে গেছে।

মাইক্রোস্কোপে কথা বলল পিনি। এক-দেড় মিনিট পর পারকার ভেতর থেকে এয়ারফোন বের করে ওয়াকি-টাকি সেট অফ করে দিল। 'হ্যাঁ, আমরা খুব দেখিয়েছি, নম্রতা আমাদের ভাগ্যটাই ভাল, কিংবা হয়তো দুটোই সত্যি। লেনিনখান বলছে, ঠিক যে কোর্সে থাকা উচিত সেই কোর্সে রয়েছি আমরা।' রানার হাত থেকে ফ্রান্সের চাকনাটি নিয়ে চুমুক দিল দুইখিতে। চেহারায় সন্তুষ্টির ছাপ বুটে উঠল। 'এবার দুঃসংবাদ। লেনিনখানের দিকে সরে আসতে শুরু করছে বরফ, তারমানে ছোট হয়ে আসছে পলিনাইয়া। ঘটনাটা বেশ দ্রুত ঘটছে। ক্যাপ্টেন আন্দাজ করছেন ওখানে তিনি বড়জোর আর ঘণ্টা দুই থাকতে পারবেন। খুব বেশি হলো।' একটু থেমে, ধীরে ধীরে রিপোর্ট শেষ করল সে, 'এক আইস মেশিন এখনও কাজ করছে না।'

'আইস মেশিন... ওটা কি সত্যিই...'

শেষ করতে দিল না রানাকে, পিনি বলল, 'হ্যাঁ, সত্যি।' ওটা যে নষ্ট হয়ে গেছে, আপনি তা বিশ্বাস করেননি।'

বিড় বিড় করে গ্যাকো বলল, 'অতি চালাকের গলায় দড়ি বলে একটা কথা আছে, সেটা বোধহয় ফলতে যাচ্ছে, ডাক্তার সাহেব।'

'সব মিলিয়ে সর্বনাশের ঘোলোকল্যা পূর্ণ হতে যাচ্ছে,' ভারী গলায় বলল রুস্তভ। 'বরফ সরে আসছে, কাজেই নিচে নেমে যাবে লেনিনখান। আমরা থাকব ওপরে। তারমানে আমাদের আর লেনিনখানের মাঝখানে থাকবে গোটা পোলার আইস ক্যাপ। আইস মেশিন যদি মেরামতও করা হয়, প্রায় নিশ্চিতভাবে বলা যায়, আমাদেরকে ওরা বুজে পাবে না। এখন, দুঃসাহসী ডাক্তার রানা, তুমিই বলো, কি করব আমরা? আমরা কি এবুনি, এখানেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার জন্যে ওয়ে পড়ব? নাকি আরও ঘণ্টা দুই গোলকধাঘায় ঘুরপাক খেয়ে মৃত্যুর কাছে আত্মনামর্গ করব? রওনা হবার সমস্ত কমান্ডার বলে দিয়েছেন, বরফের ওপর এই অভিযানে তুমি আমাদের লীডার—তুমিই বলো।'

'দু'ঘণ্টা অনেক সময়,' মনু কণ্ঠে বলল রানা। 'শিঁটে বাতাসের ধাক্কা খেয়ে লেনিনখানে পৌঁছতে এক ঘণ্টার বেশি লাগবে না।'

গ্যাকো আর পিনি অগ্নিক সেকেন্ড মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। বিশ্বাসের ঘোর প্রকাশ ব্যক্তিগত উল গ্যাকো, জামতে চাইল, 'কিন্তু নাইটিংহাম ওদের কি হবে?'

'ছেঁটার কোন ক্রটি করা হয়নি। মানুষ কি আর সব কাজে সফল হয়?'

আবার কিছুক্ষণ ঘুম চাওয়া চায় কল ওরা। পিনিন বলল, 'আপনার কথা শুনে আমরা সাংঘাতিক হতাশ হলাম, ডা, রানা। এভাবে পরাজয় মেনে নেবেন, ভাবতেই পারছি না।'

'বোকা, বোকা,' তিব্বতের সুরে বলল রক্ত। 'তোমরা রানার কথা বলতে পারেনি। নিজেকে বান দিয়ে, শুধু আমাদেরকে লেনিনস্কে ফিরে যেতে বলছে ও। সোভিয়েত রিজার্ভ ব্যাংকের সমস্ত সোনার বিনিময়েও ওকে এখন ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।' রক্ত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল সে। 'আর বোধহয় আর মাইলটাক যেতে হবে। চলো, চলো—দেখি করে লাভ নেই।'

পরস্পরের চোখে তাকিয়ে গ্যাকো আর পিনিন মিঃশঙ্গে হাসল। ওদের সবিস্ময় অবস্থাকে আদলে অভিনয় ছাড়া আর কিছু ছিল না। বরাবরই জানত, রানা ঠাট্টা করছে।

রক্ত আর রানার দেখাদেখি ওরাও উঠে দাঁড়াল। আবার রওনা হলো দলটি। এর ঠিক তিন মিনিট পর পিনিন তার পা ভাঙল।

আট

আবার রওনা হয়ে ডানে বা বায়ে গেল না ওরা, নিজেদের কোর্সে ঠিক থাকার জন্যে সিদ্ধান্ত নিল পাঁচিলটা উপকারে। পাঁচিলটা দশ ফিট উঁচু, কিন্তু ঝল করে, পরস্পরকে টানা-হ্যাঁচড়া করে মাথায় উঠে এল চারজনই। সবার আগে রয়েছে রানা, বরফ-ছড়ি নিয়ে অত্যন্ত সাবধানে দেখে নিচ্ছে সামনের অন্ধকার পথটা নিরাপদ কিনা। ঝড়ের দাপট কমেছে, কিন্তু একেবারে থেমে যায়নি। বাতাসে বরফ-কুচি আগের মত নেই, কিন্তু তুমার কণা অনেক বেড়ে গেছে। এই অবস্থায় ফ্র্যাঙ্কলাইট কোন কাজেই লাগল না। ঢালটা অল্প ঢালু, ঝল করে বিশ ফিটের মত নামল রানা। তারপর কিনারা থেকে ছড়িটা নিচের দিকে নামিয়ে দিল।

'পাঁচ ফিট,' ওদেরকে বলল রানা। ঝল করে ওর কাছাকাছি চলে এসেছে তিনজনই। কিনারা থেকে মূপ করে নিচে নেমে পড়ল ও। ওকে অনুসরণ করে, ঠিক পাশে পড়ল রক্ত। পিনিনের কি ঘটল বলা সম্ভব নয়। হয় কিনারা থেকে নিচের দূরত্ব আন্দাজ করতে ভুল হলো তার, নতুনো বরফে পা পিছলে গেল। হঠাৎ আতঙ্কিত বেরিয়ে এল তার গলা থেকে, শব্দটাকে ছিনিয়ে নিয়ে ফেল বাতাস। আওয়াজ শুনে কবল রানা, ওদের পিছনে কোথাও পড়েছে সে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ও। বরফে পা দিয়েই পড়েছে পিনিন, কিন্তু আচমকা চেটিয়ে উঠে দড়াম করে আছড় খেয়েছে শক্ত বরফের ওপর।

বরফ-ঝড়ের দিকে পিছন ফিরল রানা, অকোজো গুলস তুলল কপালে, দ্রুত হাতে ফ্র্যাঙ্কলাইট বের করে জ্বালল। ডান কনুই বরফে রেখে আধ-শোয়া ভঙ্গিতে মাথা উঁচু করে রয়েছে পিনিন, অন্যদল পিনিন-পাচিল করে চলেছে। সো-মাক থাকার উদ্ধারপত্রেরা চাপা ধোনাল, কিন্তু লক্ষ করল রানা, গাল-মন্দের একটা ও পুনরাবৃত্তি

হলো না, বরফের একটা চার ইঞ্চি ফাটলে তার ডান গোড়ালি শক্ত ভাবে আটকে গেছে। ডান পা বাইরের দিকে এমনভাবে বেকে আছে, দেখেই বোকা যায়, পায়ের কোন একটা হাড় না ভাঙলে ওভাবে বেকে থাকা সম্ভব নয়। গোড়ালিটা যে গেছে, তা আর রানাকে বলে দিতে হলো না। মনে মনে আশা করল, হাড়ে বোধহয় শুধু চিড় ধরেছে, ভেঙে গিয়ে সেখিয়ে যায়নি মাংসের ভেতর। তাড়ুক বা মচকে যাক, সর্বনাশের কিছু আর বাকি থাকল না। পরীক্ষা করবে, তাও সম্ভব নয়। এত কম টেম্পারেচারে শরীরের নিচের একটা অংশ বাতাসের ছোয়া পেলে এমনভাবেই বাকি জীবন একটা পা নিয়ে সমুদ্র থাকতে হবে পিনিনকে।

ছুটে গিয়ে ধরা হলো তাকে, অনেক চেষ্টা করে ফাটল থেকে বের করা হলো পা। পিঠ থেকে মেডিকেল কিট নামাল রানা, হাঁটু গেড়ে বসল তার পাশে। 'খুব বেশি ব্যথা করছে?'

'কিছুই অনুভব করছি না—একেবারে অসাড় হয়ে গেছে।' রাগের সাথে বলল পিনিন। 'কি বিচ্ছিন্ন কাণ্ড বলুন তো! ছোট্ট একটা ফাটল, শেষ পর্যন্ত কিনা তার ঘাঁদে ধরা পড়লাম!'

'বললে বিশ্বাস করবে না,' তির্যক সুরে বলল গ্যাকো, 'ঠিক এই ভবিষ্যদ্বাণীই করেছিলাম আমি।' শোকে কাঁতর দেখাল তাকে, ঘন ঘন এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল। 'বলেছিলাম তোমাকে বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে একজন অন্তত দরকার হবে।'

ওরফতর কিপদে পড়ে গেছে ওরা, সেটা ভুলে থাকার ব্যর্থ চেষ্টা করল রানা। পিনিনের আহত পায়ে স্পষ্ট বসাল ও, জুতো আর ফারের ওপর বতাস শক্ত ভাবে সমস্ত টেপ দিয়ে আটকে দিল ওগুলো। ঘটনাটা দু'দুটো অসুবিধের মধ্যে ফেলে দিয়েছে এদেরকে। দলটা যে শুধু সবচেয়ে শক্তিশালী লোকটির সাহায্য থেকে বঞ্চিত হতে যাচ্ছে তাই নয়, সেই সাথে অতিরিক্ত দু'শো চল্লিশ পাউন্ড বোকা চাপছে ওদের ঘাড়। এর সাথে যোগ হবে পিনিনের চল্লিশ পাউন্ড প্যাকেট।

রানার চিন্তাভাবনা পিনিন বোধহয় আন্দাজ করতে পারল। রক্তভের দিকে তাকাল সে, বলল, 'আমাকে এখানে রেখে যেতে হবে, লেফটেন্যান্ট।' ঘটনার আকস্মিকতায় মনে একটা ধাক্কা খেয়েছে সে, তার ওপর ঠাণ্ডা—দু'পাটি দাঁতের সংঘর্ষ ধামছে না। 'নভেলি নিশ্চয়ই কাছেপিঠে কোথাও হবে। ফেরার পথে আমাকে তুলে নিলেই চলবে।'

'মেনা ফ্যাচফ্যাচ কোরো না তো!' খেঁকিয়ে উঠল লেফটেন্যান্ট। 'তুমি খুব ভাল করেই জানো ফেরার পথে তোমাকে আমরা খুঁজে পাব না।'

'ঠিক,' বলল গ্যাকো। দাঁতে দাঁতে বিরোধ তারও তুঙ্গে উঠেছে। হাঁটু গেড়ে বসে পিনিনকে নিজের গায়ে হেলান দেবার সুযোগ করে দিল। 'সোভিয়েত নৌ-বাহিনীতে অর্বাচীনদের পলক দেয়ার নিয়ম নেই।'

'কিন্তু আমাকে যদি বয়ে নিতে হয়,' প্রতিবাদ জানাল পিনিন, 'নভেলিতে তোমরা পৌঁছুতেই পারবে না। শুধু আমার জন্যে—'

'ফের কথা বলে।' ধমকে উঠল লেফটেন্যান্ট।

'পিনিন, তোমাকে আজ একটা সত্যি কথা বলি,' রক্তও থামতেই শুরু করল

গ্যাকো। 'চেহারা দেখে ফাই মনে হোক, তুমি আসলে থিরো টাইপের নও। তোমাকে ফেলে রেখে আমরা বওনা দিলেই ভেউ ভেউ করে কাগা জুড়ে দেবে।'

পিনিনের বোঝা ভাগ করে যার যার কোলার ভরে নিল ওরা। চোখে গলস আর মুখে সো-মাক পবল। তাল পায়ের ওপর দাঁড় করানো হলো পিনিনকে। বাতাসের দিকে মুখ করল ওরা। তারপর এক পা এক পা করে এগোতে শুরু করল আবার।

একান্ত দরকারের সময় ভাগের সহায়তা পেল ওরা। সামনে এই প্রথমবারের মত সমতল, মসৃণ বরফ দেখা গেল। একটা পাঁচিল না, একটা ঢিবি না, একটা গর্ত বা খুদে ফাটল পর্যন্ত না। মসৃণ, কিন্তু পিচ্ছিল নয়। পিনিনের সাহায্য দরকার না হলে এর ওপর দিয়ে ছুটতে পারত ওরা।

পালা করে সামনে থাকছে একজন, বাকি দু'জন নিজেদের মাঝখানে পিনিনকে নিয়ে অনুসরণ করছে তাকে। দু'জনের কাঁধে ভর দিয়ে এক পায়ে এগোচ্ছে পিনিন, চেহারা অতিযোগেব কোন অতিবাক্তি নেই। সমতল বরফের ওপর দিয়ে প্রায় তিনশো গজ এগোবার পর, সামনের লোকটা হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'কি ব্যাপার?' হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ায় রুস্তভের সাথে আরেকটি হলে ব্যাক্স খেত ওরা। একটা রাগের সাথেই প্রকটা করল রানা।

'আমরা পৌছে গেছি।' বাতাসের হাওয়ায়কে ছাপিয়ে উঠল সেকটেনাটের গলা। 'গন্ধ পাচ্ছ না?'

'কিসের গন্ধ?'

'পোড়া হতলের গন্ধ। রাবার পোড়া গন্ধ। পাচ্ছ না?'

'সো-মাক নামান রানা, দু'হাত দিয়ে নাকটাকে ঘিরে নিয়ে সাবধানে শ্বাস টানল। একবারই যথেষ্ট। মাক তুলল ও, কাঁধের ওপর পিনিনের হাত আরও শক্তভাবে টেনে নিয়ে অনুসরণ করল রুস্তভকে।

খানিক পরই সমতল এলাকার শেষ প্রান্তে এসে থামল ওরা। এখান থেকে বেশ উঁচু একটা ঢালের উত্থান শুরু হয়েছে। যাও বা একটা শক্তি আর দম ছিল ওদের, পিনিনকে নিয়ে ঢালের মাথায় উঠতে গিয়ে তাও নিঃশেষ হয়ে গেল। একপর সমতল একটা মালভূমি। এগোবার সাথে সাথে পোড়া গন্ধ বাড়তে লাগল।

পিচ্ছিল পড়ে রানাকে সামনে এগিয়ে যেতে দিল রুস্তভ। ঝড়ের দিকে পিঠ দিল রানা, সবাইকে পিছনে ফেলে দ্রুত এগোল, চোখ তুলে কপালে তুলল গলস। বরফের ওপর ক্যাম্পলাইটের আলো দ্রুত, ঘন ঘন অর্ধবৃত্ত বকনা করল। গল্পটা এখন তাঁর, মাকের ভেতর কঁচকে উঠল রানার নাক। মনে হলো, সোজা সামনের দিক থেকে আসছে ঘুরে বাতাসের দিকে মুখ করে দাঁড়ান ও, সেই সাথে ক্যাম্পলাইটের আলো পড়ল শক্ত, নিরেট, কালচে একটা আকৃতির ওপর। লোহার পাত, বৃষ্টি আর বড়, কিন্তু কেমিক্যাল পাতন একটা কঠোর মত লাগল। কুহক অসুবিধে হলো না, আতন লাগার আগে এতদোই ছিল ঘর।

ট্রিকিট স্টেশন মার্শালকে পাওয়া গেছে।

ওরা কাঁধে না তাসা পর্যন্ত অপর্যাপ্ত জল রানা, তারপর বিছিন্ন পোড়া কাঠামোভলোর পাশ দিয়ে এগিয়ে নিয়ে এল ওদেরকে, সবাইকে বাতাসের দিকে

পিছন ফিরে দাঁড়াতে বলে গলস নামাবার নির্দেশ দিল। ক্যাম্পলাইটের আলোয় ধ্বংসপ্রাপ্ত দেখতে দশ সেকেন্ডের বেশি লাগল না। কেউ কোন কথা বলল না। তারপর আবার ওরা বাতাসের দিকে মুখ ফেরাল।

আটটা আলাদা ঘর নিয়ে স্টেশন। দুটো সমান্তরাল সারি, প্রত্যেক সারিতে চারটে করে ঘর। দুই সারির মাঝখানে ত্রিশ ফিট, দুই ঘরের মাঝখানে বিশ ফিট করে ব্যবধান। আতন যাতে এক ঘর থেকে আরেক ঘরে ছড়িয়ে পড়তে না পারে তার জন্যেই এই ব্যবস্থা। কিন্তু তবু শেষ বক্য হয়নি। সেজন্যে হয়তো কাউকে দোষ দেয়া যাবে না। হয়তো।

ঢাচ্ বিস্ফোরিত হলে কয়েক হাজার গ্যালন তৈলে আতন ধরে যায়, ঝড়ো বাতাসে ভর করে কত দূর ছড়িয়ে পড়তে পারে সেটা তা শুধু রোমহর্ষক আন্দাজের ব্যাপার। কঠিন বাস্তব হলো, আতনকে বাদ দিয়ে মানুষের পক্ষে এই পোলাব আইস ক্যাপে টিকে থাকা সম্ভব নয়। অথচ এই আতনই এখানে তার সবচেয়ে বড় শত্রু। গোটা আইস ক্যাপ জমাট পানি বৈ কিছু নয়, কিন্তু এমন কিছু নেই যা এই শত্রু পানিকে গলাতে পারে। তার পানি গলে না বলে আতনকেও দমানো সম্ভব হয় না। এক যদি আতন নিজে থেকেই নিভে যায়। আচ্ছা, ঘরে ঘরে দৈত্যাকার কেমিক্যাল ফায়ার এক্সটিংগুইশার ছিল, সেগুলোর দশা কি হয়েছে?

আটটা ঘর, প্রত্যেক সারিতে চারটে করে। দুই সারিরই প্রথম দুটো ঘর একেবারে ছাই হয়ে গেছে। দেয়ালের কোন চিহ্নই নেই। ওয়েদার-প্রফ প্রাইয়ের মাঝখানে গ্রাস ফাইবার দিয়ে তৈরি ছিল ওগুলো। ছাদ ছিল অ্যালুমিনিয়াম পাতের, তারও কোন হদিস নেই। একটা ঘরে পুড়ে কালো হয়ে যাওয়া জেনারেটর মেশিনারি দেখল ওরা, বাতাসের দিকে খোলা অংশে বরফের আবরণ। সব এমনভাবে বেকে, গলে, মুচড়ে গেছে, চেনা দায়। কি ধরনের তীব্র ছিল আতনের উদ্ভাদনা, ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠল রানা।

ওই একই অবস্থা ডান সারির তিন নম্বর ঘরের। আতনের তাপে এটার স্কেম অনাভলোর চেয়ে বরং বেশি ভুবে-মুচড়ে গেছে। পিনিনকে মাঝখানে নিয়ে এই ঘরের সামনে থেকে সরে আসতে যাবে ওরা, এই সময় কি যেন বলল গ্যাকো। তাল করে শোনার জন্যে পারকার হুড ওপরে তুলল রানা।

'আলো! চিংকার করে উঠল গ্যাকো। 'ওই ওদিকে!'

গ্যাকোর লম্বা করা হাত অনুসরণ করে তাকাল রানা। পাঁচ নম্বর ঘরের ঠিক উল্টোদিকে একটা ঘর, তার ভেতর সত্যি একটা আলো জ্বলতে দেখা গেল। নর, ওপর-নিচে লম্বা, অস্তুত সাদা একটা আলো। ঝড়ের দিকে পাশ ফিরে পিনিনকে নিয়ে নিয়ে চলল ওরা। ক্যাম্পলাইটের আলোর এই প্রথম শূন্য ইস্পাত কাঠামো ছাড়াও অতিরিক্ত কিছু ধরা পড়ল। একটা ঘর, অস্তুত এখনও ঘর বলে চেনা যায়। পুড়ে কালো হয়ে গেছে, ভুবে-মুচড়ে অবস্থা হয়েছে কেবল, তবু একটা ঘর। একটা মাত্র জানালা, সেটা বন্ধ করা হয়েছে প্রাইভেটের পাত দিয়ে। যেভাবে পেরেক মারা হয়েছে, দেখলেই বোঝা যায় আনাক্রী হাতের কাজ। বাতাসের উল্টোদিকে মুখ করা একটা দরজা, একটামান রোলা, সেই ফাঁক দিয়ে বোরিয়ে আসছে আলো। দরজার পায়ে হাত রাখল রানা। এই প্রথম একটা জিনিষ দেখল

যেটা আঙনে বলসায়নি। মাঝরাতে কবরস্থানের মক্কে বরা গোট কাঁচ কাঁচ করে উঠলে গা যেমন ছমছম করে, দরজার কজার আওয়াজ শুনে সেই কক্ষ গা ছমছম করে উঠল ওর। হাতের চাপে পুরোপুরি ধুলে গেল কবটি, ভেতরের চুল্লি ওরা।

সিলিঙের মাঝখানে ছকের সাথে একটা কোলম্যান ল্যাম্প বুলছে, চকচকে অ্যালুমিনিয়াম সিলিঙে প্রতিফলিত হয়ে আলোর পরিমাণ বেড়ে গেছে। ঘরটা আঠারো ফিট লম্বা, দশ ফিট চওড়া, প্রতিটি কোণ আর বুটিনাটি পরিষ্কার দেখতে পাওয়া গেল। ল্যাম্পের সরাসরি ওপরে তিন ফুট একটা কুণ্ডলে বাদ দিয়ে অ্যালুমিনিয়াম সিলিঙের গায়ে পুরু কিন্তু ট্রান্সপারেন্ট বরফের একটা বর জমেছে। সিলিঙ থেকে প্রাইউডের দেয়াল বেয়ে একেবারে নিচের মেঝে পর্যন্ত নমে এসেছে শুকটা। কাঠের মেঝেও ঢাকা পড়ে আছে বরফে, শুধু বোধহয় নিঃসাড় পাড় থাকা শরীরগুলোর নিচের জায়গা বাদ দিয়ে।

ততশায় ছেয়ে গেল বানার মন। প্রথমেই মনে হলো পৌছতে অনেক দেরি করে ফেলেছে ওরা। জীবনে অনেক লাশ দেখেছে ও, লাশ দেখলেই চিনতে পারার একটা দৃষ্টি অর্জন করেছে। বিনম্রটে ভিজিতে হাত-পা ছড়ানো, একটার ওপর আরেকটার পড়ে থাকা, এলোমেলো কঙ্কল আর ফার দিয়ে খানিক ঢাকা—এই গাদার ভেতর রুৎস্পন্দনের আশা করা নিতান্তই বোকামি হবে। ঘবেব এক ধারে, দরজার কাছ থেকে সবচেয়ে দূরে, গায়ে গা ঠেকিয়ে প্রায় একটা অর্ধবৃত্ত তৈরি করেছে লাশগুলো। প্রেশার ল্যাম্পের একটানা হিস হিস ছাড়া ঘরের ভেতর আর কোন শব্দ নেই।

দেয়াল ঘেঁষে সাবধানে বসানো হলো পিনিংকে। পিঠ থেকে ভারী বোঝাটা নামান গ্যাকো, মোড়ক খুলে বের করল স্টোভ আর ফুয়েল ট্যাবলেট। দরজা বন্ধ করে প্রথমে রাকসাক নামান কস্তভ, তারপর তিনজাত খাবার ভর্তি বোঝাটা ফেলে দিল মেঝেতে। দড়াম করে একটা আওয়াজ হলো, আরেকটু হলো লাকিয়ে উঠেছিল বানা। লাশের গাদা থেকে একটা শরীর প্রায় লাকিয়েই উঠল। বানা। কাছাকাছি, পূর্ব দিকের দেয়াল ঘেঁষা লোকটা প্রথমে নড়েচড়ে উঠল, গড়ান দিল একটা, তারপর উঠে বসে পড়ল। ফুস্ট-বাইটে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে আছে মুখ, বীভৎস ভাবে পুড়ে গেছে। ঘন অম্লো লম্বা দাড়ি কঁকড়ে আছে। চোখ দুটো টকটকে লাল, পলক না ফেলে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল ওদের দিকে। বোধহয় অন্তরের গহনে কোথাও ক্ষীণ একটা আত্মমর্যদাবোধ থেকে থাকবে, বানার বাড়িয়ে দেয়া হাত তাকে অগ্রাহ্য করে নিজের চোঁটাতেই, অনেক কষ্টে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ান সে। ছোট্টো হাসির একটু আভাস ফুটল।

“আপনারা এত দেরি করে এলেন, না এলেও পারতেন” দুর্বল, কর্কশ কণ্ঠস্বর। “আমি কুডিন। রেডিও অপারেটর।”

“হুইজি?” জিজ্ঞেস করল বানা।

কুডিনের ছোট্টো আবার একটু হাসির রেখা দেখা গেল। ছাল ছাড়ানো ছোট্টো জিভের ভগ্না কুণ্ডলে চেঁচা করল সে। মাথা ঝাঁকাল।

এক ব্রদাক হুইজি গিলেই থক থক করে কাশতে শুরু করল কুডিন। কাশতে কাশতে পিঠ বাঁকা হয়ে গেল, পানি বেরিয়ে পড়ল চোখ দিয়ে। কিন্তু আবার বন্ধ

সিঁধে হলো, দেয়াল আর চোখে প্রাণের সজীবতা লক্ষ করা গেল। বুকে পড়ল চেন, পাশে শুয়ে থাকা লোকটার কাঁধ ধরে বলল, “হ্যালো, ভায়া, তোমার আদব-কায়দা সব গেল কোথায়? ওঠো, ওঠো—বাড়িতে মেহমান এসেছে।”

ভায়ায় কুম ভাড়াবার জনো বেশ কয়েকটা নাড়া দিতে হলো, কিন্তু একবার কুম ভাড়ার পর সম্পূর্ণ সজান দেখাল তাকে, কারও সাহায্য না নিয়ে চট করে উঠেও দাঁড়াল। ভায়া একটু বেঁটে, চামচা বুড়ের চোখ, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি গজানো ও চোয়ালের বহু বুঁদ একটা ম্যান হ্যান। গোলগাল চেহারা, হাসি খুশি টাইপ। কিন্তু ফুস্ট-বাইটে মুখের খানিকটা অংশ আর নাকের প্রায় পুরোটা আক্রান্ত। চায়না-বু চোখ জোড়া বিষয়ে একটু বিক্ষুব্ধিত দেখাল। তারপর আত্মবিক্রম আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল চেহারা। বানা বুঝল, এ লোক যে-কোন পরিস্থিতির সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।

“শুধু মেহমান বলে ওদেরকে অপমান কোরো না, কুডিন,” চেহায়ায় যেমন, ভায়ায় পলায় সুরেও কৌতুক লক্ষ্য করা গেল। “বলো প্রিয় মেহমান, বলো বিপদের বন্ধু, তা মেহমানদের পরিচয় ইত্যাদি জেনেছ?”

“আমি ডা. মাসুদ রানা, আর উনি—”

“আমি ডা. জ্যাকভ, ভায়া,” রানাকে বাধা দিয়ে বলল লোকটা।

“ডা. জ্যাকভ?”

“হ্যাঁ, ভায়া! রেসিডেন্ট মেডিকেল অফিসার।”

“ও। ইনি লেফটেন্যান্ট কুস্তভ, সোভিয়েত নৌ-বাহিনীর সাবমেরিন লেনিনগ্রাদে আছেন—”

“সাবমেরিন?” জ্যাকভ আর কুডিন পরস্পরের দিকে তাকাল একবার। তারপর রানার দিকে ফিরল জ্যাকভ। “আমরা শুনেই ভুল করলাম নাকি, ভায়া? সাবমেরিন— তা কি করে হয়?”

“পরে শুনেব। টর্পেডোম্যান গ্যাকো। রেডিওম্যান পিনিং।” গাদা হয়ে থাকা লাশের দিকে তাকাল বানা, তাদের মধ্যে কয়েকজন গলার আওয়াজ পেয়ে এরই মধ্যে নড়তে চড়তে শুরু করেছে। দু’একজন কনুইয়ে ভর দিয়ে মাথা তুলল, তাকাল চোখ পিট পিট করে। “ওদের কি অবস্থা?”

“দু’তিনটে পোড়া কেসের অবস্থা বেশ খারাপ,” বলল জ্যাকভ। “ঠাণ্ডা আর দুর্বলতায় দু’চারজনের অবস্থা অত্যন্ত বিপজ্জনক, কিন্তু বাবারদাবার আস্ত তাপের ব্যবস্থা হলে দিন কয়েকের মধ্যেই আবার চাঙা হয়ে উঠবে তারা। এক জায়গায় ওদেরকে গাদা করে রেখেছি যাতে পরস্পরের গায়েব গরমটুকু থেকে কেউ বঞ্চিত না হয়।”

ওলল বানা। কুডিন আর ডা. জ্যাকভকে নিয়ে বাবোজান। জিজ্ঞেস করল, “আর সবাই কোথায়?”

“আর সবাই?” মুহূর্তের জন্যে বিস্মিত দেখাল কুডিনকে, তারপরই চেহারা হয়ে উঠল নিশ্চিন্ত এবং ভায়া। কাঁধের ওপর বুড়ো আঙুল তুলে পিছন দিকটা দেখাল সে। “ওদিকের ঘরে।”

“কেন?”

‘কেন?’ ক্রান্ত হাত তুলে উল্টোপিঠ দিয়ে লাগ চোখ ঝড়াল কড়িন। ‘যর ভর্তি লাশের সাথে ওতে মন চায়নি, তাই।’

‘কিছু বলতে গিয়েও চুপ করে থাকল রানা, তাকাল পায়ের কাছে পড়ে থাকা লোকটার দিকে। ইতিমধ্যে সাতজনের ঘুম ভেঙে গেছে। তিনজন কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে মাথা উঁচু করে আছে, বাকি চারজন এখনও শুয়ে। সাতজনের চেহারাতেই বিমূঢ়, বিব্বল একটা তার কম বেশি লক্ষ্য করা গেল। তিনজন এখনও ঘুমিয়ে বা অজান হয়ে আছে, মুখগুলো কবলে ঢাকা। মৃদু পল্লব বলল রানা, ‘আপনারা এখানে উনিশজন ছিলেন।’

‘উনিশজন—হ্যাঁ,’ শোকের ছায়া পড়ল কড়িনের চেহারা, একটা দীর্ঘশ্বাসের সাথে বেরিয়ে এল কথাগুলো। ‘ওদের কপাল মন্দ! কোন সুযোগই পায়নি ওরা।’

‘কিছু বলল না রানা। একে একে ঘুম ভাঙা সাতজনের দিকে আবার তাকাল ও। এবার সন্ধানী, তাঁঙ্গ দৃষ্টিতে। পরিচিত একটা মুখ খুঁজল। মনে আশা, এদের মধ্যেই আছে সেই লোক, কিন্তু আঙনে পুড়ে আর ফুট-বাইটে ক্ষতবিক্ষত হয়ে আছে বলে এতক্ষণ চিনতে পারেনি। এক একটা মুখের ওপর বিশ-পঁচিশ সেকেন্ড ধরে তাকিয়ে থাকল ও। বুঝল, এদের মধ্যে নেই সে।

এখনও ঘুমিয়ে আছে যারা তাদের প্রথমজনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। কঙ্গল সরিয়ে মুখ খুলল। অচেনা লোক। হাত থেকে কঙ্গলটা ছেড়ে দিল ও।

অবাক সুরে জানতে চাইল ডা. জ্যাকভ, ‘কি ব্যাপার? কি চান আপনি?’

জবাব দিল না রানা। আহত, অনুভূ, পড়ে থাকা লোকগুলোর মাক্খান নিয়ে পথ করে নিল ও। আরেকটা কঙ্গল তুলে আরেকজন ঘুমন্ত লোককে দেখল। এবারও হাত থেকে কঙ্গলটা ছেড়ে দিল ও। অনুভব করল, মুখের ভিতরটা ওকিয়ে গেছে। বুকের ভিতর ঘন ঘন তড়পাতে হৃৎপিণ্ড। কারও দিকে না তাকিয়ে তিন নম্বর ঘুমন্ত লোকের সামনে এসে দাঁড়াল ও। কঙ্গল তুলে মুখ খুলতে হবে, কিন্তু বিধা আর ভীতি বাড়ী দশ সেকেন্ড অচল করে রাখল ওকে। বুকের ধড়ফড় ভাবটা বেড়ে গেল। হঠাৎ বুকে প্রায় ছোঁ নিয়ে লোকটার মুখ থেকে কঙ্গল তুলে নিল ও।

লোকটার মুখে ব্যাভেজ। পাতলা সোনালী খানিক লাড়ি আছে, নাকটা ভাঙা। একে জীবনে কখনও দেখেনি ও, ধীরেসুস্থে কঙ্গল দিয়ে মুখটা ঢেকে নিধে হলো। দেখল, ইতিমধ্যে সলিড-কুয়েল স্কোভটা চালু করে দিয়েছে গ্যাকো।

‘এবার ফিজিক্স পয়েন্টের কাছাকাছি এসে যাবে টেম্পারেচার,’ ডা. জ্যাকভকে বলল রানা। ‘প্রচুর ফুয়েল আছে আমাদের। খাবার, আলকোহল আর কমপ্লিট একটা মের্ডিকেল কিটও নিয়ে এনেছি। কড়িনকে নিয়ে আপনি যদি ওগুলো কাজে লাগাতে চান, এক মিনিট পর আমিও আপনারদের সাথে হাত লাগাব। লৈকটেন্যান্ট, ওটা একটা পলিনাইয়া ছিল, তাই না? এখানে পৌঁছবার ঠিক আগে সমতল, মসৃণ যে জায়গাটা পেরিয়ে এলাম? ওপরের ওই বরফ আনলে পানির ওপর পাতলা আবরণ, স্কি?’

চেহারাটা বিষম আর কৌতূহল নিয়ে কয়েক সেকেন্ড রানার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল কড়িন। ‘ঠিক—আর কিছু হতে পারে না। পাচশো গজ হটাৎই ক্ষমতা নেই এদের, পাঁচ মাইল হেটে লেনিনগ্রাদে যাবার প্রয়াস ওটা না। তাহাড়া,

কমান্ডার জানিয়েছেন, বরফ সবে আসছে, লেনিনগ্রাদকে নিয়ে নেনে যেতে হবে। কাজেই আমরা তাহলে লেনিনগ্রাদকে ডেকে বলি খিড়কী দরজা দিয়ে এখানে চলে আসুক?’

‘আইস মেশিনের সাহায্য ছাড়া আমাদের এই পলিনাইয়া খুঁজে পাবে ওরা?’
‘এর চেয়ে সহজ আর কিছু হতে পারে না। পিনিনের রেডিও নিয়ে উত্তর দিকে ঠিক দু’শো গজ এগোব, ওখান থেকে একটা রেয়ারিং সিগন্যাল পাঠিয়ে দক্ষিণ দিকে আবার ঠিক দু’শো গজ যাব, এবং রেয়ারিং সিগন্যাল পাঠাব। এ থেকেই আমাদের রেজ পেরে যাবে ওরা। তা থেকে দু’শো গজ বাদ দিন, লেনিনগ্রাদ আমাদের পলিনাইয়ার মাক্খানে পৌঁছে যাবে।’

‘কিন্তু তখনও পলিনাইয়ার নিচে, ওপরে নয়। বরফ ওখানে কতটা পুরু জানতে পারলে হত। ডা. জ্যাকভ, কিছুদিন আগে পর্যন্ত আপনারদের এই ক্যাম্পের পশ্চিমে মুখ খোলা একটা পলিনাইয়া ছিল—বলতে পারেন ক’দিন আগে?’

‘একমাস। কিংবা পাঁচ সপ্তাহ। ঠিক বলতে পারব না।’

কড়িনকে জিজ্ঞেস করল রানা, ‘কত পুরু?’

‘পাঁচ ফিট, হয়তো ছয় ফিট,’ এদিক ওদিক মাথা নাড়ল কড়িন। ওটা ভেঙে মাথাচাড়া দেবে লেনিনগ্রাদ, আশা করা যায় না। কিন্তু টপেজো দিয়ে বরফে ওতো মারার নতুন একটা ঝোক চেপেছে আমাদের ক্যাপ্টেনের—কিছুই বলা যায় না। পিনিনের দিকে ফিরল সে। ‘রেডিও অপারেট করতে পারবে বলে মনে করো?’

ব্যাপারটা ওদের ঘাড় ছেড়ে দিল রানা। ওদেরকে কি বলছিল না বলাছিল সে-ব্যাপারে ভেতন সচেতন হতে পারেনি ও। অনুভূ, বরফ আর সাংঘাতিক ক্রান্ত লাগল নিজেকে। যে প্রশ্ন নিয়ে এখানে আসা, তার উত্তর পেয়ে গেছে ও। এই উত্তর পাবার জন্যে বারো হাজার মাইল ছুটে আসতে হয়েছে ওকে। ঠিক এই উত্তরটা না পাবার জন্যে নিজের সারা-জীবনের সময় বা নিজের প্রাণের ওপর অসম্ভব সব ঝুঁকি নিতেও মানসিক ভাবে তৈরি ছিল ও। কিন্তু যা ঘটে গেছে তা বদলার সাধা ওর নেই, কারও নেই। আজামাত কিরিমের স্ত্রী ওর মুখ চেয়ে বসে আছে মস্তোয়, তার স্বামী বেঁচে আছে কিনা জানতে চায়। ফিরে গিয়ে কি সাফুনা দেবে তাকে? বলবে, তোমার স্বামীকে তুমি আর কোনদিন দেখতে পাবে না? ঘুরিয়ে বা আভানে বজালেও ঠিক এই সূখাটাই বলতে হবে। আজামাত কিরিমের ব্যাচারা ওকে হয়তো জিজ্ঞেস করবে, ‘কাকু, আশা কোথায়?’ উত্তর দেবার কিছু থাকবে না। আজামাত কিরিম মারা গেছে, ওরা কেউ আর তাকে দেখতে পাবে না। ওধু ও ছাড়া। এখন তাকে দেখার জন্যেই যাচ্ছে ও। নিজের চোখে দেখতে চায়।

ঘর থেকে বেরিয়ে পিছনের দরজা বন্ধ করে দিল রানা। ঘরের কোণ ঘুরল, সেই সাথে অড়ের মুখোমুখি হাতই মাথা নিচু করল। দশ সেকেন্ড পর সারির শেল ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল ও। দরজার হাতল কোথায় দেখার জন্যে ফ্ল্যাশলাইট জ্বালল। ঘোরাল স্কোটা, চাপ দিয়ে কবচ খুলল। এক সেকেন্ড ইতস্তত করল, তারপর চোকাঠ পেরিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

এক সময় এটা একটা ল্যাবরেটরি ছিল। এখন এটাকে লাশের ঘর বনলেই বোধহয় ভাল মানায়। ল্যাবরেটরির সমস্ত সরঞ্জাম তৈরি এক পাশে সরিয়ে কাঁকা

একটা জায়গা বের করা হয়েছে, সেটা ভরা হয়েছে নিহত লোকগুলোর লাশ দিয়ে। ওরা মাঝে গেছে জার্মে ও, কিন্তু ওধু কতদিন বলেছে বলে জানে। বীড়ন ভাবে পুড়ে গেছে এক একটা লাশ। গায়ের রঙ, চেহারা, আকার এবং আকৃতি, সব কানচে, বিকৃত, ফোলা-ফোপা আর বোঁচপ হয়ে গেছে। এতকণ দম আটকে রেখেছিল বলে পোড়া মাংস আর পোড়া ডিজেল ফুয়েলের উৎকট দুর্গন্ধ পায়নি রানা। নাকে সামান্য একটু গন্ধ ঢুকতেই বমি পেল ওর। বন্ধু আর সহকর্মীদের দক্ষ, বলসানো লাশ বয়ে নিয়ে এসে এখানে এই ঘরে যারা রেখেছে তাদের শত্রু মনের কথা ভেবে অবাক হলো ও। সাংঘাতিক অপ্রীতিকর একটা কাজ, কিন্তু তবু তারা কাজটা করতে পিছু-পা হয়নি।

মৃত্যু নিশ্চয়ই খুব তাড়াতাড়ি ঘটে গেছে। এ তো আর আতনে আটকা পড়া লোকের মৃত্যু নয়, এ মৃত্যু গায়ে আতন লাগা লোকের মৃত্যু। জলন্ত তেলের সাগর আচমকা লাকিয়ে পড়ে জাপটে ধরেছিল ওদেরকে। বেঁচে থাকার শেষ কয়েক মুহূর্ত নিশ্চয়ই ওরা রক্ত-মাংসের মশালের মত দাউ দাউ জ্বলেছে। এর চেয়ে উত্তর, মর্মান্তিক মৃত্যু মানুষের আর হতে পারে না।

একটা লাশের ওপর পড়ে আছে দুটো লাশ। নিচের লাশটা প্রায় ঢাকা পড়ে আছে, শুধু বা হাতটা ছাড়া। বুকে ফ্যাশনাইটের আলো ফেঁকল রানা। একটু ফেনে অবাকই হলো ও। প্রায় অক্ষত, একটা হাত, মারাত্মক ভাবে পোড়েনি। মাথার খালের আড়ালে অদ্ভুত আকৃতির একটা আঙুটি রয়েছে, দেখেই হার্টবিট বেড়ে গেল রানার। এমনই ছিল আগুনের প্রচণ্ডতা, আঙুটিটা দুমড়ে গেছে, গলেনি। দেখেই চিনেছে ও। আজামাত কিরিমের স্ত্রীকে ও-ই উপহার দিয়েছিল ওটা। স্ত্রী পরিণয়ে দিয়েছিল আমীর হাতে।

ওপরের লাশ দুটো সরাল রানা। উৎকট দুর্গন্ধে মাথার মগজ পর্যন্ত ওলিয়ে উঠতে চাইল। আজামাত কিরিমের সারা পায়ে ক্ষত, কিন্তু বুক মাথা আর মুখ প্রায় অক্ষত মেনে কেন যেন অদ্ভুত অবাক একটা আশায় ওর বুকের ভেতরটা হঠাৎ খড়াশ খড়াশ করতে লাগল। কিরিমের কপালে হাত দিতে যা দোরি, সারা শরীরে পুলকের একটা ঢেউ বয়ে গেল রানার। পালস দেখল রানা। বেঁচে আছে বলে মনে হয় না—কিন্তু আছে। অনুভব করা যায় কি যায় না, তবু আছে।

সিধে হয়ে লড়াতে যাবে রানা, এই সময় আরও একটা ক্ষত চোখে পড়ল। অনেকক্ষণ বুকে থেকে পরীক্ষা করল ও। মুণ্ডের চেহারা গভীর, নিষ্কর হয়ে উঠল। ধীরে ধীরে সিধে হলো ও। ঠিক এই সময় শব্দ ওর পিছনে। খুলে গেল দরজাটা।

চরকির মত অম্লপাক ঘুরল রানা। সেকফটেনাউট রক্তভ। স্নো-মাস্ক নামিয়ে কপালে গাঙ্গল তুলল সে। প্রথমে রানার দিকে, তারপর ওর পায়ের নামনে পড়ে থাকা আজামাত কিরিমের দিকে তাকাল। তার চেহারা থেকে লাগতে রঙ মিলিয়ে যেতে দেখল রানা। মুখ তুলে আবার সে রানার দিকে তাকাল। 'তুমি তাহলে হোরাই গেল, আকাল?' একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে রানা রক্তভ। 'দুর্ভাগ্য, সাময়িক দুর্ভাগ্য'।

মাঠে?

আজামাত কিরিম মাঝে গেছে, এটা তোমার জন্যে একটা মাত্র ক্ষতি। কারল,

ও ছিল তোমার অকৃত্রিম বন্ধু, ওর কাছে তুমি ঋণী ছিলে। কিন্তু এর জন্যে নিজেকে তুমি—'

এসব কে বলেছে তোমাকে? কমান্ডার রাইকভ?

হ্যাঁ। আমরা রওনা হবার ঠিক আগে। সেজন্যেই আমরা এসেছি।' খুব সাবধানে আর ভয়ে ভয়ে ঘরের চারদিকে একবার দৃষ্টি বুলাল সে, সূত্রে লোকটাকে চোখের পলকে অনুভব দেখাল। 'এক মিনিট, রানা!' কথাটা বলে একনকম ছুটেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে।

আবার যখন ফিরে এল, আগের চেয়ে ভাল হলোও পুরোপুরি সূত্রে দেখাল না তাকে। 'বন্ধুর জন্যে নিজের প্রাণের ওপর ঝুঁকি নিতে চাও, একথা বুঝতে পেরেই তোমাকে আসতে দিয়েছেন কমান্ডার।'

আর কে জানে?

কমান্ডার আর আমি ছাড়া আর কেউ না।'

আর কাউকে না জানালে আমার উপকার করা হবে। অনুমোদনা রাখবে? 'তুমি যখন বলছ—' কাঁধ ঝাকাল রক্তভ। চোখে একটু কৌতূহল ফুটলেও এখনও সে আতঙ্কিত বিহবল হয়ে আছে। 'কি ভয়ঙ্কর! এককম দৃশ্য কাউকে যেন দেখতে না হয়!'

'এখানে থেকে লাভ নেই,' ক্রান্ত সুরে বলল রানা। 'চলো, ওদের কাছে ফিরে যাই।'

কথা না বলে মাথা ঝাকাল রক্তভ। প্রথম ঘরে ফিরে এল ওরা। ডা, জ্যাকভ আর রক্তভ ছাড়াও তিনজন লোক নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়েছে। ক্যাপ্টেন কুমারভ, অস্ত্রাভাবিক লম্বা, রোগা এক লোক। তার মুখ আর হাত পুড়ে গেছে। ক্যাম্পের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড সে। এঞ্জিনিয়ার এবং ট্রাঙ্কর ড্রাইভার অ্যালেক্সি মিকো, এর ওপর ডিজেল জেনারেটরের দায়িত্ব ছিল। আনাথোলি অভয় লোকটা হানিখুশি টাইপের, ক্যাম্পের কুক সে। ওয়ে থাকা একজন লোকের হাতে ব্যাডজ বাধছিল ডা, জ্যাকভ, সে-ই রানার সাথে ওদের পরিচয় করিয়ে দিল। কথা শেষ করে নিজের কাজে বাস্তব হয়ে পড়ল সে, দেখেও রানার মনে হলো, জ্যাকভকে সাহায্য করার দরকার নেই, একাই পারবে সে। আড়ালে ডেকে গ্যাকোর সাথে নিচু গলায় কিছু কথা বলল রানা। গ্যাকোর চোখ জোড়া মুহূর্তের জন্যে বিশ্বাসে বিস্ফারিত হয়ে উঠলেও প্রায় সাথে সাথেই নিজেকে সাময়িক করে ফেলল সে। রানার অনুমোদনের উত্তরে ছোট্ট করে একবার শুধু মাথা ঝাকাল।

'কি, লেনিনগাদের সাথে বোঁগাযোগ হলো?' পিনিনকে জিজ্ঞেস করল রক্তভ।

'না... মানে, না।' বল সাইন পিনিনো বন্ধ করে আঁহন পা একটু হেঁটুচেড়ে সুবিধে মত জায়গায় সরিয়ে নিয়ে এল পিনিন। 'কথাটা কিভাবে বলব আপনাকে, ঠিক বুঝতে পারছি না।' হাতের রেডিও সেটটার গায়ে একটা চৌকা দিল সে। 'এর বোম্বটন একটা ফিউজ নষ্ট হয়ে গেছে।'

'বুঝ চালাক তুমি,' ভারী গলায় বলল লেফটেন্যান্ট। 'কথার মারপ্যাচ দিয়ে কি বোঝাতে চাও, তুমিই জানো। ওদের সাড়া পাচ্ছ না, একথা বলতে চাইছ?'

‘ওরা আমার লাড়া পাচ্ছে না, কিন্তু আমি ওদের লাড়া পাচ্ছি।’ কমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাকান পিনিন। ‘দোষটা বোধহয় আমার, কিংবা আমার পায়ের। ফাটলে পা অটিকে যাওয়ায় পড়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু আমি ওধু একাই পড়িনি।’

‘ই। তা ঘোড়ার ডিম জিনিসটাতে তুমি মেরামত করতে পারো না?’

‘মনে হয়, পারি না, লেফটেন্যান্ট।’

‘কি আশ্রয়? তুমি না একজন রেডিওমান?’

‘হাতে কোন তুল নেই, মেনে নিল পিনিন। ‘কিন্তু আমি ম্যাজিশিয়ানও হো নই! ঠাণ্ডায় অসাড় এক জোড়া হাত, প্রয়োজনীয় টুলস নেই, এটা এত পুরানো একটা সেট যে প্রিটেড লাইটিং নেই, তার ওপর কোড সাইনওলা জাপানী ভাষায় লেখা—‘আমি মনে করি, এই অবস্থায় মার্কোনিও হার মানত।’

‘তবু জেদের সুরে জানতে চাইল কুস্তভ, ‘ওটা কি মেরামত করা সম্ভব?’

‘এটা ট্রান্সমিটার সেট। ভালই নেই যে ভেঙে গেছে। হ্যাঁ, মেরামত করা হয়তো একেবারে অসম্ভব নয়। কিন্তু তাতে হয়তো কয়েক ঘণ্টা লেগে যাবে, লেফটেন্যান্ট। তার আগে অবশ্যই এক সেট টুলস পেতে হবে আমাদের।’

‘পেতে হবে, পাও! যা খুশি চাও এবং পাও! ওধু যেভাবে হোক আবার চালু করো ওটাকে।’

‘আর কোন কথাই বলল না পিনিন, ওধু হেডফোন জোড়া বাড়িয়ে ধরল কুস্তভের দিকে। কুস্তভ কটমট করে তাকাল পিনিনের দিকে, তারপর দৃষ্টি ফেরাল ফোনে। সে-ও কোন কথা না বলে নিল সেটা, এক কানে ঠেকিয়ে কিছু ওনল। বলল, ‘ভম।’ তাহলে তো দেখেছি রেডিও মেরামত করার জন্যে ব্যস্ত হবার কোন দরকার নেই।’

‘জী, সর্বিনয় ভঙ্গিতে বলল পিনিন। ‘এই পরিস্থিতিতে আমরা সন্তোময় বলে আখ্যায়িত করতে পারি, কি বলেন, লেফটেন্যান্ট?’

‘সঙ্কট? কিসের সঙ্কট?’ স্তম্ভ জানতে চাইল রানা।

‘নাভেলিকে উদ্ধার করতে এসে আমরা নিজেরাই ফেঁসে গেছি বলে মনে হচ্ছে,’ ভারী গলায় বলল লেফটেন্যান্ট। ‘আমরা কিভাবে উদ্ধার পাব সেটা একটা চিন্তার বিষয় হতে যাচ্ছে। লেনিনগ্রাদ থেকে ওরা বারবার একটা মেসেজ খিপিট করছে—‘স্বত সবে আসছে বরফ, এখুনি কিরে এসো।’

‘সেই একেবারে প্রথম থেকে এই পাগলামির বিরোধিতা করে এসেছি আমি,’ অভিযোগের সুরে কথাটা বলল গ্যাকো, ‘কিন্তু তার চেহায়ায় দৃষ্টিভ্রা, রূপ বা অসন্তোষের কোন ছাপ দেখা গেল না। টিন কুলে খাবার বের করে দৌড়ে গরম করতে দিচ্ছিল। এরই মধ্যে গলতে শুরু করেছে সুপ, একটা ফর্ক দিয়ে নাড়ছে সেটা। হ্যাঁ, এই অভিযানে বেরিয়ে আমরা মহত্বের পবিত্র নিয়মটি বাটো, কিন্তু এতে যে আমরা ব্যর্থ হব প্রথম থেকেই তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ ছিল না।’

‘সুপ থেকে তোমার এই নোংরা আত্মা তোলা!’ কড়া নির্দেশের সুরে বলল কুস্তভ। ‘শুকটাকেও সেরাই করে রাখো।’ হঠাৎ করে কুস্তভের দিকে ফিঙ্কল সে। ‘আপনার রেডিও সেট? এই তো, সমাধান পাওয়া গেছে। লোকজনের অভাব নেই, তারা আপনার হাতে-ঘোরাণো জেনারেলের চালাতে পারবে—’

‘দুঃখিত,’ ভৌতিক একটা হাসি দেখা গেল কুস্তভের ঠাটে। ‘আমাদের এটা হাতে ঘোরাণো জেনারেলের নয়, সেটা আঙনে পুড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। আমরা বল সাইন প্রচার করার সময় একটা ব্যাটারী সেট ব্যবহার করেছি। ব্যাটারি শেষ। একেবারে শেষ।’

‘কি বললেন? ব্যাটারি সেট?’ একটা অবাক দেখাল পিনিনকে। ‘তাহলে আপনি যখন ট্রান্সমিট করছিলেন, যখন যখন পাওয়ার ফ্লুকচুয়েশন ঘটছিল কেন?’

‘পাওয়ার বেশি পাবার জন্যে নিকেল ক্যাডমিয়াম ব্যাটারী ছিলাম, তাই। মাত্র গোটা পনেরো ছিল, বাকি সব আঙনে পুড়েছে। মুশকিল হলো, এমনকি লাইফ সেলও চিরকাল টেকে না। ওতনো খতম হয়ে গেছে, কমরেড! সব মিলিয়ে ওতনোয় যা পাড়ি আছে তা দিয়ে একটা পেপিল টর্চও জ্বলবে না।’

পিনিন কিছু বলল না। কেউই কিছু বলল না। ঘরের পুর দেয়ালে ঝড়ের সাথে ছুটে এসে লক্ষ কোটি বর্ষীয় মৃত আঘাত করছে বরফ কুচি। হিস-হিস করছে কোলম্যান, শৌ-শৌ করছে সলিড ফুয়েল স্টোভ, কিন্তু এসব শব্দ যেন ঘরের নিস্তব্ধতাকে আরও গভীর আর অগত করে তুলল। কেউ তার পাশের লোকটার দিকে তাকাল না। সবাই মাথা নিচু করে আছে, যেন শোকসভায় বসে কারও আত্মার মঙ্গল কামনায় নীরবতা পালন করছে। এদেরকে দেখে বোঝার উপায় নেই নভেলির লোকজনকে নির্ধৃত, অবধারিত মৃত্যুর কবল থেকে এইমাত্র মিনিট দশেক আগে উদ্ধার করা হয়েছে।

‘স্টুট নিস্তব্ধতা যখন অসহ্য হয়ে উঠল, কুস্তভকে বলল রানা, ‘এর সমাধান কি তা জানার জন্যে ইলেকট্রনিক কম্পিউটার লাড়া করতে হবে না। অস্ত্রত একজনকে লেনিনগ্রাদে ফিরে যেতে হবে, এবং কোন রকম দেরি না করেই। আমি নিজের নামে প্রস্তাব রাখছি।’

‘অসম্ভব! প্রায় ঘেঁটে করে উঠল লেফটেন্যান্ট, তারপর একটা শাস্ত হয়ে বলল, ‘দুঃখিত, রানা। কিন্তু কমান্ডার কাউকে আত্মহত্যা করার অনুমতি দেননি। এই ক্যাম্প ছেড়ে কোথাও তুমি যাচ্ছ না।’

‘বেশ, কোথাও আমি যাচ্ছি না,’ মেনে নেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাকান রানা। ওর বেলায় কোন কিছুর জন্যেই কারও অনুমতির দরকার করে না, এই কথাটা কুস্তভকে স্মরণ করিয়ে দিতে গিয়েও ফাস্ত হলো ও—বিতর্কে যাবার সময় এটা নয়। সময় নয় আগেরাঙ্গ বের করারও। ‘আমরা কেউই কোথাও যাচ্ছি না। কাজেই, এসো, সবাই দল বেঁধে মারা যাই। সেটা বেশ মজাই হবে। মারামারি না, চোঁচামেচি না, ওধু ওয়ে পড়ে ঠাঙ্গ হয়ে যাওয়া। দুঃখের বিষয় ওধু একটাই, খবরের কাগজে এ-ধরনের মৃত্যুকে কাপুরুষের মৃত্যু বলে প্রচার করার একটা বাজে প্রবণতা আছে। অবশ্য কদনামটা তোমাদের হবে না, হবে গ্রুপ লীডারের—আমার। তবু তোমরা যখন বলছ, বদনাম হয় হোক, তোমাদের নামে মরে গিয়ে এসো লাঠা চুকিয়ে ফেলি।’

‘কোথাও যাবার মত ফিটনেস আমাদের কারও নেই,’ সম্পূর্ণ শাস্ত সুরে বলল লেফটেন্যান্ট। ‘আরেকটা ব্যাপার, ট্রান্সমিটার লাড়া আমরা আবার লেনিনগ্রাদকে বুজে প্যাবার আশা করতে পারি না। তাছাড়া, হয়তো অধেক রাত্রী পেরোবার

আগেই লেনিনবাদ পলিনাইয়ার নিচে নেমে যেতে বাধ্য হবে। আরও আছে—লেনিনবাদকে না পেয়ে আমাদের যদি ফিরতি পথ ধরতে হয়, ফিরব কিভাবে? পথের হিনস দেবে কে? জানা কথা, নভেলিকে খুঁজে পাওয়াও আর সম্ভব হবে না।

‘আইস মেশিন মেরামত হয়েছে কিনা আন্দাজ করতে পারো?’

কিছু না বলে এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল রানা। সুপাটা আবার নাড়তে শুরু করেছে গ্যাকো, মুখ তুলে কারও দিকে না তাকাবার ব্যাপারে খুব সারধান। কিন্তু দেয়াল থেকে পিঠ তুলে ক্যাপ্টেন কুমারভ ওদের দিকে এগিয়ে আসছে দেখে সবার সাথে সেও মুখ তুলে তাকাল।

একটু টলমল করে এগোল কুমারভ, দু’পা এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। হার শারীরিক অবস্থা যে খারাপ, ডাক্তার না হলেও সেটা বলে দেয়া যায়।

‘আমরা ঠিক বুঝছি না,’ পোড়া চোখের ফোক দিয়ে বেরিয়ে আসা শব্দগুলো শিগুর আধো আধো বোলার মত শোনা। ‘সমস্যাটা কি?’

‘এই,’ বলল রানা। ‘লেনিনবাদে একটা আইস ফ্যাদেমিটার আছে, মাথার ওপর বরফ থাকলে সেটা কত পুরু তা বলে দেয়। স্বাভাবিক অবস্থায়, সাবমেরিনের ক্যাপ্টেন রাইকত যদি আমাদের সাড়া নাও পান, ফটা কয়েকের মধ্যে তিনি আমাদের দোর-পোড়ায় পৌঁছে যাবেন বলে আশা করতে পারি আমরা। ড্রিফট স্টেশনের পজিশন মোটামুটি জানা আছে তার। পলিনাইয়া থেকে নেমে আমাদের নিচে চলে আসতে হবে তাকে, আইস ফ্যাদেমিটারের সাহায্যে খুঁজে বের করতে হবে এখানকার পলিনাইয়ার কোনখানটায় বরফ সবচেয়ে বেশি পাতলা। কিন্তু মুশকিল হলো, পরিস্থিতি স্বাভাবিক নয়। আইস মেশিন নষ্ট হয়ে গেছে। ওটা মেরামত করা না গেলে এখানকার পলিনাইয়া খুঁজে পাবেন না তিনি। সেজন্যে ফেরত যেতে চাইছি আমি। এখুনি। লেনিনবাদ ওখানকার পলিনাইয়া থেকে নিচে ডুব দেবার আগেই।’

‘আমি কিন্তু ভায়া লাভটা দেখতে পাচ্ছি না,’ বলল ডা. জ্যাকভ। ‘আপনি কি আইস মেশিন মেরামত করতে পারবেন?’

‘দরকার হবে না। লেনিনবাদ আর নভেলির মাঝখানে দু’রকম কতটুকু জানা আছে ক্যাপ্টেনের, একশো গজ কম-বেশি হতে পারে। তাকে ওধু আমার বলতে হবে, দু’রকমটা আধ মাইল কম পেরিয়ে একটা টর্পেডো ফুঁড়ুন। তাতে করে—’

‘টর্পেডো?’ জিজ্ঞেস করল ডা. জ্যাকভ। ‘কি বললেন, টর্পেডো? নিচে থেকে ভেঙে বরফ ফুটো করার জন্য?’

‘তাই। এর আগে চেষ্টা করা হয়নি। তবে বরফ যথেষ্ট পাতলা হলে কাজ না হবার কারণ তো আমি দেখি না। কিন্তু জোর করে কিছু বলাও যায় না।’

‘ওরা ভ্রম পাঠাবে, ডা. রানা,’ পাউডারে বলল পিনিন। ‘আমাদের মেসেজ শেষে এখন সবাই জানে নভেলিকে পাওয়া গেছে। অসুস্থ নভেলি ঠিক কোথায় তা জানে। ফটা কয়েকের মধ্যে প্রকাণ্ড বন্দরগুলো এসে যাবে এখানে।’

‘এসে কি করবে? অন্ধকারে মাথার ওপর চকুর দেয়া ছাড়া আর কি করার থাকবে? নভেলির পজিশন যদি জানাও থাকে, নভেলির কি অবস্থা দেখতে পারবে না

ওরা। রাজারের সাহায্যে কিছু যদি দেখতেও পায়, তাহলেই বা কি? সাপ্লাই ফেলবে?’ এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল রানা। ‘সম্ভব নয়। আমরা যারা পড়ব এই ভয়ে সাপ্লাই ত্রুপ করবে না ওরা যদি করে, অনেক দূরে করবে। এবং আমাদের জন্যে সিকি মাইল যা, একশো মাইলও তাই—পৌঁছানো সম্ভব নয়। আর ভাল আবহাওয়াতেও বড় কোন প্লেন আইস ক্যাপে লাভ করতে পারবে না। ছোট প্লেনের তো এত দূরে আসার বেজায় নেই।’

‘আপনার আসল নাম, ডা. রানা?’ জানতে চাইল পিনিন। ‘হত্যা?’

‘এদিকে আমরা হাত-পা ওড়িয়ে বসে থাকব, ওদিকে আইস মেশিনও মেরামত হবে না—ফলাফল আমাদের মোলোজিনের মতো। কিন্তু আমি যদি নিরাপদে পৌঁছুতে পারি, আমরা সবাই বাঁচব। আর আমি যদি পৌঁছুতে নাও পারি, হয়তো আইস মেশিন মেরামত করা সম্ভব হবে, সে ক্ষেত্রে মাত্র একজন লোককে হারাতে হচ্ছে।’ হাতে দস্তানা পরতে শুরু করল রানা।

‘চলো তাহলে আমিও যাই,’ দস্তানা পরতে শুরু করে বলল রুস্তভ।

একটুও অবাক হলো না রানা। জানে, রুস্তভের মত লোকেরা সঙ্গীদের বিপদের মুখে তেলে দিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে মুখ লুকাতে অভ্যস্ত নয়।

ক্যাপ্টেন কুমারভ এবং ডা. জ্যাকভের মদু প্রতিবাদ গ্রাহ্য না করে তৈরি হয়ে গেল ওরা। ঘর থেকে প্রথম বেরুল লেফটেন্যান্ট রুস্তভ। দরজার কাছে পৌঁছে থামল রানা, মাড় ফিরিয়ে তাকাল ঘরের ভেতর। একে একে তাকাল নভেলির লোকগুলো দিকে। কুমারভ, ডা. জ্যাকভ, রুডিন, মিকো, অভয় এবং আরও সাতজন। বড়বুট্টা এরা সবাই মিলে করেছে, তা সম্ভব নয়। হয়তো মাত্র একজন দায়ী, খুব বেশি হলে দু’জন। কারা তারা? নিজের হাতে তাদেরকে শাস্তি করতে হবে ওর। আজামাত কিরিমকে আক্রমণ করেছে, সেই অপরাধে। কিরিমের ভাগ্যে কি আছে কে জানে—হয়তো সে বাঁচবে না। তবু বাকি ছ’জনের চেয়ে তার ভাগ্য এখনও ভালই বলতে হবে। ওরা সবাই খুন হয়েছে।

মাড় ফিরিয়ে নিল রানা। চৌকাঠ পেরিয়ে বেরিয়ে এল অন্ধকারে বরফ-ঝড়ের মধ্যে।

লেনিনগ্রাদ-২

প্রথম প্রকাশ: মে, ১৯৮৩

এক

ক্লান্ত, ভীষণ ক্লান্ত ওয়া। তবু বাটার তাগিদে কোনমতে পা টেনে টেনে এগিয়ে চলেছে। ঝোড়ো বাতাসের হু-হু অবিচল গর্জন তেমনি রয়েছে, কিন্তু একটা সুবিধে পাচ্ছে ওরা এখন। নভেলিকে খুঁজতে যাবার সময় বাতাস ছিল মুখোমুখি, এখন উল্টো দিকে হাটছে ওরা। পিঠেও আগের মত বোঝা নেই। তবু, প্রায়-অসম্ভব একটা কাজে নেমেছে, ওরা জানে। অসাধারণ মনের জোর এখনও বাত্ম রেখেছে রানা আর রুস্তভকে।

কেমন এক ধরনের দূর অন্ধকার। টর্চের আলোয় পথ দেখে দেখে এগিয়ে চলেছে দু'জন, নির্জন সীমাহীন বরফের রাজ্যে যেন দুটো অশরীরী প্রেত।

লেনিনগ্রাদের দিকে এগিয়ে চলেছে দু'জনে। মনে সারাক্ষণই একটা অস্বস্তি মচ খচ করছে ওদের, যদি লেনিনগ্রাদের চারদিক থেকে ফিরে আসে বরফ? যদি বরফের তলায় ডুব মারতে, বাধ্য হয়ে সাবমেরিন? কোনদিন আর ওটাকে খুঁজে পাবে না ওরা। এই দূস্তর প্রতিবন্ধতার বিরুদ্ধে লড়াই করে স্টেশন নভেলিতেও আর ফিরে যাবার সামর্থ্য থাকবে না। হায় মানে নিশ্চিত মৃত্যু।

দারুণ ক্লান্তি সত্ত্বেও ছুটিতে চাইছে রুস্তভ, কিন্তু জোর করে তাকে টেনে থামাচ্ছে রানা। এই বরফের রাজ্যে জোড়ার প্রতিজ্ঞা বড় ভয়ঙ্কর। জানে সে, যতই তাড়া থাকুক, কখনও জোড়ার চেষ্টা করে না এন্টিমোরা। বেশি ছোটোছোটো করলে শরীর থেকে ঘাম বেরোবে। থেমে গেলেই শরীরের উত্তাপ কমে গিয়ে গরম পোশাকের তলায় ঘাম পাতলা বরফের আন্তরণে পকিগত হয়ে যাবে। এই আন্তরণকে গলাতে হলে আবার ছুটিতে হবে, গরম করতে হবে শরীর। তাই মানে আরও ঘাম বেরোবে। আবার থেমে গেলে আরও ভারী হবে বরফের আন্তরণ। সোজা কথা, একবার শরীর থেকে ঘাম বেরোলে আর বন্ধা নেই। কোন নিরাপদ জায়গায় না পৌঁছানো পর্যন্ত ছুটিতে হবে, কিংবা গমে গিয়ে বরফে মুখ গুঁবে পড়ে মরতে হবে। কাজেই বরফের রাজ্যে চলার সময় যাতে শরীর থেকে ঘাম না বেরোয় এ ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হয়।

আধ ঘণ্টা পর একটা বরফের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল রানা, রুস্তভকেও থামাতে বলল। জিরিয়ে নিতে চায়। মাত্র দুই মিনিটে দু'বার আঘাত খেয়েছে রুস্তভ, অসহ্য বরফ এখানে সমতল। পিছলও নয়। এখানে আছাড় খাবার কোন কারণ নেই। আসলে পায়ে আর জোর নেই দু'জনের কায়েদে। আর পর করে কাপছে পা, শরীরের তরঙ্গাকারে পড়ছে না আর।

'কি হে, কেমন লাগছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'কোমরের নিচে কিছু নেই আমার, ডাক্তার,' হাসার চেষ্টা করল রুস্তভ। ঘড় ঘড় স্বর বেরোল গলা থেকে, 'কিন্তু ভেবে না। পায়ে সাড়া না থাকলেও আরও যানিক পথ যে করেই হোক বার। কদুর এলাম, আন্দাজ করতে পারো?'

'মাইল তিনেক,' বরফের দেয়ালে চাপড় দিল রানা, 'মিনিট দুই জিরিয়ে নিয়ে এটা ভিত্তিতে হবে। উচুই বলা যায়, কি বলা?'

'না না, এমন আর কি উচু,' মুখ বাকাল রুস্তভ। 'তাছাড়া এসব বাড়কেও পাত্তা দিই না আমরা। আমরা বীর। বাতাসে বরফ-কুটির পরিমাণ আরও বেড়েছে, না ডাক্তার? লেনিনগ্রাদের সেইন বেয়ে উঠতে পারব?'

'কি জানি,' ভাবছে রানা। 'আচ্ছা, রুস্তভ, কমান্ডার রাইকভ আমাদের কথা ডারছেন, না?'

অবাক হয়ে রানার দিকে তাকাল রুস্তভ, 'মানে?'

'আমরা লেনিনগ্রাদে ফিরে যাবি আবার, ডারছেন কি কমান্ডার? আমাদের তো ফিরে যেতে বলেছেনই তিনি। নিশ্চয়ই সন্দেহ করছেন তিনি, আমাদের রেডিওতে গোলমাল হয়েছে; সেক্ষেত্রে আমরা সাবমেরিনে ফিরে যাবার চেষ্টা করবই।'

'কি করে জানছেন তিনি, স্টেশন নভেলিতে পৌঁছে গেছি আমরা? তাহলেই ওধু ফেরার প্রশ্ন ওঠে।'

'না। আমাদের রেডিও নষ্ট হয়ে গেছে এটা তিনি কোনভাবে অনুমান করেছেন কিনা তার ওপর নির্ভর করছে সবকিছু। রেডিও নষ্ট হয়ে গেলে নভেলিকে খোঁজা বাদ দেব আমরা, তিনি ধারণা করে নেবেন। আর স্টেশন খুঁজে পাওয়ার পর যদি রেডিও নষ্ট হয়, তাহলেও আমরা কেউ না কেউ জাহাজে ফেরার চেষ্টা করবই, এটাও তিনি অনুমান করবেন। অন্ধকারে লেনিনগ্রাদের পাশ কাটিয়ে চলে যেতে পারি আমরা। সুতরাং সেইনের কোথাও একটা ব্যাল্প বসিয়ে রাখবেন না?'

'মাই গড, ডাক্তার, ঠিকই ধরেছ তুমি! নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই তা-ই করবেন কমান্ডার। মাথায় গোবর ছাড়া কিছু নেই আমার,' বলতে বলতে দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়াল রুস্তভ। 'কি করে ভিত্তাবে এটা, ভাবছে।'

কিন্তু দেয়ালটা পেরোল ওরা। কিছুতেই আগে উঠতে বাজি হলো না রুস্তভ। জোর করে ধরে তেলে দেয়ালের মাথায় চড়িয়ে দিল রানাকে। দেয়ালের মাথায় বসে হাত বাড়িয়ে রুস্তভকে প্রায় টেনেই তুলল রানা। বরফ-কুটির নদীটা পাওয়া গেল আবার এখানে, ওদের মাথার ওপর দিয়ে ঝোড়ো হাওয়ার তোড়ে ছুটিছে নফেন নদী।

'আরও দেয়াল থাকতে পারে,' রুস্তভের কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল রানা, 'আরও উচু দেয়াল।'

ঘাড় নেড়ে স্বীকার করল রুস্তভ। ওর মুখটা দেখতে পাচ্ছে না রানা, কিন্তু ঠিকই বুঝতে পারছে লেনিনগ্রাদে কি ভাবছে। রানা নিজেরও রুস্তভের মত একই কথা ভাবছে। কোন ব্যাল্প দেখতে পাচ্ছে না ওরা। কে জানে, বাধ্য হয়ে বরফের তলায় ডুবই মারতে হয়েছে হয়তো লেনিনগ্রাদকে।

পরের বিশ মিনিটে মোট পাঁচটা ছোট বড় দেয়াল ডিঙান ওরা। পরাজিত করে এনেছে ওদের বরফ। শরীরে কোন বরফ অনুভূতি নেই আর এখন রানার। কতভের অবস্থা আরও কাহিল। বসে পড়ে হামাগুড়ি দিতে আরম্ভ করেছিল, কিন্তু জোর করে টেনে তুলেছে তাকে রানা। তুলেছে বটে, কিন্তু তার নিজেরই ইচ্ছে করছে হামাগুড়ি নয়, একবারে ওয়েই পড়ে বরফের ওপর। যা হয় হোক।

কয়েক গজ এগিয়ে ধাপস করে পড়ে গেল রক্তভ। থমকে দাঁড়ান রানা। উবু হয়ে তুলতে গেল রক্তভকে। কিন্তু তার আগেই নড়েচড়ে উঠে বসল লেফটেন্যান্ট। বলল, 'সরি, ডাক্তার, পা পিছনে গেল হঠাৎ।'

জানে রানা, মোটেই পা পিছলাননি রক্তভের, আসলে আর বিন্দুমাত্র শক্তি নেই তার পায়ে।

বাতাসের গতি আরও বেড়েছে। চারদিকে ধূসর অন্ধকার, কিন্তু মাথার ওপরের অন্ধকার কালো। বরফ-কুটির নদী আরও পুরু হয়েছে, কালো অন্ধকার এজেনোই। চোখ কুচকে চারদিক দেখছে রানা। দেখা যাচ্ছে না কিছুই। তবু মোট তিনবার পশ্চিমকে সামনে রেখে উত্তর থেকে দক্ষিণে পুরো একশো আশি ডিগ্রী পাক খেয়ে দিগন্ত দেখার চেষ্টা করল। নাহ, কিছু নেই। তিন মিনিট পেরিয়ে গেল। বরফের জোয়া অনুভব করছে রানা রক্তে।

এই সময়ই ভাবনাটা খেলল রানার মনে। ধরা যাক বরফের তলায় ডুব দেয়নি লেনিনগ্রাদ, ধরা যাক তাকে ওরা পেরিয়ে এসেছে, তাহলে ঠিক কোনদিকে অবস্থান হবে সাবমেরিনটার? পূবে। হ্যাঁ, তাই, পূবে। চরকির মত পাক খেয়ে পূব দিকে ঘুরে গেল রানা। বাতাসের দিকে মুখ করে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বরফ-কুটি আঘাত হানল মুখে। চাপা আত্নানাদ করে উঠল রানা, কিন্তু চোখ ফেরান না। পূব দিক সামনে রেখে দক্ষিণ থেকে উত্তরে একশো আশি ডিগ্রী ঘুরল সে। অর্ধচক্রটা শেষ করে থমকে দাঁড়াল। ধীরে ধীরে তাকে রক্তভের কাঁধ ছুঁলো। 'রক্তভ, উত্তর পূবে। কোয়াটার মাইল, কিংবা আধ মাইলও হতে পারে। দাঁড়িয়ে দেখো তো?'

রানার বাড়ানো হাতের নির্দেশিত দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বইল রক্তভ। তারপর ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল এদিক-ওদিকে, 'নাহ, আমি কিছুই দেখছি না! কি দেখেছ তুমি?'

'মনে হলো আলোর কলক দেখলাম, গ্রান আলো। না না, তুল বলছি। আলো ঠিক নয়। মনে হচ্ছে, ওদিককার এক জায়গার বরফ আশপাশের চাইতে একটু বেশি উজ্জ্বল। কিন্তু অন্ধকারে উজ্জ্বলতা কেন দেখা যাবে? ফসফরাস তো নেই বরফে।'

পুরো আধ মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে উত্তর-পূবে উজ্জ্বলতা খুঁজল রক্তভ। শেষে বলল 'না, ডাক্তার, আমি কিছুই দেখলাম না। অবশ্য আমার চোখ কতটা ঠিক আছে, জানি না। গত এক ঘণ্টায় এ-দুটোকে তো কষ্ট আর কষ্টই নাইনি।'

বাতাসের দিকে পেছন ফিরল রানা। চোখ বন্ধ করল। চোখ দুটোকে কয়েক সেকেন্ড বিশ্রাম দিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়াল। চোখ মেলো তখন করে দেখে বলল, 'না, লেফটেন্যান্ট, এখন আমিও আর কিছু দেখছি না। আসলে হয়তো উজ্জ্বলতা কল্পনা করেছিলাম আমি। মকদ্দমিতে মরীচিকা দেখার মতই হবে হয়তো ব্যাপারটা।'

'দাঁড়াও দাঁড়াও, ডাক্তার,' কি মনে পড়ে যেতে তাড়াতাড়ি বলে উঠল রক্তভ। 'উজ্জ্বলতাটা কি ওপরের দিকে দেখেছিলে?'

গ্রান হাসল রানা। 'বরফ-কুটির নদীতে সার্ভেলাইটের প্রতিফলনের কথা ভাবছ?'

'না, থাক, ডাক্তার, অত আশা করে লাভ নেই। তাছাড়া লেনিনগ্রাদকে পেরিয়ে আসিনি আমরা, অথবা করনা করে কোন লাভ নেই।'

'লেনিনগ্রাদকে পেরিয়ে এসেছি আমরা, এটা কল্পনা করতে দোম নেই। কারণ, পর পর ক'টা বরফের দেয়াল ডিঙিয়েছি আমরা খেয়াল আছে? নভেলিকে খুঁজতে যাবার সময় অতগুলো দেয়াল পেরোতে হয়েছিল?'

'নিজেকে ধামোকা প্রবোধ দিচ্ছ, ডাক্তার,' আন্তে করে বলল রক্তভ। 'কথায় কোন প্রাণ নেই। কথা বলতেও যেন ভাল লাগছে না আর তার। 'এসব তোমার অতিকল্পনা।'

'আবার হয়তো উল্টো-পাল্টা শুরু করেছে আমার চোখ,' দেখতে দেখতে বলল রানা। 'কিন্তু উজ্জ্বলতাটা আবার দেখছি মনে হচ্ছে!'

'এসো, ওয়ে পড়ো, ডাক্তার।'

'কেন?'

'এসো, ঘুমিয়ে পড়ি,' দাঁতে দাঁত বাড়ি খাচ্ছে রক্তভের। 'কতক্ষণ আর লাগবে...' বোড়ো বাতাসের গর্জনে তার বিড় বিড় করে কথা বলা অস্পষ্ট শোনাল। বসে পড়ল সে।

এই সময়ই ঘটল ঘটনাটা। বড় জোর শ'চারেক গজ দূরে, ঠিক যেখানে উজ্জ্বলতা দেখতে পাচ্ছিল রানা, দপ করে আলো জ্বলে উঠল। বরফ-কুটির নদী তেদ করে দ্রুত ওপরে উঠে গেল তীর নীলচে-সাদা আলো। পেছনে রেখে গেল নালচে শিখা। শ'ছয়েক গজ ওপরে উঠে ফাটল বকেট-ফ্লোর। আকাশে আলোর গুলঝুরি ছিটাল কয়েক সেকেন্ড। তারপর যেমন দপ করে জ্বলে উঠেছিল, তেমনি দপ করেই নিভে গেল। নিচের বরফ-রাজ্যকে আরও শীতল আরও অন্ধকার করে দিয়ে গেল যেন।

'এখনও বলবে অতিকল্পনা, লেফটেন্যান্ট?' বলল রানা।

'কসম খোদার, এর চেয়ে সুন্দর দৃশ্য আর কখনও দেখিনি, ডাক্তার,' উঠে দাঁড়িয়েছে রক্তভ। 'তোমার চোখের দৃষ্টি-শক্তির ওপর শ্রদ্ধা আরেক ডিগ্রী বাড়াব কিনা, ভাবছি। স্থল ছুটি হয়েছে, ডাক্তার, চলো এবার বাড়ি ফিরে যাই।'

দশ মিনিটের মধ্যেই বাড়ি ফিরল ওরা।

'কপাল নেহায়েতই ভাল বলতে হবে আমাদের,' সব শুনে হাললেন কমান্ডার বরিকভ, 'তিন নব্বই কয়েকটা দেখতে পেরেছেন। ওটাই শেষ, আর নেই আমাদের কাছে।' একটু থেমে জিজ্ঞেস করলেন, 'তা আপনি বলছেন গ্যাকো, পিগিন এবং নভেলির অন্যান্য আহতরা মোটামুটি নিরাপদেই আছে?'

'আগামী দু'দিন ভাবনা নেই,' বলল রানা। 'গরম বর আর হালপাতার সেবায় দরকার। তবে এগুলো ছাড়াও দু'দিন টিকে থাকতে পারবে ওরা।'

'ভাল,' নিশ্চিত দেখান কমান্ডারকে। 'এখানকার সবকিছু অনুমোদিত। পলিনাইয়ার চারপাশে বরফ জমা বন্ধ হয়েছে আগ ঘণ্টা আগে। ডুব নিয়ে বাসে হাচ্ছি না আর এখন আমরা। আইস মেশিনের কোথায় গোলমাল হয়েছে। বের করে ফেলোছে এঞ্জিনিয়ার। খুবই কমপ্লিকেটেড কাজ, কিন্তু সারানো যাবে। সময় লাগবে কয়েক ঘণ্টা। এটা সারিয়ে নেবার আগে ডুব দেয়া উচিত মনে করি না আমি। বরফের তলা দিয়ে আইস মেশিনের সহায়তা ছাড়া নভেলিজে পৌছানোর ঝুঁকি না নেয়াই ভাল।

'হ্যাঁ, তাই ভাল,' মেডিসিনাল আলকোহলের গেল্লাসে চুমুক দিয়ে বলল রুস্তম। 'কিন্তু আমি ভাবছি, নভেলির কাছাকাছি যদি পলিনাইয়া না পাওয়া যায়?'
'পাতলা বরফের স্তরের খোঁজ করব। টার্পেডো হুডে বরফ স্রাব্যের ব্যবস্থা করব। জানি না, কতটা কাজ হবে। কিন্তু আমার মনে হয়, হবে।'
'হয়তো বা, অনিশ্চিত শোনাও রুস্তমের কণ্ঠ। 'ক'টা টার্পেডো ঠিক আছে? পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে?'

'চারটে।'

'তাহলে বুলিনকে নিয়ে ওগুলো টিউবে ভরে ফেলিগে যাই।'

'অত তাড়াহুড়ো নেই,' বাধা দিলেন কমান্ডার, 'তাছাড়া তোমার এখন কিছু করতে হবে না। চেহারাটি বলছে, টার্পেডো তো দূরের কথা, এয়ার-গানে গুলি ভরার ক্ষমতাও তোমার নেই এখন। যা বলছি শোনো, গিয়ে ঘুমিয়ে নাও কয়েক ঘণ্টা। যাও।'

'তক করল না রুস্তম। কমান্ডারের কথার প্রতিবাদ করে লাভ হবে না, যা বলছেন মেনে নেয়াই উচিত। এক চুমুকে গেল্লাসের অবশিষ্ট তরল পদার্থটুকু শেষ করেই দরজার দিকে রওনা দিল সে। দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকল, 'আপনি আসবেন, ডাক্তার?'

'আসছি। একটু পরে।'

'ঠিক আছে,' বলেই চলে গেল রুস্তম।

'বাইরের আবহাওয়া খুবই খারাপ, না ডাক্তার?' জিজ্ঞেস করলেন রাইকভ। বুকল রানা, এটা আসল প্রশ্ন নয়। বাইরে আবহাওয়া কেমন ভাল করেই জানা আছে কমান্ডারের।

'না না, খারাপ হবে কেন,' কৃত্রিম গাছীরের সঙ্গে এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল রানা। 'চমৎকার আবহাওয়া। ফুরফুরে বাতাস।...'

'রুস্তমের কথা বলছি, ডাক্তার,' রানাকে বাধা নিয়ে অন্য প্রশ্ন করলেন রাইকভ, 'ওর ব্যবহার দেখে মনে হলো, আপনার প্রতি কোন কারণে কৃতজ্ঞ বোধ করছে সে।'

'নিশ্চয় নয়না। এমন কোন কাজই করিনি ওর জন্যে যাতে কৃতজ্ঞ হতে পারে সে। একটা কথা অবশ্য জোর দিয়ে বলতে পারি, একজন লেকচরেন্সিট পেয়েছেন বটে আপনি! সোনার টুকরো।'

'সে কথা জানি আমি,' বললেন রাইকভ। উল্লেখ করছেন, কি জানি বলি বলি করেও বলতে পারছেন না। 'শেষে বলেই ফেললেন, 'আপনার বন্ধু...'

আগে করে মাথা ঝাঁকাল রানা, 'আছে, কমান্ডার। ছ'টা লাশের সঙ্গে পড়ে আছে।'

'সরি,' অস্বস্তিতে ভুগছেন কমান্ডার। কিছুক্ষণ চুপচাপ। পরামর্শ চাইলেন, 'লাশগুলো... মানে, পোড়া লাশগুলো কি দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাব আমরা? মানে আমি বোঝাতে চাইছি, ঠিক নেবার মত অবস্থা আছে? সনাক্ত করা যায়?'

'বেশির ভাগই যায় না,' গেল্লাসের তরল পদার্থটুকু এক চুমুকে শেষ করে বাড়িয়ে বলল রানা, 'আর একটু দোবেন, কমান্ডার? চমৎকার জিনিস।'

বোতল থেকে ঢেলে রানার গেল্লাসটা ভরে দিলেন কমান্ডার। আরও দুই চুমুক খেয়ে রানা বলল, 'কয়েকটা লাশ সনাক্ত করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। বিকৃত পোড়া দোমড়ানো কিছু মাংসপিণ্ড... আমার মনে হয় এগুলোকে নিয়ে গিয়ে আত্মীয়-স্বজনের কাছে ফেরত দেয়া উচিত হবে না মোটেই। আমরা বাইরের লোককেই সনাক্ত করতে পারছি না, দেখলে আপনজনের কেমন প্রতিক্রিয়া হবে অনুমান করা যায় পরিষ্কার। না, ক্যাপ্টেন, মাংসপিণ্ডগুলোকে এখানেই কবর দিয়ে যাব আমরা। তবে, যে লাশগুলো সনাক্ত করা যায়, সেগুলো নিয়ে যেতে কোন বাধা নেই।'

অতিরিক্ত নিঃশ্বাস ফেললেন না কমান্ডার, তবে মন থেকে অস্বস্তি দূর হয়ে গেছে তাঁর এটা বোঝার জন্যে টেলিপ্যাথি জানার প্রয়োজন হয় না। বাপারটা ঢাকা দেবার জন্যে তাড়াহুড়ো বলে উঠলেন, 'আর হ্যাঁ, ওসব আমেরিকান মিসাইল খোঁজার যন্ত্রপাতি, ওগুলো আছে?'

'খুঁজে দেখার সময় পাইনি,' বলল বটে, কিন্তু জানে রানা শিপগিরই আবিষ্কার করবেন কমান্ডার, মিছে কথা বলেছে রানা। তখন কমান্ডারের মধ্যে কেমন প্রতিক্রিয়া হবে ঠিক অনুমান করতে পারছে না রানা, পারার চেষ্টাও করছে না। ক্রান্তির চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে তার শরীর অনেক আগেই। এখন শুধু একটা লম্বা ঘুম দরকার।

দুই

কেবিনে ঢুকে দেখল রানা, অঘোরে ঘুমচ্ছে রুস্তম। বাফের নিচে নুটাচ্ছে গা থেকে খুলে নেয়া ফারের পোশাক। নিজের পোশাকও খুলে ফেলল রানা। রিফকলে ভরে রাখল পিঙ্কল। তারপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়। সাংঘাতিক রকম অবসন্ন শরীর, কিন্তু তবু কিছুতেই ঘুম এল না তার চোখে।

হাজারও চিন্তা এসে একসঙ্গে ভিড় জমিয়েছে রানার মনে। অনেকক্ষণ গড়াগড়ি করে যখন বুকল ঘুম আসবে না, উঠেই পড়ল সে। একটা শার্ট গায়ে চড়িয়ে, ডেনিম প্যান্ট পরে চলল কট্রোল রুমে। বাকি রাতটুকু ওখানেই কাটিয়ে দিল রানা। পাছপাতি করে বেড্রুম মারের মধ্যে শুয়ে অসামান্যভাবে দু'জন টেকনিশিয়ানের আইস মেশিন সারানো দেখল, কর্মহীন অফিসারের সঙ্গে এটা-ওটা নামান কথা বলল, 'আর কফি খেলো প্রতি পাঁচ মিনিটে এক কাপ করে। সকাল হলেও কিন্তু

কোনরকম জড়তা টের পেল না শরীরে, হয়তো অগুনতিকাপ কক্ষের উপ।

সকালে বেকফাস্ট টেবিলে সবাইকে হাসি-খুশি দেখান। ওরা জানে, একটা অত্যন্ত ভাল কাজ করে গেলেও ওরা—নভেলিকে খুঁজে পেয়েছে, উদ্ধার করতে যাচ্ছে আহতদের, সারা পৃথিবী বাহবা দেবে ওদের, আত্মীয়-স্বজন আর দেশবাসীর কাছে মুখ উজ্জ্বল হবে। কারোই মনে হচ্ছে না, এখনও নভেলিতে পৌছাননি লেনিনগ্রাদ। পলিনাইয়া না থাকলে টর্পেডো বুঁড়ে বরফ ভেঙে আদৌ ভেসে উঠতে পারবে কিনা সারমেরিন এবং না পারলে অভিযানটাই যে ভেঙে যাবে, ভাবছেই না যেন কেউ। হতে পারে, কমান্ডার ব্রাইকটের ওপর ওদের অটল বিশ্বাস রয়েছে বলে 'সামান্য' এই কাজকে কঠিন ভাবতে পারছে না তারা।

'বৈশি করে খেয়ে নাও,' বললেন কমান্ডার, 'কিছু কাজ পড়ে আছে সামনে, গায়ে শক্তি দরকার। নভেলিতে আহতরা বেঁচে আছে ঠিকই, কিন্তু তাজার মধ্যে অসুস্থ অবস্থায় বড় কষ্ট আছে। তাদের লেনিনগ্রাদে তোলার আগে আর খাবার সময় পাবে কিনা কে জানে। আইস মেশিন ঠিক হয়ে গেছে, আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই ডুব দেবে লেনিনগ্রাদ। ডুব দেবার পরেই প্রথম কাজ হলো, টর্পেডো ভরতে হবে টিউবে। দুটো ভরলেই চলবে।' রুস্তভ আর টর্পেডো অফিসার বুলিনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমরা যাও।' রানার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি যাবেন নাকি দেখতে? না এদের ব্যাপার আপনার কাছে পুরানো?'

প্রশ্নটা এড়িয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। 'মাই, দেখি কেমন করে টর্পেডো ভরে।' আরেক ওসিপভ এই বুলিন। চেহারা দেখে মনে হয়, এখনও কুলের বেড়া ডিঙাতে পারেনি। অথচ উঁচু পর্যায়ের একজন অফিসার সে, নিজের কাজে কতবড় বিশেষজ্ঞ তার কাজ না দেখলে বিশ্বাসই করা যায় না।

ডাইভিং কনসোর্সের কাছে একটা প্যানেলের সামনে গিয়ে দাঁড়ান রুস্তভ। ডীফ চোখে তাকাল প্যানেলের সিগন্যাল লাইটগুলোর দিকে। বাতাসে ভ্রম হয়েছে তার। শুধু কপালের চামড়া আর চিবুকের কাছে যথানে কামড় বসিয়েছে বরফ, সেখানটা বাদ দিলে আবার আগের মতই সুস্থ বলা যায় তাকে। হাসিখুশি আর আত্মবিশ্বাসের তাজা ভাবটা আবার ফিরে এসেছে চেহারা।

হাত বাড়িয়ে রানাকে ডাকল রুস্তভ, 'দেখে যাও, ডাকল।' রানা পাশে এসে দাঁড়াতেই আঙুল তুলে লাইটগুলো দেখিয়ে বলল, 'টর্পেডো দেড়টি লাইটস। সবুজ আলোগুলো এখানে বোঝাচ্ছে টর্পেডো টিউবের দরজা বন্ধ। মোট ছ'টা দরজা—বো-ক্যাপ বাকি আমরা ওগুলোকে, সাগরের দিকে বোঝে। এই যে আলোগুলো, যদি লাল হয়ে যায়, তাহলে বুঝবে বো-ক্যাপগুলো বোলা। নম্বর দেয়া আছে, কোন আলোটা কোন বো-ক্যাপের জন্যে জানি আমরা।' বুলিনের দিকে ফিরে বলল, 'তাই না বুলিন?'

মাড় দেড়ে সাহা দিল বুলিন।

প্যানেল দেখে বো-ক্যাপ বন্ধ আছে নিশ্চিত হয়ে বসে দিল রুস্তভ। তার পেছনে বুলিন। সব শেষে রানা। ওয়ার্ডকম প্যানেলের খন্ডে এগিয়ে গিয়ে চতুর্থ কম্প্যানিয়নওয়ে পেছিয়ে ওদের কোয়ার্টারের কাছে গেলেন ওরা। দেখান বেরে চলে এল সামনের টর্পেডো স্টোরেজ রুম। এর আগের দার বরফ এখানে এসেছিল

রানা, সেই যাত্রার শুরুতে, পোটা আটেক বাথকে ঘুরেছিল ক্র-বা, এখন সবক'টা বালি। পাঁচজন লোক দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে ওদের জন্যে; চারজন শী-মান, একজন অফিসার।

অফিসারকে দেখিয়ে রানাকে বলল রুস্তভ, 'পেটি অফিসার পেট্রিড। খুব কাজের লোক।'

হাসল পেট্রিড। তারপর রুস্তভের নির্দেশ পেয়ে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল প্রথম কলিশন-বাক্সের দরজার সামনে। হুড়কো সরিয়ে দরজা খুলে সরে দাঁড়াল এক পাশে। বুলিন আর রানাকে নিয়ে আঠারো ইঞ্চি সিল পেরিয়ে ভেতরে ঢুকল রুস্তভ। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে আবার হুড়কো লাগিয়ে দিল পেট্রিড। দ্বিতীয় বাক্সের দরজা খুলল রুস্তভ, দ্বিতীয় সিল পেরিয়ে টর্পেডো রুমে এসে ঢুকল তিনজনে। এবারে আর বন্ধ করা হলো না দরজা। হা করে খুলে দিলে একটা ভারী স্ট্যান্ডিং-ক্যাচের হুকে আটকে দিল বুলিন দরজার পাল্লা।

'নিয়ম,' রানার দিকে তাকিয়ে বলল রুস্তভ। 'টর্পেডো লোড করার সময় ছাড়া দুটো দরজা কখনোই এক সঙ্গে খুলি না আমরা।'

কিছুটা এগিয়ে গিয়ে টিউবগুলোর পেছনের ধাতব-হাতল পরীক্ষা করল রুস্তভ। তারপর হাত বাড়িয়ে কেস থেকে একটা স্টীল-স্প্রিং মাইক্রোস্কোপ নামিয়ে এনে সুইচ টিপল। মুখের কাছে নিয়ে বলল, 'টেষ্ট টিউব পরীক্ষা করব। সব হাতল বন্ধ। সিগন্যাল লাইটের হু কি?'

'সব ক'টা সবুজ।' মাথার ওপরে ছাতে বসানো সাইডবক্সে কথা শোনা গেল। ধাতব রুস্তভ।

মাইক্রোস্কোপ আবার কেসে রেখে দিল রুস্তভ। 'এইমাত্র তো চেক করে এলে?' রুস্তভের দিকে সগ্রহ দৃষ্টিতে তাকাল রানা।

'নিয়ম, এবারেও,' হাসল রুস্তভ। 'আমার দাদা সাতানকই বছর বেঁচেছিলেন। রেকর্ডটা ভাঙতে চাই আমি। কাজেই অসাবধান হওয়া আমার কাজে না কখনও।' বুলিনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কোন দুটোতে ভরবে, বুলিন?'

'তিন আর চার।'

গোলাকার পেছন-দরজাগুলোর ওপরের ধাতব দেয়ালে পিতলের নাস্তার-প্রেটি বসানো। পেটি-সাইড দরজাগুলোর ওপরের নম্বর যথাক্রমে: ২, ৪, এবং ৬। আর স্টারবোর্ড সাইডেরগুলোর নম্বর: ১, ৩, এবং ৫। দুই দিকেরই মাঝের দুটো চেয়ারে টর্পেডো ভরার পরামর্শ দিচ্ছে বুলিন। সাহা দিল রুস্তভ।

বরফ-মোড়ানো পানি-নিরোধক টর্চ হাতে তিন নম্বর চেয়ারের কাছে গেল বুলিন। রানাকে বোঝাল রুস্তভ, 'এবারেও কোন ঝুঁকি নিতে চাই না। দরজায় বসানো টেষ্ট-কক খুলবে আগে বুলিন, টিউবে পানি আছে কিনা পরীক্ষা করবে। প্যানেল সবুজ আলো শো করলে এতসব দরকার হয় না, কিন্তু বাড়তি সতর্কতা। বো-ক্যাপের কীক-ফোকর দিয়ে চুইয়ে কিছু পানি মাঝে-মাঝে টিউবে ঢোকে, অবশ্য যদি বেশি গভীরে ডুব দেয় লেনিনগ্রাদ শুধু তখনই। সেটা এমন কিছুই না। যদি টেষ্ট-টিউবে পানি থাকে, দরজা খুলে ভেতরে আলো ফেলবে বুলিন। বো-ক্যাপের কি অবস্থা, দেখবে।' বুলিনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি বুঝে?'

‘তিন নম্বর ঠিকই আছে,’ তিনবার টেস্ট-কক খুলল বন্ধ করল বুলিন। ‘পানির চিহ্ন নেই।’ তবু দরজা খুলে দেখি।

লিভারে চাপ দিয়ে দরজার পেছনের শক্ত হাড়কো তুলল বুলিন, হাতল ধরে টেনে ভারী দরজা খুলল, ভেতরে আলো ফেলে পরীক্ষা করল, আবার দরজা বন্ধ করে ফিরল, ‘ঝকঝকে পরিষ্কার, ঝটখটে শুকনো।’

‘এভাবে, এই ভাষায় রিপোর্ট করতে শেখানো হয়নি তোমাকে,’ এদিক-ওদিক মাথা নেড়ে আক্ষেপ করল রুস্তভ, ‘আজকালকার ছেলে-ছোকরাগুলো যে কি! তা বাবাজী, চার-নম্বরটা দেখোতো এবার।’

দাঁত বের করে হাসল বুলিন। ‘ঠিক হ্যাঁ, পিত্তজী,’ বলে এগিয়ে গেল চার নম্বর দরজার সামনে। তিন নম্বরের মত একই কায়দায় টেস্ট-কক খুলেই বলল, ‘ও-মা!’

‘কি? গার্লফ্রেন্ড অনের সঙ্গে ভেগেছে?’ জিজ্ঞেস করল রুস্তভ।

‘পানি, লেকটেন্যান্ট,’ তিক্ত শোনাতে বুলিনের কণ্ঠ।

‘বেশি?’ বলতে বলতে এগিয়ে গেল রুস্তভ, ‘দেখি তো।’

‘সব একটা ধারা।’

‘খারাপ?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

‘এমন ঘটে, আগেই তো বলেছি,’ বলল রুস্তভ। টেস্ট-কক নাড়াচাড়া করতেই আরও খানিকটা পানি বেরিয়ে এল, চামচখানেক হবে। ‘বো-ক্যাপে সামান্য গোলামাল, তেমন কিছু না। বো-ক্যাপ খোলা থাকলে বুনেটের মত বেরিয়ে আসত পানি। কিন্তু তা নয়, সামান্য চোয়াচ্ছে। সিগন্যাল লাইটও সবুজ,’ বলতে বলতে আবার গিয়ে মাইক্রোফোন তুলে নিল রুস্তভ। জিজ্ঞেস করল, ‘চার নম্বর লাইট এখনও সবুজ?’

‘এখনও সবুজ,’ উত্তর এল ধাতব কণ্ঠে।

‘ট্রিম শীট চেক করো তো। আরও শিওর হতে চাই আমি,’ কন্ট্রোলরুমকে বলল রুস্তভ।

কয়েক সেকেন্ড নীরবতা। তারপর আবার কথা শোনা গেল সাউন্ডবক্সে। নতুন কণ্ঠ, ‘ক্যাপ্টেন স্পীকিং। প্রতিটা টিউব “এম্পটি”।’

‘থ্যাংক ইউ, ক্যাপ্টেন।’ সুইচ বন্ধ করে কেনে মাইক্রোফোন রেখে দিল আবার রুস্তভ। ‘অবস্থা কি, বুলিন?’

‘পানি চোয়ানো বন্ধ হয়ে গেছে।’

দরজার হাড়কো খোলার লিভার ধরে চাপ দিল বুলিন। ইথিখানেক নড়ল হাড়কো, তারপরই আটকে গেল। ‘জাম হয়ে গেল।’

কুক কঁচকে বুলিনের দিকে তাকায় রুস্তভ। ‘কক কণ্ঠে বলল, “লুব্রিকেটিং অয়েলের নাম হলোই কখনও ওই ক্রানসের অত্যাশ্চর্য আছে হয়তো।’ চাপ দাও, জোরে চাপ দাও, খুলে যাবে।’

আরও জোরে লিভারে চাপ দিল বুলিন। ‘আরও ইথিখানেক খুলে আবার আটকে গেল হাড়কো।’ ‘শালা হাড়কোর বাচ্চা! তোর একদিন কি আমার একদিন! বলছি লিভারের ওপর শব্দীরের সমস্ত ভর ছেড়ে দিল বুলিন।

দরজার দিকে তাকিয়েছিল রুস্তভ, আচমকা প্রায় আতঁনাদ করে উঠল, ‘না, না, চাপ দিও না, বুলিন! সাবধান—’

কিন্তু ততক্ষণে দেরি যা হবার হয়ে গেছে। বুনে গেছে হাড়কো, সঙ্গে সঙ্গে কামানের গোলাব মত ছিটকে খুলল ভারী গোলা দরজাটা। ভয়ানক এক ঢালের মত বুলিনের মাথায় আঘাত করল সেটা। তারপর ছুটে-এল পানির স্রোত। ভয়ঙ্কর গতিতে আঘাত হানল হতভাগ্য টর্নেডো অফিসারে শব্দীরের মাঝামাঝি। তাকে উড়িয়ে নিয়ে ফেলল উল্টো দিকের ধাতব দেয়ালে। পানির তোড়ে কয়েক মুহূর্ত দেয়ালের পায়ে সেটে রইল বুলিনের দেহটা, তারপর কাত হয়ে পড়ে গেল একপাশে।

হো মেরে কেন থেকে মাইক্রোফোন ছিনিয়ে আনল রুস্তভ। সুইচ অন করেই চেষ্টা করে উঠল, ‘রো অল মেইন ব্যালান্ট!’ একটা টিউব-ডোরে পিঠ ঠেকিয়ে পানির তোড়ে পিছলে যাওয়ার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করছে প্রাণপণে। পানির গর্জনকে ছাপিয়ে আবার চিৎকার করে উঠল সে, ‘ইমারজেন্সী! রো অল মেইন ব্যালান্ট! চার নম্বর বো-ক্যাপ সাগরের দিকে খুলে গেছে। রো অল মেইন ব্যালান্ট!’ পানির ঝটকায় ছিটকে পড়তে পড়তে একটা হাতল ধরে কোনমতে তুলে রইল রুস্তভ। মাইক্রোফোনটা আগেই ছেড়ে দিয়েছে হাত থেকে। ইতিমধ্যেই আধহাত উঠে এসেছে পানি। রানার দিকে তাকিয়ে চেষ্টা করে উঠল, ‘বেরো ও! জলদি বেরিয়ে যাও এখান থেকে!’

খামোকাই চেষ্টা করে শক্তি খরচ করল রুস্তভ। তার বলার আগেই রঙনা হয়ে গেছে রানা, কিন্তু একা নয়। লাফ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে পড়ে থাকা বুলিনের একটা হাত চেপে ধরে টেনে দরজার কাছে নিয়ে গেছে। মাত্র কয়েক সেকেন্ড পেরিয়েছে, এবই মাঝে সামনের দিকে টন টন পানির চাপে নাক নিচু হতে আরম্ভ করেছে লেনিনখানদের। ফলে সামনের দিকে ঝুকে যাচ্ছে রানা। এই অবস্থায় তীর পানির স্রোতের ধাক্কা বাঁচিয়ে আঠারো ইঞ্চি সিল পার করে একটা ভারী দেহকে টেনে নিতে রীতিমত কসরৎ করতে হচ্ছে তাকে। হাঁটুর কাছে উঠে এসেছে পানি। এই পানিই বুলিনের দেহটাকে ওপারে নিতে সাহায্য করল, কিন্তু সেই সঙ্গে প্রচণ্ড ধাক্কাও মারল রানাকে। সিলের ওপারে চলে এল বুলিনের দেহ, তাল সামলাতে না পেরে দুটো বাকহেড-দরজার মাঝামাঝি জায়গায় ছিটকে পড়ে গেল রানা, কিন্তু বুলিনের হাত ছাড়ল না।

এখনও বাকহেডের অন্যপাশে আছে রুস্তভ। পানির গর্জনকে ছাপিয়ে তার গালমন্দ কানে আসছে রানার। স্ট্যান্ডিং-ক্যাচে আটকানো বাকহেড ডোরের হাড়কো খোলার চেষ্টা করছে সে প্রাণপণে। সামনের দিকে ঝুকে যাচ্ছে লাবমেধিন, পেছন থেকে ধাক্কা মারছে পানির ভয়ঙ্কর চাপ। কিছুতেই সামাল দিতে পারছে না সে। পানির চাপ পড়েছে দরজার ওপর, হাড়কো খোলা রীতিমত দুঃস্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রুস্তভ একা পেরে উঠছে না দেখে বুলিনের হাত ছেড়ে দিল রানা। আছড়ে-পড়তে কোনমতে গিয়ে বাকহেড দরজার কাছে দাঁড়াল। গায়েব সমস্ত জেজব নিয়ে চাপ দিল দরজার গায়ে। বাড়তি সাহায্য পেয়ে এক টানে হাড়কো তুলে আনল রুস্তভ। এক সঙ্গে পান্নায় জোর ধাক্কা মারল দু’জনে। অর্ধেক বন্ধ হয়ে গেল

দরজা। কিন্তু মিল ডিঙিয়ে আসছে পানি, দরজা পুরো বন্ধ হাতে নিচ্ছে না।

কপ্তভকে হাসছে বলে মনে হলো রানার। পরক্ষণেই তুল ভাঙল। হাসছে না। দাঁত খিচিয়ে চাপ দিচ্ছে দরজায়। জোরে চোঁচিয়ে উঠল, 'একুপি বন্ধ করতে হবে এটা। নইলে আর কোনদিন বন্ধ করা যাবে না।'

আরও জোরে চাপ দিল দু'জনে। আরও খানিকটা বন্ধ হলো দরজা, কিন্তু ইঞ্চি চারেক ফাঁক আর কিছুতেই বুজিয়ে আনতে পারছে না। চাপ বোধহয় একটু কমেছিল, হঠাৎ এক ধাক্কায় আবার পুরো খুলে গেল দরজা। আবার চেপেচুপে চার ইঞ্চিতে এনে ঠেকানো হলো সেটাকে। কিন্তু আর পারছে না। মৃত দরজা পুরোপুরি বন্ধ করতে না পারলে আরও বেড়ে যাবে পানি। তখন আর বন্ধই করা যাবে না।

'একা ধরে রাখতে পারবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

ঘাড় কাত করল কপ্তভ।

দরজায় চাপ ছেড়ে দিয়ে আচমকা বসে পড়ল রানা। দরজার দিকে পেছন ফিরে ভারী স্ট্যান্ডের সোজা দুই হাতে চেপে বসল। তারপর দরজার নিচের দিকে দুই পায়ের ঠেকা দিয়ে আচমকা সোজা করল দেহ। ঝটিকা খেয়ে নিলের পায়ে লেগে গেল দরজা। হেঁচকি ছিল কপ্তভ। একটা হুড়কো জায়গামত বসিয়ে দিল সে। এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় হুড়কোটীও আটকে দিল রানা। বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

ছুটে গেল রানা। প্রথম দরজা খোলার জন্যে ধাক্কাধাক্কি শুরু করল। খুলে গেল দরজা। অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল পেট্রিভ আর তার দল, তারপর চাইল ঘরের ভেতরের পানির দিকে। এই সময় বাতাসের গর্জন কানে এল রানার। ব্যালান্ট খালি করছে উচ্চচাপের বাতাস। দরজা খুলে যেতেই আবার ফিঙ্গল রানা। বুলিনের দুই বাহু ধরে টেনে তুলছে কপ্তভ। ছুটে গিয়ে পায়ের দিকটা ধরল রানা। দু'জনে ধরাধরি করে দরজার বাইরে নিয়ে এল বুলিনকে।

'হয়েছে কি?' কপ্তভকে জিজ্ঞেস করল পেট্রিভ, 'গোলমালটা কি লেফটেন্যান্ট?'

'চার নব্বয়ের বো-ক্যাপ খুলে গেছে।'

'সর্বনাশ!'

'জলদি বাক্সহেড বন্ধ করে দাও,' আদেশ দিল কপ্তভ। বুলিনকে নামিয়ে রেখেই ছুটল। নিচের দিকে বাঁট ডিগ্গি কোণে নেমে গেছে লেনিন্সাদের নাক। আছড়ে পাহাড়ে হামাঙড়ি দিয়ে ঢালু হয়ে যাওয়া প্যাসেজ ধরে দৌড়াচ্ছে সে।

মেরোতে শোয়ানো বুলিনের দিকে একবার চাইল রানা। যা দেখার দেখে নিয়ে আপনমনে মাথা বাকাল। তারপর কপ্তভের মত একই কয়দার ছুটল তার পেছনে।

হাই-প্রেশারড বাতাসের গর্জন শোনা যাচ্ছে জায়গার সর্বত্র। ব্রুস ব্যালান্ট ট্যাংক খালি করছে প্রবল বাতাস। কিন্তু নাক আর কাঁধা হচ্ছে না লেনিন্সাদের। ক্রমশ মেরুনাথের বস্তীর কালো অন্ধকার অতলের দিকে নেমে চলেছে। টিন টিন পানিতে ভরে পেছে উপড়েটা কম। প্রবল বাতাস পেঁদে উঠছে না ভারী পানির সঙ্গে।

ওয়ার্ডক্রম প্যাসেজ পেরিয়ে এসে হ্যাড-রেইল ধরে নিজেকে ডেকে টেনে তুলতে তুলতে সাবমেরিনে একটা কম্পন টের পেল রানা। বুঝল, বিশাল টারবাইনগুলো চালু হয়ে গেছে রাইকভের নির্দেশে। দানবীয় রোজ-থ্রশেলারগুলো কামড় বসানোর চেষ্টা করছে সাগরের পানিতে। সমস্ত শক্তি দিয়ে লেনিন্সাদকে টেনে তুলে আনতে চাইছে।

হ্যাড-রেইল ধরে ধরে কোনমতে কট্টোলরুমে এল রানা। সোনার রুমের পাশ কাটিয়ে যাবার সময় একজন লোকও তার দিকে চোখ তুলে চাইল না। চাইবার সময়ও নেই তাদের। ডেপথ গজের ডায়াল আর খির খির কম্পমান কাঁটার সঙ্গে যেন আটা দিয়ে আটকে দেয়া হয়েছে ওদের চোখ।

কট্টোলরুমে পৌঁছে কমান্ডার রাইকভের মুখে শুল রানা, ইতিমধ্যেই ছ'শো ফুট নিচে নেমে গেছে লেনিন্সাদ। ছয়-শো-ফুট! এই গভীরতায় কি করে টিকে আছে সাবমেরিনটা, ভেবে অবাকই লাগল রানার। বাইরে, লেনিন্সাদের খোলসে কি প্রচণ্ড চাপ দিচ্ছে পানি ভাবতেই কাঁটা দিয়ে উঠল থা।

ইনবোর্ড ডাইভিং সীটে বসে আছে এক তরুণ নাবিক। দুই হাত মুঠিবদ্ধ। এতই জোরে মুঠো করেছে, তালু কুঁড়ে নখ বের করে আনতে চাইছে যেন উণ্টো পিঠ দিয়ে। গলার কাছে সপদপ করে লাফাচ্ছে একটা শিরা।

নেমেই চলেছে লেনিন্সাদ।

সাতশো ফুট!

সাতশো সাতশো ফুট!

আটশো ফুট! এতটা গভীরতায় কোন সাবমেরিন নেমে টিকে গেছে, শোনেনি কখনও রানা। শোনেনি এমন কি কমান্ডার রাইকভও।

'নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করলাম আমরা, ডাক্তার,' পাশে দাঁড়ানো রানাকে উদ্দেশ্য করে বললেন রাইকভ। শান্ত কণ্ঠস্বর। সামান্যতম উত্তেজনা নেই।

'নামা বন্ধ হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হবে, শিগগিরই। জোর চেষ্টা চালাচ্ছে বাতাস,' কিন্তু নিজের কথায় ভরসা পাবেন না কমান্ডার, তার আচরণ দেখেই বুঝল রানা। ডান হাতের বুড়ো আঙুলের নখ দিয়ে দাঁতে টোকা মারছেন আস্তে আস্তে। কমান্ডার রাইকভের মত মানুষের জন্যে এর অর্থ, ভয়ানক অস্থিরতা বোধ করছেন তিনি ভেতর ভেতর।

কিন্তু লেনিন্সাদের নিচে নামা থামছে না। 'ভিজেল ট্যাংক খালি করে দাও। খাবার পানির ট্যাংক খালি করো।' হঠাৎ হুকুম দিলেন কমান্ডার। বন্দর থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে এই রকম একটা জায়গায় জ্বালানি আর পানি ফেলে দেবার পরিণতি কি, আপাতত ভাবার সময় নেই রাইকভের। তার এই মুহূর্তের একমাত্র চিন্তা, হালকা করতে হবে, যে করেই হোক নিয়ুগতি বন্ধ করতে হবে সাবমেরিনের, যে ক্ষেত্রে হোক ভানিয়ে তুলতে হবে এটিকে। তেল আর খাবারের চিন্তা বেঁচে থাকলে পরে করা যাবে।

'মেইন ব্যালান্ট ট্যাংক খালি!' জানাল ডাইভিং অফিসার। চাপা উত্তেজনায় কণ্ঠ শোনা গলার স্বর।

বাতাসের গর্জন পঁচাত্তর তাপ কমে গেছে। হঠাৎ এই আওয়াজ কমে যাওয়ায়

ঘনটা দমে যেতে চাইল রানার; কেন যেন মনে হলো, দম ফুরিয়ে এসেছে লেনিন্সাদের, ছেড়ে দিয়েছে হাল।

রানার একপাশে দাঁড়িয়ে রুস্তভ। তার বা হাতের আঙুল থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরছে, দেখল রানা। কিন্তু খেয়াল নেই রুস্তভের। দুটো আঙুলের বোকায়াদারকম ফুলে ওঠা দেখে অনুমান করল রানা, কেটে তো গেছেই ভেঙেও গেছে ও দুটো।

নামছেই লেনিনগাদ। আর রক্ষা পারে না সারমেরিন, বুঝল রানা। ফটা বাজল এই সময়। হোঁ মেরে মাইক্রোফোন তুলে নিলেন কমান্ডার, একটা বোতাম টিপলেন।

‘ইঞ্জিন রুম স্পীকিং,’ ধাতব কন্ঠ ভেসে এল। ‘ইঞ্জিনের গতি কমাতে হবে। মেইন বোয়ালিং থেকে ধোঁয়া উঠছে। যেকোন মুহূর্তে সীজ করতে পারে।’

‘এক বিন্দু কমাতে না!’ কড়া নির্দেশ দিয়ে মাইক্রোফোন নামিয়ে রাখলেন রাইকভ।

‘আরিস্থাপ, আরিস্থাপ!’ কাঁপা কাঁপা গলায় বিড় বিড় করে উঠল তরুণ সীমান। চেয়ে দেখল রানা, ওর গলার শিরটা সাংঘাতিক ফুলে উঠেছে। টামড়া ভেদ করে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে যেন।

এগিয়ে গিয়ে তার কাঁধে হাত রাখলেন কমান্ডার। শান্ত মিষ্টি গলায় প্রবোধ দিলেন, ‘ভাবনার কিছু নেই, খোকা। সব ঠিক হয়ে যাবে।’

কমান্ডার যখন বলেছেন, সত্যিই সব ঠিক হয়ে যাবে, নিশ্চিত হলো সীমান। ভাবনা অনেকখানি কমে গেল ওর। আশ্চর্য! গলার কাছের শিরটীর মদনপানিও কমে এসেছে। রাইকভকে মনের মধ্যে কোন আসনে বসিয়েছে এই লোকগুলো, ভেবে চমকিত হলো রানা।

‘আর কতক্ষণ সইতে পারবে লেনিনগাদ?’ কমান্ডার ফিরে আসতেই তাঁকে জিজ্ঞেস করল রানা। নিজের গলার স্বরে কোলাহালের ঘড়ঘড়ানি শ্রনে নিজেই অবাক হলো।

‘অনিশ্চিত অবস্থায় আছি আমরা, ডাক্তার,’ শান্তকণ্ঠে স্বীকার করলেন কমান্ডার। ‘হাজার ফুটেরও বেশি নেমে এসেছে, কই, এখনও তো কিছু ঘটছে না। কয়েক লাফ টন চাপ পড়ছে এখন লেনিন্সাদের গায়ে।’

দান্য দেশ বুজে এই লোকটিকে বের করে এনেছে রাশান নেভি, মনে মনে অনুমান করল রানা। আরও একজন নাবিকের সঙ্গে আপটই পরিচিত না হলে কমান্ডার রাইকভকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নাবিক বলে মেনে নিতে দ্বিধা করত না রানা। ঠিক এমনি শান্ত, এমনি স্থির, এমনি হানিশুণি আরেকজন নাবিকের কথা অনেকদিন পর আজ মনে পড়ল ওর। পাকিস্তানী এক কমান্ডার, কমান্ডার জুলফিকার। তিনি কি বেচে আছেন আজও? সেই যে রত্নবীণ অভিযানের—

‘দ্রো হচ্ছে নামা,’ রুস্তভের কন্ঠায় চিত্তার খেঁচা মাখাল রানা।

‘হ্যাঁ দ্রো হচ্ছে,’ সায় নিলেন কমান্ডার।

কিন্তু যা আশা করছে, ততটা দ্রুত খামল না লেনিনগাদ। শৈব মুহূর্তে তাঁরে এলে তম্বা ডুববে না তো? ভাবল রানা। আর কত চাপ সইতে পারবে

সারমেরিনটা? যদি না সইতে পারে, শেষটা কেমন হবে জানতে ইচ্ছে করছে রানার। কিন্তু জানে সে, যদি তেমনিটি ঘটেও, কোনদিনই জানতে পারবে না সে। তার আগেই চিড়ে-চ্যপ্টা হয়ে যাবে। এই গভীরতার প্রতি বর্গ ফুটে বিশ টনের মত হবে পানির চাপ।

আবার বাজল কন্ঠ। ‘মাইক্রোফোন তুলে বোতাম টিপলেন কমান্ডার। ধাতব কন্ঠটা ভেসে এল আবার। ‘আর্ডনাদের মত শোশাল এখানে কমান্ডার, ‘ইঞ্জিনের গতি অবশ্যই কমাতে হবে এবার, ক্যাপ্টেন। লাল হয়ে গেছে টার্নিং গিয়ার।’

‘সাদা হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো, তারপর জানিয়ে আমাকে।’ আবারও কন্ঠা আদেশ দিয়ে মাইক্রোফোন রেখে দিলেন কমান্ডার। ‘ইঞ্জিন ডাক্তার আগে পর্যন্ত ডাক্তারে রাজি নন রাইকভ। ইঞ্জিনের কমতা নিয়েই শক্তি বার করে আনছেন তিনি। লেনিনগাদকে বাচাতেই হবে।’

আবার বেল বাজল। মাইক্রোফোন তুললেন কমান্ডার।

‘জুজ মেন ডেক স্পীকিং,’ উচ্চস্বরের কর্শ একটা কন্ঠ বাজল সাউন্ডবক্সে, ‘পানি আসতে শুরু করেছে।’

কমান্ডার ছাড়া কন্ঠোল্লসের প্রতিটি লোকের চোখ ওপর দিকে উঠে গেল, চাইল সাউন্ডবক্সের দিকে। চাপের প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। পরাস্ত হতে চলেছে লেনিনগাদের খোলস। ছোট্ট একটা ফাটল হবে প্রথমে, তারপর বেড়ে গিয়ে বিকটি আকার ধারণ করবে সেই ফাটল। তারপর চোখের পলকে পিঠ-পেট এক হয়ে মিশে যাবে লেনিনগাদের।

‘কোথায়?’ জিজ্ঞেস করলেন কমান্ডার।

‘স্টারবোর্ড বাকহেড।’

‘কতটা?’

‘দুই পাইন্ট মত হবে। সফ গারায় গড়িয়ে আসছে বাকহেড থেকে। ধারটি মোটা হচ্ছে। ক্রমেই মোটা হচ্ছে, ক্যাপ্টেন! কি করব আমরা?’

‘কি করবে, বলে দিতে হবে আমাকে?’ যেন শিথকে বোঝাচ্ছেন কমান্ডার, ‘ন্যাকড়া দিয়ে মুছে নাও। ভেজা নোংরা জাহাজে বাস করতে চাও না নিশ্চয়ই?’ মাইক্রোফোন রেখে দিলেন তিনি।

‘থমে গেছে, থমে গেছে।’ লাউডস্পীকারে চিৎকার ভেসে এল সোনার কম থেকে। আবার একজোড়া ছাড়া প্রতিটি চোখ উঠে গেল ওপর দিকে।

ঘরের কেউ কোন কথা বলছে না। রুস্তভের ভাড়া আঙুল থেকে এখনও রক্ত ঝরছে।

এই প্রথম রাইকভের কপালে অতি সুস্থ ঘাম চকচক করতে দেখল বলে মনে হলো রানার। পায়ের তলায় এখনও থর থর করে কাঁপছে ধাতব মেঝে। দানবীয় ইঞ্জিন আর প্রপেলার লেনিনগাদকে তুলে আনছে অস্ফুট মৃত্যুর কবল থেকে। এখনও বাতাসের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, ডিগেল আর পানি বের করে দিচ্ছে।

আরও নব্বই সেকেন্ড পেঁচিয়ে গেল। কিন্তু রানার মনে হলো নব্বইটা বছর পেঁচিয়ে গেছে। ডাক্তার ডাইভিং অফিসারের স্নেহধা শোনা গেল, ‘দল ফুট। ওপরে উঠছে।’

‘ঠিক তো?’ জিজ্ঞেস করলেন রাইকভ।

‘ঠিক, ক্যাপ্টেন।’

কিন্তু বেশি খুশি হয়ো না। এখনও বিপদ কাটেনি। পানির চাপের কাছে এখনও হার মানতে পারে লেনিনগ্ৰাদ। ‘বিপদের মুখে সবাইকে সাহস যুগিয়েছিলেন কমান্ডার। এখন বিপদ কাটিছে বুঝে তার গুরুত্ব জানাতে চাইছেন।

‘এখনও উঠছে,’ আবার বলল অফিসার।

‘পানি কতটা আছে আর?’

‘তিরিশ ডাগ।’

‘পানির ট্যাংকে বাতাস ঢোকানো বন্ধ করো। ইঞ্জিনের গতি তিন ভাগের একভাগ কমিয়ে আনো।’

বাতাসের শব্দ আরও অধিক কম গেল। পায়ের নিচে কমল কাঁপুনিও।

‘একশো ফুট উঠেছে,’ জানাল ডাইভিং অফিসার।

‘জিজ্ঞেস ট্যাংকে বাতাস ঢোকানো বন্ধ করো,’ চকুম দিলেন রাইকভ।

‘এখনও উঠছে, উঠছে।’

পকেট থেকে নিজের কমাল বের করে কপাল আর ঘাড়ে বুলালেন কমান্ডার। অনুমান ভুল হয়নি, বুঝল রানা। কমালটা আবার পকেটে রেখে দিয়ে মাইক্রোফোন তুলে নিলেন রাইকভ। কয়েকটা বোতাম টিপে কথা বললেন। সমস্ত জাহাজে বেজে উঠল তাঁর গভীর কন্ঠস্বর, ‘ক্যাপ্টেন বলছি। বিপদ কাটিয়ে উঠেছি আমরা। ইতিমধ্যেই তিনশো ফুট উঠে এসেছে লেনিনগ্ৰাদ। আর ভয়ের কারণ নেই।’

লাউডস্পীকারে একটা কণ্ঠ শোনা গেল, ‘জীবনে সিগারেট খাইনি আমি। এখন থেকে শুরু করতে চাই। কেউ একটা সিগারেট দেবে আমাকে?’ হাসির ঢলোড় শোনা গেল। সুইচ অফ করে দিলেন কমান্ডার।

‘দেশে ফিরে প্রথমেই কি করব আমি, জানেন কমান্ডার?’ বলল রুস্তভ।

‘জানি। সোজা মস্কোয় চলে যাবে। তারপর লেনিনগ্ৰাদকে যারা তৈরি করেছে, সবাইকে ডেকে এনে, তাদের সম্মানে এক বিরাট ভোজ দেবে। কিন্তু বেনটা হতে দিচ্ছি না আমি, লেকটেন্যান্ট। কারণ, কথাটা তোমার আগে আমি ভেবেছি,’ বলতে বলতেই রুস্তভের হাতের দিকে নজর গেল তাঁর। ‘তীক্ষ্ণ কর্ণে জিজ্ঞেস করলেন, ‘তোমার হাতে কি হয়েছে, ইউরি?’

অবাক হয়ে নিজের হাতের দিকে তাকাল রুস্তভ। ‘জানি না তো! এই প্রথম খেয়াল করলাম। হ্যাঁ, বাধাও তো করছে। টর্পেডো রুমের দরজা খুলতে গিয়ে হয়েছে হয়তো।’ রানার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, ‘দেখুন তো ডাক্তার, ভেঙেই গেছে কিনা?’

‘চমৎকার দেখিয়েছে, ইউরি,’ প্রশংসা করলেন রাইকভ। ‘টর্পেডো রুমে বাতাসের দরজা বন্ধ করার ব্যাপারটা বলছি।’

‘আমাকে নয়, এনাকে,’ রানাকে দেখিয়ে বলল রুস্তভ, ‘মনাবাদ দিতে হলে এনাকে দিন। কৃতিত্ব ঐরই বেশি।’

‘খান্ন ইউ, ডক্টর,’ রানার দিকে চেয়ে বললেন কমান্ডার। ‘তারপর আবার রুস্তভের দিকে ফিরে বললেন, ‘আমাকেও তোমাদের মনাবাদ দেয়া উচিত, ইউরি।’

কাল রাতেই তো টর্পেডো ভরতে চেয়েছিলে। ভাসছিল তখন লেনিনগ্ৰাদ, ওপরের ঘাটও খোলা ছিল। তখন যদি ডুব দিত, কি হত তাহলে?’

কথাটা মনে হতেই রানার শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা ভয়ের একটা স্রোত শির শির করে নেনে গেল।

‘বাপুস, তাইতো,’ চমকে উঠে বলল রুস্তভ। ‘তারপর কি মনে পড়ে যেতেই বলল, ‘আরে ভুলেই গিয়েছিলাম। বুলিন—আহত হয়ে পড়ে আছে বুলিন। তার হাঁশ ফিরেছে কিনা দেখতে হয়।’

‘দরকার নেই, লেকটেন্যান্ট,’ বলল রানা। ‘ওর হাঁশ ফিরবে না আর কোনদিন।’

‘মানে?’

‘দরজার বাড়িতে মাথা ঝুঁড়িয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেছে বুলিন।’

‘বুলিন!’ ফিসফিসিয়ে বললেন কমান্ডার, ‘পুয়ের কিড! লেনিনগ্ৰাদে প্রথমবার চড়েছিল বোচারা, আর কোনদিন বাড়ি ফিরে যেতে পারবে না। সত্যিই মারা গেছে, ডাক্তার?’

‘খুন হয়েছে,’ নিচু গলায় বলল রানা।

‘হোয়াট?’ রানার বাহ বামচে ধরলেন কমান্ডার। ‘কি বলছেন আপনি, ডাক্তার?’

‘ঠিকই বলছি। খুন করা হয়েছে বুলিনকে।’ শ্রায় ফিসফিসে রানার কণ্ঠ।

দীর্ঘ তিন সেকেন্ড স্থির দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকিয়ে বইলেন কমান্ডার। মুখের ভাবে কোন পরিবর্তন নেই, কিন্তু সহসাই হাল ছেড়ে দিয়েছে যেন চোখ দুটো। ত্রাত, বুড়ো হয়ে গেছে বেন ওদুটো, হঠাৎই। রানার হাত ছেড়ে দিয়ে চরকির মত পাক বেয়ে ঘুরলেন কমান্ডার। চলতে চলতে ডাক দিলেন, ‘আসুন ডাক্তার। আমার কেবিনে ইউরির ভাঙা আঙুলে ব্যাডেল বাধবেন।’

তিন

‘আশা করি কথাটার গুরুত্ব বুঝতে পারছেন?’ জিজ্ঞেস করলেন লিউ রাইকভ, ‘কাউকে অভিযুক্ত করার আগে—’

‘কাউকে অভিযুক্ত করছি না আমি, কমান্ডার,’ বাধা দিয়ে বলল রানা। ‘আমি শুধু বলছি, লোকটাকে খুন করা হয়েছে। ওই বো-কাপ ডোরটা যে খুলে রেখেছে, খুনের জন্যে দায়ী সে-ই।’

‘দরজাটা খুলে রেখেছে? কি বোঝাতে চাইছেন? কে বলল দরজা খোলা ছিল? আসলে কোন কারণে খুলে গেছে ওটা। আর আপনার কথা মেনে নিলেও, দরজা খোলা রাখার মানেই মানুষ খুন নয়।’

‘কমান্ডার রাইকভ,’ গভীর হয়ে গেছে রানা, ‘জীবনে যে দু’জন সুখখাড়া নাবিকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে আমার, আপনি তাদের একজন। কিন্তু তার মানে

এই নয়, সব কিছুতেই পারদর্শী আপনি। যুদ্ধ এক জিনিষ, আর বুঝারাবি অন্য জিনিষ। কোন কারণে দরজা খুলে গেছে বলছেন, জানতে পারি, কি কারণ নেটা?

'কয়েকবার বরফের পাহাড়ে থাকা দেখেছে লেনিনগ্রাদ,' ধীরে ধীরে কথা বলছেন লিউকভ, 'প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে খুলে যেতে পারে দরজা। তখন হয়তো কোন বরফের টুকরো...'

'অসম্ভব। ভেবে দেখুন, এটা অসম্ভব।'

'তা ঠিক। ওভাবে বরফের টুকরোর আটকে যাওয়া অসম্ভব।'

'তাহাড়া, সেফটি লাইট শো করেছে: দরজা বন্ধ ছিল।'

'হয়তো অতি সামান্য ফাঁক হয়ে ছিল দরজা, যার ফলে সেফটি কন্ট্রোল বিচ্ছিন্ন হয়নি।'

'সামান্য ফাঁক! হাইড্রো-ইলেকট্রিক প্র্যাক্টে টারবাইন রেডে কি ভয়ঙ্কর জোরে আঘাত হানে পানির ফোয়ারা, দেখেছেন নিশ্চয়? পানির তত্ত্ব তার চেয়েও জোরে আঘাত হেনেছে বুলিনের দেহে।' রাইকভের চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'সামান্যিক ভাবে কি করে খোলা হয় বো-ক্যাপ?'

'দু'ভাবে। এক, হাইড্রলিক রিমোট কন্ট্রলের সাহায্যে, ওখ একটা বোতাম টিপতে হবে। দুই, হাতল চাপতে হবে, টর্পেডো ক্রমেই আছে হাতল।'

রুস্তভের দিকে ফিরে চাইল রানা। তার পাশেই বসে আছে। মুখচোখ ঢুকনো, ভাঙা আঙুলের বাধায় নিশ্চয়ই। তাকে জিজ্ঞেস করল রানা, 'হাতলটা কি আটকানো ছিল?'

'ছিল। প্রথমেই তো দেখে নিলাম।'

'আপনারা কেউ পছন্দ করছে না, কমান্ডার,' গম্ভীরকণ্ঠে বলল রানা, 'অথবা লেনিনগ্রাদকে পছন্দ করছে না কেউ। কিংবা নভেলিতে আহতদের উদ্ধার করতে যাচ্ছি আমরা, এটা পছন্দ হচ্ছে না কারও। মনে পড়ে, লেনিনগ্রাদের ট্রিম আডজাস্ট করতে হয়নি বলে অবাক হয়েছিলেন?'

'বলে যান, ওনছি,' শান্ত কণ্ঠে বললেন কমান্ডার। পানি ট্যাংকে ফিরে যাবার শব্দ উঠল। একদিকের ছুফ সামান্য উঠু করলেন কমান্ডার, শব্দ ওনছেন। দু'পো ফুট শো করছে রিপটার গজ। লেনিনগ্রাদের নাক এখনও নিচের দিকে পঁচিশ ডিগ্রী কোণ করে আছে।

'ট্রিম ঠিক করতে হয়নি, কারণ, কয়েকটা টিউব পানিতে ভরে ছিল,' আবার বলল রানা। 'তিন নম্বর টিউব, যেটা আমরা পরীক্ষা করে ঠিকই পেয়েছিলাম, সেটা বাদে আমার মনে হয় সব ক'টাই পানিতে ভরে গেছে। আমাদের এই অতি চান্নাক বন্ধুটি বো-ক্যাপ খুঁজে রেখেছে, লিভার ডিসকানেট কার রেখেছে, জাংগন বক্সে কিছু তারের কাজ করেছে, যার ফলে সিগন্যাল লাইট জ্বলেছে উল্টো। কাজ জানা লোকের জানে এমন কিছু করিনি না। সেরে নিয়া দেবোতে পারেন আমার কথা ঠিক কিনা। আমি নিশ্চিত, গালা, দ্রুত শুকোর এমন বাঁ ফিশবা টিউইং গাম জাতীয় কিছু দিয়ে টেস্ট-ককের ইনলেট ব্লক করে দেয়া হয়েছে। ফলে, টেস্ট কক খুলে পরীক্ষার সময় পানি হেসন বেরোয়নি। বুলিন মনে করেই ওকনোই আছে টিউব।'

'হ্যা, চার নম্বর টিউবের টেস্ট কক দিয়ে পানি চৌম্ব্বাত দেখেছে বুলিন,' বলল

রুস্তভ।

'সম্ভবত নিচু-জাতের টিউইং গাম,' বলল রানা।

'ওঘোরের বাচ্চা,' শান্ত কণ্ঠে কমান্ডারের। কিন্তু এমন ভাবে উচ্চারণ করলেন শব্দ দুটো, রাজখাই গলার প্রচণ্ড বিক্ষোভেও কেউ এত সুন্দরভাবে ভেতরের অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে পারত না। 'সবাই খুন হয়ে যেতে পারতাম আমরা।'

'সেটা চায়নি খুনী,' বলল রানা, 'কাউকেই খুন করতে চায়নি সে। সেই যে নন্দ্যার লেনিনগ্রাদের ট্রিম চেক করতে সামান্য সময়ের জন্যে ডুবতে চেয়েছিলেন, তুনের জানিয়েছিলেন এটা?'

'জানিয়েছিলাম।'

'তাহলে আমাদের বন্ধুটিও জেনেছে সহজেই। সে এ-ও জেনেছে, অল্প পানিতে কিংবা পানির সমতলের সামান্য নিচে পরীক্ষা চালানো হবে। কাজেই কামলা করে টিউবগুলো ভরে দিতে চেয়েছে সে। আশা করেছে আরও আগেই টিউবে টর্পেডো ভরা হবে। তখন পানির ভারে তলিয়ে যাবে ডুবোজাহাজ। অগতীর পানিতে সাগরের তলায় গিয়ে চুপটি করে বসে থাকবে। তিরিশ-পঁয়তরিশ বছর আগে ইলে, বাপাখটা মারাত্মক হত। কারণ তখন জাহাজের ভেতরে পরিষ্কার বাতাস থাকত সামান্য। কিন্তু আজকের দিনে, লেনিনগ্রাদের মত আধুনিক সাবমেরিনে কোন চিন্তাই নেই। বাতাস পরিশোধন করার যন্ত্র আছে জাহাজে। স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে ভেতরের বাতাস। মাসের পর মাস বসে থাকলেও অক্সিজেনের অভাবে মারা যাবে না এর ভেতরের কেউ। জাহাজ তলিয়ে গেলে জরুরী বয়টা ওখ ডানিয়ে দেবেন। নাভাল-বেসে জানিয়ে দেবেন সংবাদটা। এরপর আর কিছু করার নেই আপনার, বসে বসে কফি খেতে পারেন। নেভীর ডুবুরীরা নেমে এসে বো-ক্যাপটা বদলে দেবে, টর্পেডো ক্রমের পানি পাম্পের সাহায্যে বের করে দেবে। বাস, আবার তেঁসে উঠবে সাবমেরিন। তার মানে বোঝাই যাচ্ছে আমাদের মারতে চায়নি বন্ধুটি, ওখ দেরি করিয়ে দিতে চেয়েছিল।'

'কিন্তু আমাদের দেরি করিয়ে দিয়ে কার কি লাভ?' জানতে চাইলেন কমান্ডার। চেহারা কোন ভাবান্তর নেই, ওখ চোখ দুটো বিশ্বাসঘাতকতা করছে তাঁর সঙ্গে।

'সেটা আমি জানি, একথা ভাবছেন কেন?'

'না, না, ঠিক তা বলতে চাইনি,' রানার কণ্ঠে অস্বস্তি টের পেয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন কমান্ডার। 'আমি জানতে চাইছি... মানে... লেনিনগ্রাদের কাউকে সন্দেহ হয় আপনার?'

'এর উত্তর, নিশ্চয়ই আমার মুখ থেকে শোনার দরকার নেই আপনার।'

'বোধ হয়,' শব্দ করে শ্বাস ফেললেন কমান্ডার, 'মেক সাগরের তলায় ডুবে আত্মহত্যা করাটা মজার নয় মোটেই। সাবমেরিনের ভেতরের কাউকে তাই সন্দেহ করা যাচ্ছে না। কারণ আমাদের সৃষ্টি সঙ্গে তাকেও মরতে হত তাহলে। বাকি বইল একইঘাড়ের ওয়াকারের। কিন্তু ওখানকার প্রতিটি লোকের উপ-গ্রেড সিকিউরিটি ক্রিয়াক্ষেপ আছে।'

'সিকিউরিটি ক্রিয়াক্ষেপের ওপর আজকের দিনে কেউ আর কোন ভরসা করে

না। যাকগে সেসব। অফসে ভেবে সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না। টর্পেডো ক্রমের ব্যাপারে কি করতে চান এখন তাই বলুন।

সাধারণ পরিস্থিতিতে তেমন কোন কঠিন কাজ হয় না। চার নম্বর বো-কাপাটা অটোকে দিয়ে পাটম্পের সাহায্যে পানি বের করে নেয়ার ব্যবস্থা করতাম। তারপর টর্পেডো ক্রমে ঢুকে চার নম্বরের পেছনের দরজাটা বন্ধ করে দিলেই সমস্যার সমাধান। কিন্তু এখনও বো-কাপ ডোরটাই বন্ধ করা যাচ্ছে না। নিভার কাজ করছে না, রিমোট কন্ট্রোল বাটন নিরিয় করে দেয়া হয়েছে। ঠিক করা যাবে না।

‘তাহলে?’ কমান্ডারের উদ্দেশ্য জানতে চায় রানা।

‘ভেসে উঠতে পারি। তারপর ডুবুরী পাঠিয়ে দেখতে পারি কি করতে পারে। কিন্তু এই পানিতে তাদেরকে মরণের মুখে ঠেলে দেয়ারই শামিল হবে সেটা। কাউকে মরার আদেশ দিতে পারি না আমি। সুতরাং এই অবস্থায়ই আইস কাপের নিচ থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। কিন্তু আবার ফিরে আসতে আসতে টেশন নভেলিগ হতভাগাদের জন্যে খুবই দেরি হয়ে যাবে।’

‘লেনিনগাদে চড়ার প্রথম দিনেই বলেছিলাম আপনাকে ক্যাপ্টেন,’ বলল রানা, ‘চরম পরিবেশে মানুষের শরীরে ঠিক কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়, আমি তার ওপর রিসার্চ করছি। এতদিনে আরেকটা সুযোগ পাওয়া গেছে। হাতছাড়া করতে চাই না।’

‘মানে?’

‘মানেটা অবশ্যই বুঝতে পারছেন,’ শান্ত কণ্ঠে বলল রানা, ‘আফটার কলিশন বাক্সহেডের দরজায় ড্রিল দিয়ে ছেদা করতে হবে, তাতে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ঢোকাতে হবে হাই-প্রেসার হোস পাইপের ধাতব নুখ, দরজা সামান্য ফাঁক করে দুটো কলিশন বাক্সহেডের মাঝে বেঁধোতে হবে কাউকে। হোস পাইপের সাহায্যে ভেতরে বাতাসের চাপ সৃষ্টি করতে হবে। টর্পেডো ক্রম আর বাক্সহেডের ভেতরের চাপ সমান হয়ে গেলে আর কোন সমস্যা নেই। সামান্য ধাক্কায়েই দরজা খুলে যাবে। টর্পেডো ক্রমে ঢুকতে আর কোন অসুবিধে থাকবে না। বাস, এবার চার নম্বর দরজাটা বন্ধ করে দিলেই কাজ খতম।’

‘কিন্তু সে কাজে আপনি যাবেন কেন? উচ্চ চাপ সহিবার ট্রেনিং আছে লেনিনগাদের প্রতিটি লোকের। তাদের মধ্যে কয়েকজনের আপনার চেয়ে বয়েস অনেক কম, গায়ের জোরও বেশি।’

‘চাপ সহিবার ক্ষমতা অলাদা জিনিস। ট্রেনিং আর প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতার মধ্যে পার্থক্য অনেক। বহু শক্তিশালী, বিশাল দেহী নভোজোয়ানকে দেখেছি, আসল বিপদে মাথা ঠিক রাখতে পারে না। অতিশ্রিত হয়ে উন্মোচনকারী কাজ করে বসে।’

‘কিন্তু সাবমেরিনের লোক থাকতে একজন সিভিলিয়ানকে এই কাজের তার দিয়েছি জানলে মন্থো কি বলবেন আমার?’

‘যেহে মেননিন ক্রাজেট বর, ক্যাপ্টেন থেকে লেনিনগাদে নামিয়ে আনবে আপনাকে কণ্ট্রোল। আর যদি জানে তারী-অবশী জ্ঞানকে, একজন একগায়ে জাহাজে থাকতেও নিজের জেদ বজায় রাখার জন্যে লেনিনগাদে এক। তার জ্ঞানের

জীবন বিপন্ন করেছেন, তাহলে আপনার কোর্ট-মার্শাল হওয়াও বিচিত্র নয়।’

মলিন হাসি হাসলেন কমান্ডার রাইকভ। দ্বিধাবিহীন দৃষ্টিতে ক্রান্তভের দিকে তাকালেন, ‘তুমি কি বলো, ইউরি?’

‘ভা, রানার অনেক গুণের পরিচয় পেয়েছি আমি ইতিমধ্যেই,’ বলল ক্রান্তভ। ‘তার নার্ভ মে খুবই শক্ত এ ব্যাপারে সার্টিফিকেট দিতে আমার কোন আপত্তি নেই।’

‘স্থান ডাক্তার এত বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ হয়, এর আগে দেখিনি কখনও,’ স্বীকার কলেনন মাইকভ। ‘ঠিক আছে, ডাক্তার রানা, আপনার প্রস্তাব মেনে নিচ্ছি আমি। কিন্তু একটা শর্ত আছে। আমার একজন লোক থাকছে আপনার সঙ্গে।’

‘ঠিক বুশি হতে পারল না রানা, কিন্তু অংশিও হলো না।’

‘যা ভেবেছিল, তার চেয়ে সহজেই কাজ উদ্ধার হয়ে গেল। ধীরে ধীরে অতি সাবধানে ওপরে তোলা হলো সাবমেরিনকে। তার পেছনটা এসে খামল বরফের কয়েক ফুট নিচে। যতটা সম্ভব, টর্পেডো ক্রমের পানির চাপ কমিয়ে আনা হলো এভাবে। কিন্তু নিচের দিকে কোণ করেই আছে লেনিনগাদের নাক, বরফের প্রায় একশো ফুট তলায় আছে এখনও নাকটা।’

বাক্সহেডের দরজায় একটা ছিদ্র করা হলো। হোস পাইপের ধাতব নুখ ঢুকিয়ে দেয়া হলো ছিদ্র পথে। বাবায়ের বিশেষ স্যুটের ওপর আ্যাকোয়ালাঙ পরে দুই বাক্সহেডের মাঝের ফাঁকা জায়গায় গিয়ে ঢুকল রানা। তার সঙ্গী হলো একজন অল্প বয়েসী টর্পেডোম্যান, ইয়েভজেনি টাবু। বন্ধ পরিসরে হিসিয়ে উঠল উচ্চ-চাপের বাতাস। ধীরে ধীরে বাড়ছে বাতাসের চাপ; বিশ, তিরিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ পাউন্ড প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে। ফুসফুস আর কানের পর্দায় চাপ অনুভব করছে রানা। ব্যথা করছে কানের পেছনটায়। প্রচণ্ড বাতাসের চাপ থেকে খাঁটি অক্সিজেন বুকে টানার ফলে সামান্য বমি বমি ভাব হচ্ছে। জটিল পরিস্থিতি, অনেক কঠিন লোকও ভেঙে পড়ে এই অবস্থায়। ইয়েভজেনির দিকে তাকাল রানা। কোনও ভাবান্তর নেই তার। বুঝতে পারছে রানা, তার মত একই রকম অসুবিধে হচ্ছে টাবুরও, কিন্তু ভালভাবেই গোপন রেখেছে সেটা। এনব ব্যাপারে নিজের সব চেয়ে ভাল লোকটাকেই সঙ্গে দিয়েছেন কমান্ডার।

ধীরে ধীরে বাক্সহেড আর টর্পেডোক্রমে ভেতরের চাপ সমান হয়ে এল। ধাক্কা দিতেই খুলে গেল দরজা। সিল-এর ফুট দু’য়েক ওপরে আছে টর্পেডোক্রমের পানির সমতা। কটকা মেরে পাক খেতে খেতে বাক্সহেডের ভেতরে এসে ঢুকল পানি। ওদিকে প্রচণ্ড গর্জন তুলে টর্পেডোক্রমে গিয়ে ঢুকতে লাগল চাপ চাপ বাতাস। দরজার ফ্রেম ধরে পুরো দশ সেকেন্ড প্রাণপণে নিজেকে পতন রক্ষা করল রানা আর টাবু। তারপর শেষ হলো পানি আর বাতাসের যুদ্ধ। হ্যাঁ হয়ে খুলে গেছে টর্পেডোক্রমের দরজা। বাক্সহেড আর টর্পেডোক্রমের ভেতরে ছড়িয়ে পড়ে পানির উচ্চতা কমেছে কিছুটা। সিল পেরোল রানা আর টাবু, ওয়ানিরকক টর্চ জ্বালান, ডুব দিল পানিতে।

দ্বিজিৎ পয়েন্টের চার ডিগ্রী কম পানির তাপ। বিশেষ রাবার স্যুট তৈরিই হয়েছে মোহকে চাঁড়ায় করল থেকে ঢকর জলো। কিন্তু বরফ-শীতল পানিতে জ্বলে বাবার যোগাড় হলো দু’জনের দেহ। হুঁদিং-অ্যাপারেলস-এর ভেতরের দ্বীপ

ফেলতে কষ্ট হচ্ছে দু'জনেরই।

আধা-সাতরে আধা-ইটে ঘরের সামনের প্রান্তে চলে এল রানা। চার নম্বর টিউবের দরজা খুলে বের করল। বন্ধ করার আগে প্রেশারককের ভেতর দিকটা দেখে নিল একবার। দরজাটার কোন ক্ষতি হয়নি। পানির ভয়ঙ্কর চাপে কড়া থেকে খসে পড়ে যেত, কিন্তু হতভাগা বুলিনের দেহ চোটে আটকেছে, ফলে ঠিকই রয়ে গেছে দরজা। টাবুর সহায়তায় লেভারটা জায়গামত আটকে দিল রানা।

কলিশন কম্পার্টমেন্টে আবার ফিরে এল দু'জনে। দরজায় টোকা দিল রানা। আগে থেকেই ঠিক করে রাখা সঙ্কেত। সঙ্গে সঙ্গেই গর্জ উঠল হাইস্পিড পাম্প। বাইরে বের করে দিচ্ছে পানি। দ্রুত কমে যেতে লাগল পানির উচ্চতা। ওদিকে হোস পাইপ দিয়ে বাতাসও বের করে নেয়া হচ্ছে। পানি যতই বেরিয়ে যাচ্ছে, সোজা হচ্ছে লেনিনগ্রাদের নাক। বন্ধ পরিসরে দাঁড়িয়েই পরিহার টের পাচ্ছে রানা। পানি সিলের নিচে নেমে যেতেই আবার দরজায় টোকা দিল। দরজা খোলার সঙ্কেত।

কয়েক মিনিট পর আবার সুটে খুলছে রানা।

'কোন গোলমাল?' জিজ্ঞেস করলেন কমান্ডার রাইকভ।

'না। শুধী লোক ইয়েডজেনি।'

'খুবই কাজের। অসংখ্য ধন্যবাদ, ডক্টর।' গলা স্বাদে নামালেন কমান্ডার, 'আপনি নিশ্চয়...'

'দেখছি,' ঘাড় নেড়ে বলল রানা। 'গালা, চিউইং গাম কিংবা রং নয়। আঠা, কমান্ডার। পণ্ড চামড়া থেকে তৈরি সিরিশ আঠা। খুব কাজের জিনিস। ওই আঠা দিয়েই বন্ধ করে দেয়া হয়েছে টেন্ট কক ইনজেক্ট।'

মাথা ব্যাকিয়ে চলে গেলেন কমান্ডার।

পর থর করে কেঁপে উঠল লেনিনগ্রাদ। তিন নম্বর টিউব থেকে বেরিয়ে গেল টর্পেডো। এই একটা টিউবের ওপরই বিশ্বাস রেখেছেন কমান্ডার, আরওলোকে ঘটাননি।

'ওনতে ঠক করো,' পাশে দাঁড়ানো রুস্তভকে বললেন কমান্ডার, 'কখন হিট করল জানাবে। কখন শব্দ ওনতে পাব, তাও জানাবে।'

মাথা ব্যাকিয়ে সায় দিল রুস্তভ। ব্যাডেজ বাধা হাতের তালুতে রাখা স্টপ ওয়াচের দিকে তাকিয়ে আছে। ধীরে ধীরে পৌরিয়ে যাচ্ছে সেকেন্ডগুলো। কতভের চোটে নিঃশব্দে নড়তে দেখছে রানা।

হঠাৎ বলে উঠল রুস্তভ, 'হিট করেছে টর্পেডো।' আরও দুই সেকেন্ড পরে বলল, 'শব্দ ওনতে পাব এবার।'

রুস্তভের 'এবার' শব্দটা উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ধর ধর করে কেঁপে উঠল লেনিনগ্রাদ, প্রচণ্ড শব্দ ওয়েভের দাক্ষায়। বর্দনমান শব্দে আতঁনাদ করে উঠল সাবমেরিন। ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের মত লাগল রানার কাছে, কিন্তুতেই স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছে না।

এক সময় ধীরে ধীরে থেমে এল কম্পন। হাঁপ ছেড়ে বাঁচল সবাই। ব্যাপারটা

লেনিনগ্রাদের সবার কাছেই নতুন। বরফের তলায় এর আগে টর্পেডো ছোড়ার অভিজ্ঞতা নেই কারও। কঠিন বরফ কতটা মারাত্মকভাবে আঘাতের চোট ফিরিয়ে দেবে, কত জোরে আঘাত হানবে শব্দ ওয়েভ, জানা ছিল না কারও। এখন জানল, এবং এখনও সবাই বেঁচে আছে দেখে অবাক হলো।

'চমৎকার,' ধীরে ধীরে কললেন কমান্ডার। 'ঠিক যেমনটি চেয়েছিলাম। বরফের চাঙড়ের কতটা ক্ষতি হয়েছে, জানতে হবে এবার।' আইস মেশিনটার দিকে নির্দেশ করে রুস্তভকে বললেন, 'কিছু সংবাদ শোনাও দেখি আমাদের।'

প্রটিং টেবিলের কাছে এগিয়ে গেল রুস্তভ। চোখ তুলে তাকাল ওসিপভ, 'পাচশো গজ পেরিয়ে এসেছি ইতিমধ্যেই, আরও পাঁচশো গজ যেতে হবে।'

'অন স্টপ,' আদেশ দিলেন রাইকভ। এঞ্জিনের মৃদু কম্পনও থেমে গেল। সাবমেরিনের গতি কমে গেছে, কিন্তু থেমে যায়নি একবারে। আপন গতিতে ভেঙ্গে চলল লেনিনগ্রাদ। 'এভাবেই চলুক। স্পীড দরকার নেই। বিস্ফোরণে কোথায় কি হয়েছে, বরফের ভাঙা চাঙড় কোথায় ভাসছে কে জানে! কুকি নেবার কোন মানেই হয় না।'

'তিনশো গজ ব্যাকি,' ঘোষণা করল ওসিপভ।

'সব পরিহার। চারদিকে সব পরিহার,' রিপোর্ট করল সোনাররুম।

'এখনও পুক বহুখ,' জানাল রুস্তভকে। 'আরে এইতো, পেয়ে গেছি। পাতলা বরফ! পাচ-ছয় ফুট হবে।'

'দুশো গজ আর,' আবার ঘোষণা করল ওসিপভ।

অতি ধীরে সামনে এগোচ্ছে লেনিনগ্রাদ। গতির ভরবেগ আশ্বে আশ্বে ঠেলেছে তাকে। এক সময় থেমে গেল। রাইকভের আদেশ পেয়ে গর্জ উঠল এঞ্জিন। প্রপেলার পানিতে কামড় বসানোর সঙ্গে সঙ্গেই আবার বন্ধ করে দেয়া হলো। এমনি করেই অতি সাবধানে এগিয়ে চলল সাবমেরিন।

'পঞ্চাশ গজ,' বলল ওসিপভ। 'কাছে এসে গেছি।'

'আইস বিডিং?' জানতে চাইলেন রাইকভ।

'যেমন ছিল...পাঁচ ফুট,' জানাল রুস্তভ।

'স্পীড?'

'ওয়ান নট।'

'পজিশন?'

'টাগেট এরিয়ার নিচ দিয়ে যাচ্ছি।'

'আইস মেশিন কি বন্ধ?'

'কিছু না,' শ্রাণ করল রুস্তভকে। রাইকভের দিকে চাইল। এগিয়ে এসে আইস মেশিনের কাগজের ফিতার দিকে তাকালেন রাইকভ। কালো কালিতে বাড়ী লাইনডনো দ্রুত আঁকা হচ্ছে কাগজে।

'অনুত হো!' আপনমনেই বললেন কমান্ডার। 'সাতশো পাউন্ড হাই-প্রেশ আর্মাটিল। নিচর এখনকার বরফ সাংঘাতিক শক্ত। নলই ফুট যত উঠে জায়গাটা ভালমত পরীক্ষা করে দেখতে হবে।' আদেশ দিলেন তিনি, 'ফ্লাডলাইটস অন, টি ভি অন।'

নব্বই ফুট উঠে গেল লেনিনগ্রাদ। একই জায়গায় চক্কর মানান করেছিলেন। কিন্তু লাভ হলো না। অন্ধকার, অল্প পানি। উজ্জ্বল আলো এবং কামেরা, দুটোই অচল। একটানা রিভিং দিয়ে যাচ্ছে আইস মেশিন। চার থেকে ছয় ফুট।

‘আরও খানিক ঘোরাঘুরি করে দেখব?’ জিজ্ঞাসা দৃষ্টিতে কমান্ডারের দিকে তাকান রুস্তভ।

‘লাভ হবে না,’ এদিক-ওদিক মাথা নাড়লেন কমান্ডার। ‘বরফ ফুঁড়ে বেরোনোর চেষ্টা করলে কেমন হয়?’

‘বরফ ফুঁড়ে!’ ভূব কুঁচকে কমান্ডারের দিকে তাকান রুস্তভ। বাইকভের পরিকল্পনাটা রানারও মনঃপুত হলো না। সাংঘাতিক বুদ্ধির কাজ। রুস্তভ বলল, ‘পাঁচ ছয় ফুট বরফ ফুঁড়ে বেরোতে চান? সম্ভব?’

‘জানি না। নতুন নতুন সব বুদ্ধি নিতে হচ্ছে এখানে এসে। ডেরেখিনাম, টর্পেডোর ঘায়ে বরফের মাঝে ছোট্ট হলও একআধটা ফুটো হবে। হলো না। আসলে ওপর দিকে তেমন চাপই সৃষ্টি করতে পারেনি অ্যামাটল। যেটুকু চাপ দিয়েছে, তাতে খানিকটা জায়গার বরফ ছাঁতলা-খরা সিলিংয়ের আন্তরের মত বসে পড়েছে মাত্র। জানি না, হয়তো সুস্থ চিড়ও ধরে থাকতে পারে বরফের ছাদে,’ ওলিপভের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আমাদের পজিশন কি?’

‘এখনও টার্গেট এরিয়াতেই আছি।’

‘উঠতে শুরু করো। বরফের পিঠ না ঠেকা পর্যন্ত থামবে না।’

কতটা ধীরে এবং সাবধানে উঠতে হবে, বলে দিতে হলো না ডাইভিং অফিসারকে। বরফের গায়ে লেনিনগ্রাদের সেইল ঠেকার কোন শব্দই হলো না।

‘এখানেই ধরে রাখো,’ টেলিভিশনের পর্দার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন রাইকভ। সেইলের নিচের দিকের অর্ধেকটা আবহাভাবে দেখা যাচ্ছে। অল্প পানির জন্যে ওপরের অংশটা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। ডাইভিং অফিসারের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালেন কমান্ডার, ‘চাপ দাও, জোরে।’

ব্যালান্ট ট্যাংকে বাতাস ঢোকান তীক্ষ্ণ গর্জন উঠল। কয়েক সেকেন্ড পেরিয়ে গেল, কিছু ঘটল না। তারপর হঠাৎই পিঠে ভারী কঠিন কিছু আঘাতে ধর ধর করে কঁপে উঠল সার্বমেরিন। এক মুহূর্ত পর আবার জোর এক পাক্স। টেলিভিশনের পর্দায় নতুন দৃশ্য ফুটল। বরফের চাঙড়ের দুই দিকের দুটো ধার ক্ষুদ্র সরে গেল দু’পাশে।

হাসি ফুটল ডাইভিং অফিসারের মুখে। কমান্ডারের কুঁচকে ওঠা কপালের ভাঁজ সমান হয়ে গেল। একান-ওকান হয়ে গেছে রুস্তভের হাসি।

‘জলভানের গল্লোয় সার পদার্থ ছিল,’ বললেন কমান্ডার। ‘কোয়টার মাস্টার, ওপরে যাও তো। আবহাওয়ার খবর টিবি কিছু শোনাও আমাদের।’

আবহাওয়া ভাল কি মন্দ জানার জন্যে অপেক্ষা করল না রানা। নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। ওয়ালবার পি.পি.কে-টা বের করে মিল ট্রিফলস থেকে। কিন্তু এবারে আর কারের পোশাকের বিশেষ ফোলস্টার চোকাইল না, ওখানে রাখলে প্রয়োজনের সময় বের করা বড় কঠিন। কারিবি ট্রাউজারের বাইরের পকেটে রাখল সে সস্ত্রটা। চোখের পলকে ওটা বের করে আনতে ফেন কোন অনুবিধে না হয়।

চার

ঠিক দুপুর। কিন্তু বাংলাদেশের রোদ ঝাঁঝী শিমধরা দুপুর নয়। বাড়ির পাশের নজনে গাছে বসে কাক-শালিক খিমোয় না এখানে। এটা বরফের দেশ।

রিজে বেরিয়ে এসেছে রানা। বাংলাদেশে শীতের মেঘ-করা ত্রাহের আকাশে তারা দেরা না গেলে মতটা আলো থাকে ঠিক ততটাই আলো ছড়িয়ে আছে এখন। বাতাসে প্রচণ্ড ঠাণ্ডার সূচনো এখনও আছে, এখনও বিধে হাড়ে-মজ্জায়, তবে আরহাওয়ার উত্তি হয়েছে। গতি হারিয়েছে বাতাস, কিছুটা পিছিয়ে উত্তর-পূরে সরে যাবার তাল করছে। মাঝে মধ্যে হাড় জিরজিরে রোগশীর্ণ ফোকলা বুদ্ধির মত হিসিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে বটো, কিন্তু বিশ মাইলের বেশি গতি বাড়তে পারছে না। মটকা খেয়ে বড় জোর দু’তিন ফুট লাফিয়ে উঠতে পারছে বরফের কণা, কিন্তু জোর নেই। আগের মত চোখ উপড়ে নেবার সামর্থ্য হারিয়েছে। আশাবাজক পরিবর্তন।

মোটামুটি ওরা এগারোজন: রানা, কমান্ডার রাইকভ, ডাক্তার রুস্তভনকো এবং আরও আটজনের দলটা সার্বমেরিন থেকে বেরিয়ে মই বেয়ে নেমে এল বরফের ওপর। আটজনের চারজনের হাতে স্টেচার। হতভাগা স্টেশনের আহতদের লেনিনগ্রাদে বয়ে আনতে হবে।

পূর্ব দিকে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে লেনিনগ্রাদের সার্জলাইটের তীব্র আলো। মেঝের ফালচে আকাশে প্রকাণ্ড দানবের বিশাল সাদা আঙুলের মতই মনে হচ্ছে সাদা আলোর রশ্মিটাকে। পথ হারানোর আশঙ্কা নেই আর এবারে, তাবল রানা। বাতাস নেই, তুষার কণার দাপাদাপি বন্ধ, দশ মাইল দূর থেকেও এই আলো দেখা যাবে এখন।

সাথে মালপত্র তেমন নেই। কাজেই পথ চলতে অনুবিধে হচ্ছে না। আরও কয়েক পা এগিয়ে নিচু একটা বরফের দেয়াল ডিঙাতেই চোখে পড়ল ওগুলো। ড্রিফট আইস স্টেশন নভেলির অবশিষ্ট তিনটে কুঁড়ে—একটা আধপোড়া, এবং পাচটা কালো কুঁড়ের কঙ্কাল। নির্জন, নিঃশব্দ, শুষ্ক।

‘ওগুলোই?’ রানার পাশে সরে এসে কানের কাছে বললেন রাইকভ, ‘নভেলির কঙ্কাল! কী দৃশ্য!’

‘জীবনে এমন দৃশ্য কখনও আর দেখবেন কিনা সন্দেহ,’ বলল রানা।

এদিক-ওকি মাথা দোলালেন কমান্ডার, পা চালালেন। আর একশো গজ দূরে গেল।

সবাইকে নিয়ে একটা অক্ষত কুঁড়ের সামনে এসে দাঁড়াল রানা। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে গেল।

গতবার যখন এসেছিল, তার চেয়ে অল্প ক্রিষ্ট ত্রিগা উত্তাপ বোধোচ্ছন্ন মনের ভেতরে। কিন্তু তার মনে এই নয় যে ঠাণ্ডার তীব্রতা কমেছে। শুধু পানির আর

গ্যাকো জেগে আছে। ঘরের ভেতরে পোড়া তেল, জীবাণু-নাশক ওষুধ, আইয়োডিন, মরফিনের মিশ্র গন্ধ। আরেকটা চমৎকার কিন্তু অদ্ভুত গন্ধ ছড়াচ্ছে বাতাসে। স্টোভে বিশাল এক লোহার পাত্রে ধীরে ধীরে কি যেন নাড়ছে গ্যাকো, গন্ধটা উঠছে সেখান থেকেই।

‘এসে গেছেন,’ দাওয়াত করা অতিথিকে ঠিক সময়ে হাজির হয়ে যেতে দেখলে গৃহকর্তা যেমন খুশি হয়, তেমনি ভাবে রানার দিকে তাকিয়ে কথা বলল গ্যাকো। ‘চমৎকার সময় জ্ঞান! তা আসুন, বসে পড়ুন, মুকগী-মোনাস্ত্রাম তৈরি।’

‘খাবারটা একটু ঠাণ্ডা হতে দাও, গ্যাকো,’ হালকা গলায় রানার হয়ে কথা বললেন কমান্ডার। পিনিনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ‘তোমার পা কেমন আছে, পিনি?’

‘ভাল, ক্যাপ্টেন। প্রাস্টার জড়িয়ে থাকার অস্বস্তিকর বাদ মিলে কমপ্রেস করার আর কিছুই নেই,’ শান্ত কন্ঠে পিনিনের। প্রাস্টার করা ঠাণ্ডা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিল সে। ডাক্তার জ্যাকভের হাতের কাজ চমৎকার। রানার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, ‘তা ডাক্তার সাহেব, পরোতে আর কোন অনুবিধে পড়েননি তো?’

‘পড়েছেন,’ এবারেও রানার হয়ে কথা বললেন রাইকভ। ‘যথেষ্ট অনুবিধে ভোগ করতে হয়েছে তাঁকে। সেকথা যাক,’ স্ট্রোচার বাহকদের দিকে তাকিয়ে ডাকলেন, ‘এমিকে এসো। আগে পিনিনকে তোলো।’ গ্যাকোর দিকে ফিরলেন, ‘গ্যাকো, বাবুর্চিগিরি ফ্যাক্স দাও। মাত্র দু’শো গজ দূরে রয়েছে লেনিনগ্রাদ। সবাই মিলে পৌঁছে যেতে আধ ফটার বেশি লাগবে না।’

পেছনে খস খস শব্দ শুনে ঘুরে দাঁড়াল রানা। ডাক্তার জ্যাকভ কুমারভকে পায়ের ওপর খাড়া করে তোলার চেষ্টা করছে। গভীরতর চেয়েও দুর্বল মনে হচ্ছে কুমারভকে। ব্যাভেজ্ঞ বাধা মুখের ফাঁকফোকড় দিয়ে যেটুকু দেখা যাচ্ছে, তাতেই অনুমান করে নিতে কষ্ট হয় না।

‘ক্যাপ্টেন কুমারভ,’ রাইকভের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল রানা। ‘আর ইনি ডাক্তার জ্যাকভ। ইনি লেনিনগ্রাদের কমান্ডার, ক্যাপ্টেন লিউ রাইকভ।’

‘আপনাদের দেখে খুশি হলাম, ক্যাপ্টেন,’ বলল ডাক্তার জ্যাকভ। ‘আর আপনি নিশ্চয়, ডাক্তার কডেনকো?’ হাসল সে, ‘প্রচুর রোগী পাবেন এখানে, ডাক্তার সাহেব, ট্যাবলেটের স্টক কমাতে পারবেন কিছুটা।’

মেঝেতে পড়ে থাকা অনড় মানুষ-পুটলিগুলোর দিকে তাকালেন রাইকভ। ওরা জ্যান্ট কি মরা বোঝার উপায় নেই। হানি মিলিয়ে গেছে কমান্ডারের মুখ থেকে। ক্যাপ্টেন কুমারভের দিকে চেয়ে বাধাতরা গলায় বললেন, ‘ব্যাপারটা দুঃখজনক, ক্যাপ্টেন।’

বিভিন্ন বিভিন্ন কার মন কণ্ঠে কি যেন বহল কুমারভ, কিন্তু মুখের ব্যভেজ্ঞের জন্যে বোঝা গেল না। ভান দিকটা বেশি পুড়েছে, বা দিকের গাল অশেষকৃত ক্রম, কিন্তু তবু চামড়া কুচকে আছে ওখানকার। চোখ দুটো বড় একটা বন্ধ পাগড়ির কাঁপুনি দেখেই তার বাথার পরিমাণ আন্দাজ করা যায়।

‘মরফিন নেই আর?’ জ্যাকভকে জিজ্ঞেস করল রানা।

‘না,’ ক্রান্ত শোনাল জ্যাকভের কন্ঠ। ‘একটাও নেই। সব খরচ হয়ে গেছে।’

‘সারারাত ওষুধ নিয়ে চরকি পাক খেয়েছেন, ডাক্তার জ্যাকভ,’ শান্ত গলায় সাক্ষা দিল পিনি, ‘আট ঘণ্টা। ডাক্তার সাহেব, গ্যাকো আর কডিন একটা মিনিট বিরতি নেয়নি।’

ততক্ষণে মেডিক্যাল কিট খুলে ফেনেছে কডেনকো। সেদিকে তাকিয়ে হানল ডাক্তার জ্যাকভ—পরিচায়, দায়িত্ব লাঘবের হাসি। রানা গত সন্ধ্যায় যেমন দেবেছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি অবসন্ন মনে হচ্ছে ডাক্তারকে। আট ঘণ্টা একটানা পরিচয় করেছে। পিনিনের ভাড়া হাটু নিয়েই কাটাতে হয়েছে অনেক সময়। দাঁড়াতে পারছে না ক্যাপ্টেন কুমারভ, তাকে আবার বসিয়ে দিতে গেল জ্যাকভ। কিন্তু ক্রান্ত শরীরে ভারী একটা দেহ নিয়ে সুবিধে করতে পারছে না। এগিয়ে গিয়ে হাত লাগান রানা। ফ্লস্ট-বাইটে আড়ষ্ট হয়ে যাওয়া খুতনির দাড়ি নাড়িয়ে হতাপ ভঙ্গিতে বলল ডাক্তার, ‘বেচারি!’

‘আমাদের ওপর সব ছেড়ে দিন, ডাক্তার জ্যাকভ,’ বললেন কমান্ডার রাইকভ। ‘স্বাধীনত আপনি করেছেন, এখন বিগ্রাম নিতে হবে আপনাকেও। হ্যাঁ, একটা কথা,’ মাটিতে পড়ে থাকা বস্তাগুলোর দিকে আঙুল তুলে দেখালেন, ‘এদেরকে নড়ানো চড়ানো যাবে?’

‘জানি না,’ বক্তৃৎসাল চোখের কালি পড়া কোল দুই হাতে ডলল জ্যাকভ। ‘আমি জানি না। দু’য়েকজন তো গত রাতেই চলে যাবার পায়তারা করেছিল। ডাক্তার ঠাণ্ডাই এর জন্যে দায়ী। এই যে, এই দু’জন। নিউমোনিয়া, ধারুণা করছি। বেঁচে যে আছে এখনও, এটাই আশ্চর্য।’ একটু থেমে বলল, ‘রোগ প্রতিরোধের কোন ক্ষমতাই নেই। বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় উত্তাপটুকু যোগাড় করতেই হিমশিম খাচ্ছে ওদের শরীর।’

‘তাহলে এক্ষুণি সবাইকে টানার্টেচড়া না করাই ভাল,’ বললেন রাইকভ। ‘মোটামুটি ঝাড়া আছে যারা তাদেরকেই আপাতত জাহাজে নেয়ার ব্যবস্থা হোক,’ কডেনকোর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, ‘ডাক্তার, আগে কাকে কাকে নেয়া যায়?’

‘পিনি, ডাক্তার জ্যাকভ, ক্যাপ্টেন কুমারভ, আর এই যে—’

‘আমি কডিন, রেডিও অপারেটর,’ নিজের পরিচয় দিল কডিন। জোর করে নিজেকে টেনে তুলল। টলছে, তবু বলল, ‘আমি হেঁটেই যেতে পারব—’

‘তোমার কথা বলার দরকার নেই,’ কডিনকে থামিয়ে দিয়ে গ্যাকোর দিকে চাইলেন রাইকভ। ‘তোমার ওই বাবুর্চিগিরি রাখো তো এবার, গ্যাকো। ওঠো, এদের সঙ্গে যাও। জাহাজ থেকে তাদের সংযোগ আনার ব্যবস্থা করো। দুটো বড় হীটার লাগবে, বালরও জ্বালানো দরকার। কতক্ষণ লাগবে?’

‘আমি একা?’

‘যত খুশি সহকারী নিতে পারো।’

‘পনেরো মিনিট। একটা টেলিকোনেরও বন্দোবস্ত করে ফেলতে পারব, কমান্ডার।’

‘ভালই হবে তাহলে। স্ট্রোচার নিয়ে এরা যখন আবার ফিরে আসবে, তুমিও আসবে সঙ্গে। কসল, চাদর, গরমপানি আনবে। পানির পাত্রগুলো কসল দিয়ে

জড়িয়ে নিও, ডাক্তার কুডেনকোর দিকে ফিরলেন, 'আর কিছু লাগবে, ডাক্তার?'

'আপাতত লাগবে না, ক্যাপ্টেন।'

'তাহলে যাও, গ্যাকো, ওঠো।'

পাত্র থেকে চামচে করে খানিকটা ঘন আঠান তরল পদার্থ তুলল গ্যাকো। নাকের কাছে নিয়ে ওকল, সাবধানে জিভের ভগ্নায় ঠেকাল চামচের পদার্থটুকু। নাক কোঁচকাল, থু থু করল, হঠাৎভাবে মাথা নাড়ল এদিক-ওদিক। 'অঝাদা!' চামচটা পাত্রে ফেলে দিয়ে উঠে পড়ল সে। একজন স্ট্রেচার বাহকের দিকে এগিয়ে গেল।

মেরোতে পড়ে থাকা অবশিষ্ট আটজন লোকের মাঝে চারজনের জ্ঞান আছে। এরা হলো আলেক্সি মিলো—ট্রাঙ্ক ড্রাইভার, বাবুচি আনাভালি অতর আর জমজ দুই ভাই নিকোলাই ও বুনিয়েন দিয়েচ। মোটামুটি পুড়েছে দুই ভাই, ফুট-বাইট ও ছাড়েনি এদের। তুলনামূলকভাবে অবস্থা ভাল ড্রাইভার আর বাবুচির। বাকি চারজন বেঁটশ।

থার্মোমিটার আর স্টেথো নিয়ে বাস্তব হয়ে পড়েছে কুডেনকো। তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে গেল রানা। গভীর মনযোগে রোগীদের মাঝে নিউমোনিয়ার লক্ষণ খুঁজছে কুডেনকো। কেবিনের একবার এদিক একবার ওদিকে ঘামছেন রাইকড। কখনও থেমে দাঁড়িয়ে দেখছেন রানা আর কুডেনকোর কাজ। সারাক্ষণই দুই হাত ঝাঁকাম্ফেন বক্স চলাচল অব্যাহত রাখার জন্যে। তাড়াহুড়োর জন্যে কিংবা মনের ভুলে রানার মত সারের পোশাক পরেননি কমান্ডার। আইস বক্সের মত ঠাণ্ডা কেবিন। কমান্ডারের জন্যে উষ্ণ হয়ে উঠল রানা।

ঘরের দক্ষিণ কোণে কাত হয়ে পড়ে আছে একজন লোক। এগিয়ে গিয়ে তার পাশে বসে পড়ল রানা। লোকটার চোখের পাতা আধখোলা, মণির নিচের অংশটুকু শুধু দেখা যাচ্ছে, বরফের মত সাদা কপালের চামড়া। সারা মুখের মধ্যে ক্যান্ডেল নেই শুধু কপালেই।

'কে ও?' ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

'আন্ট্রপড। মিলাহাইল আন্ট্রপড,' জবাব দিল মিলো। 'সে-ও বেডিও অপারেটর, কভিনের সহকারী। কেমন আছে?'

'নেই। বহু আগেই দুনিয়ার মায়্যা কাটিয়েছে,' বিষম কষ্টে বলল রানা।

'মারা গেছে?' তাঁকু শোমাল রাইকডের কর্ত।

কমান্ডারের দিকে তাকিয়ে মাথা নাকাল রানা।

কুডেনকোর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন কমান্ডার, 'এদের কার কার অবস্থা সবচেয়ে বেশি খারাপ?'

'এই দু'জন,' জমজ দুই ভাইকে দেখিয়ে বলল কুডেনকো। 'বার্ডিট্রী বার্নস।

হাই টেম্পারেচার। অত্যন্ত দুর্বল, নীড়ির গতি ফল। কুলমুসে দুইত জমেছে।

'জাহাজে নেয়া যায় না?'

'নড়াচড়া করাতে গেলেই মরবে,' বলল রানা।

'হুম। কিন্তু অনিশ্চিত সময়ের জন্যে তো এখানে থাকতেও পারি না আমরা, কি যেন ভারনেন রাইকড। তারপর বললেন, 'কোনভাবেই নেয়া যায় না ওদের,

না?'

'দুর্ভাগ্য, ক্যাপ্টেন,' বলল কুডেনকো। 'ডাক্তার রানার সঙ্গে আমি একমত। কিছুতেই নড়ানো যাবে না এদের এখন থেকে।'

শ্রাণ করলেন কমান্ডার, আর কিছু বললেন না।

স্ট্রেচার বাহকেরা ফিরে এল, তাদের পিছু পিছু এল গ্যাকো। জাহাজ থেকে তিনজন সহকারী নিয়ে এসেছে সে। তার, ইটোর, ল্যাম্প, টেলিফোন নিয়ে এসেছে তারা। কয়েক মিনিটেই ইটোর আর ল্যাম্পের যোগাযোগ করে ফেলা হলো জাহাজের জেনারেটরের সঙ্গে। সিসিভার তুলে ফোনে লেনিনখানের সঙ্গে কথা বলল গ্যাকো। কয়েক সেকেন্ড পরেই আলো জ্বলে উঠল। উজ্জ্বল লাল আলো বিজ্বলিত হতে লাগল ইটোরের কক্ষের থেকে।

ড্রাইভার, বাবুচিকে স্ট্রেচারে তোলা হলো।

দ্বিতীয়বার স্ট্রেচার বাহকেরা চলে গেলে কোলম্যান ল্যাম্পটা তুলে নিল রানা, 'এটা আর দরকার নেই এখানে।'

'কোথায় যাচ্ছেন?' জিজ্ঞেস করলেন রাইকড।

'বাইরেটা একটু ঘুরে দেখি,' বলল রানা। 'বেশি দেরি হবে না।'

এক মুহূর্ত থিখা করলেন কমান্ডার, তারপর দরজার কাছ থেকে পথ ছেড়ে সবে দাঁড়ালেন।

বাইবে বেরিয়ে কুঁড়ের এক কোণের কাছে গিয়ে দাঁড়াল রানা। ঘরের ভেতর ফোন বাজল। কেউ কথা বলতে চায় হয়তো কমান্ডারের সঙ্গে।

বিশেষভাবে তৈরি এইসব কোলম্যান ল্যাম্প। বাতাসে দপ দপ করে উঠল বাতির শিখা, কাত হয়ে লগ্না হয়ে গেল একদিকে, কিন্তু নিভল না। প্রচণ্ড গতিতে ছুটে এসে চিমনির গায়ে আঘাত হানছে বরফের কণা। আশ্চর্য শব্দ কোঁচ। কিছুই হলো না। কোলম্যান কোম্পানির প্রতি অন্যান্য অনেকবারের মত আরেকবার শুদ্ধা জাগল রানার মনে।

উত্তরের শেষ কুঁড়ের দিকে কোণাকুণি পথে রওনা দিল রানা। কাছে পৌঁছে দেখল একবারে অক্ষত রয়েছে কুঁড়টা। ধোয়ার দাগ পর্যন্ত নেই দেয়ালে। এটার পাশেই ফুয়েল স্টোর, অথচ এই কুঁড়টায় আগুন লাগেনি। নিশ্চয় বাতাস উল্টো দিকে বইছিল আগুন লাগার সময়ে, নইলে এই ঘরটারই সবার আগে পোড়ার কথা। আগুনের উৎপত্তি এই ফুয়েল স্টোর থেকেই।

অক্ষত কুঁড়ের পাশে একটা শেড, একদিকে ঝুকে আছে। ছয় ফুট উঁচু, ছয় ফুট পাশে এবং লম্বায় আট ফুট। ধাক্কা দিতে সহজেই খুলে গেল দরজা। কাঠের মেঝে, দেয়াল আর সিলিংয়ে অ্যালুমিনিয়াম শীটের আবরণ। দেয়ালে বসানো বিশাল কালো রঙের ইটোর। কানেকশনের বেরিয়ে থাকা তার দেখে সহজেই অনুমান করা যায় কোনদিকে কোথায় ছিল জেনারেটর হাউসটা। এখন কান্স হয়ে গেছে। ইটোর আর তাপ নিরোধকের ব্যবস্থা দেখেই বোঝা যায় এক সময় দিন রাত গরম থাকত এই শেড। বিশাল ট্রাঙ্ক এঞ্জিনটা মেঝের পুরো জায়গা দখল করে প্রাগৈতিহাসিক নানবের মত জিমোচ্ছে। ওটার কক্ষকে চেঁচারা দেখেই বোঝা যায় ঘর গরম থাকার সময়ে ইগনিশ্যান টুলেই স্টার্ট হয়ে যেত এঞ্জিন। এখন অবশ্য এঞ্জিনের

সর্বনাশ করে দিয়েছে ঠাণ্ডা। দরজাটা আবার নিঃশব্দে বন্ধ করে দিয়ে ফিরল রানা। অন্ধত কুড়েটায় গিয়ে ঢুকল।

হাতব টেবিল, বেকি, যন্ত্রপাতি, আর সিঁড়িঃ নৈবাব এবং বেকিঃ কবার যতরকম আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে ঠাসা ঘর। বেশির ভাগ যন্ত্রই রানার অপরিচিত, এর জন্যে মাথাব্যথাও নেই তার। এটা আবহাওয়া অফিস, জানে সে, এবং এটুকুই তার জন্যে যথেষ্ট। দ্রুত কিন্তু সাবধানে ঘরটা খুঁজে দেখল সে একবার। কিন্তু অস্বাভাবিক কিছুই চোখে পড়ল না। এক কোণে একটা বালি কাঠের বাগের ওপর রাখা আছে একখানা ট্রান্সিভার। ওটার পাশেই ছোট্ট একটা তেল চকচকে পালিশ করা বাগের পানেরোটা নাইফ সেল—সিরিজ কানেকশন করা। তার ওপরে দেয়ালের দিকে ঝুলছে একটা দুই ভোল্টের টেস্ট ল্যাম্প। ব্যাটারি কানেকশন করা পজিটিভ নেগেটিভ দুটো তারের একটার খোলা মাথা ছুঁয়ে দেখল রানা। তারপর টেনে নিয়ে টেস্ট ল্যাম্পের খোলা লীডে ছোয়াল খোলা তারের মাথা। কোন স্পার্ক নেই। পাওয়ারের লেশমাত্র নেই ব্যাটারিতে।

আবহাওয়া অফিস থেকে বেরিয়ে এল রানা। পাশের দিকের শেষ কুড়েটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ভালমত পুড়েছে এই কুড়ে। এটোতেই পুড়েছে সাতজন লোক, তার মধ্যে জ'জনই মারা গেছে। বরফ শীতল বাতাসে পোড়া মাংসের সঙ্গ মেশানো ডিজেলের বিচ্ছিন্নি দুর্গন্ধ, জোর করে বমি ঠেকাতে হয়। মড়া-ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে দ্বিধা করল রানা, তারপর ঢুকে পড়ল। ফাবের হাত মোজা খুলে ল্যাম্পটা রাখল একটা ছোট্ট টেবিলের ওপর। পকেট থেকে উঠ বের করে লাশগুলোর পাশে বসে পড়ল। প্রথমেই পরীক্ষা করল আজমাত কিরিয়কে। না, মরেনি কিরিয়। কথা রেখেছে গ্যাকো, ইন্সপেকশনটা দিয়েছে। কিন্তু বাড়ির গতি সাংঘাতিক রকম ক্ষীণ। আর দেরি না করে তাড়াতাড়ি জাহাজে নেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে তাকে। বেরে আছে এখনও, কিন্তু আর কতক্ষণ টিকবে বলা যায় না।

দীর্ঘ দশটা মিনিট পেরিয়ে গেল। এই পরিস্থিতিতে এক মেকলাশয়ের কিছুতেই ভাল লাগার কথা নয় রানার। মর্গের দারোগ্যানও এই দৃশ্য সহ্যে পারবে কিনা বলা যায় না। দীর্ঘদিন পানিতে থেকে থেকে পচে-ফুলে জেল হয়ে যাওয়া লাশ দেখেছে রানা, খনিতে কাজ করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় মারা যাওয়া লাশ দেখেছে, কিন্তু এখানকার এই পোড়া দৃশ্য আলাদা। বাতাসের দিক থেকে এসব লাশের সঙ্গে ওগুলোর কোন তুলনাই হয় না। অসুস্থ বোধ করছে সে। কাজ শেষ হয়নি এখনও। বেরিয়ে ছুট লাগাবার ইচ্ছেটা অনেক কষ্টে দমন করতে হচ্ছে।

ঠিক এই সময় দরজায় পদশব্দ শোনা গেল। ফিরে চাইল রানা। ভেতরের ঢুকছেন কমান্ডার রাইকড। তার পেছনে লেকটেন্যান্ট রুস্তভ, আহত হাতে উলের মোটা কিছু একটা জড়ানো।

হাতের টর্চলাইট নিভিয়ে দিলেন কমান্ডার। ঘোব থেকে টেনে বুলে নিলেন স্নো-গালসা, তারপর মুখের মাস্ক খুললেন। চোখ কুটকে গেছে সামনে মেঝেতে লাগে থাকা নারকীয় দৃশ্য দেখে, বড় হয়ে গেছে নাকের ফোটা, রক্ত সবে যাচ্ছে মুখ থেকে। রুস্তভ এবং রানা দু'জনেই বর্ণনা দিয়েছে তার কাছে, কিন্তু দৃশ্যটা এত বাস্তব তা অনুমান করতে পারেননি তিনি। শঙ্কিত হলো রানা, অসুস্থ হয়ে পড়লেন

না তো কমান্ডার? কিন্তু না, দ্রুত সামলে নিলেন তিনি, চিবুকে রক্ত ফিরে আসছে আবার ধীরে ধীরে।

'ডক্টর রানা,' ফিসফিস করে কথা বললেন কমান্ডার, যেন তার ভয় জোরে কথা বললে মেঝেতে পড়ে থাকা লোকগুলো জায়া হয়ে উঠবে। 'জনদি জাহাজে ফিরে যান। সোজা গিয়ে নিজের কেবিনে ঢুকুন। আপনার সঙ্গে যাবে রুস্তভ। কোন গোলমাল চাই না আমি। আপনাকে বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে এখন আমার। দরকার পড়লে রুস্তভের সঙ্গে গ্যাকো আর টাবকেও আপনার সঙ্গ নিতে বলব। বাইরে অপেক্ষা করছে ওরা দু'জন।

'অসামাজিক কথাবার্তা বলছেন, কমান্ডার,' বলল রানা, 'আর এই দু'জনের ওপর অবিচার করছেন। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলে বরফ হয়ে যাবে গ্যাকো আর টাবু।' ধীরে ধীরে ক্যারিবি টাইজারের পকেটে হাত ঢোকাল রানা। পিষ্টলটা বুলো। রাইকডের দিকে চেয়ে বলল, 'খুব বেশি ভাবনা-চিন্তা করছেন আপনি, কমান্ডার।'

রুস্তভের দিকে তাকালেন রাইকড। চোখের ইশারায় দরজা দেখিয়ে কিছু বোঝালেন। আধ পাশ ঘুরেই রানার কথা কানে যেতে থেমে গেল রুস্তভ।

'আমার কোন কথা শোনার নেই আপনার?' বলল রানা। অস্বস্তি বোধ করছেন কমান্ডার। কি করবেন, ঠিক করতে পারছেন না।

'আপনাকে ধেকতার না করে পারছি না, ডক্টর রানা। সাধারণ একজন ডাক্তারের চাইতে অনেক অনেক বেশি বুদ্ধি রাখেন আপনি। আপনার কাজকর্মও ঠিক ডাক্তারীর পর্যায়ে ফেলা যায় না। লেনিনগ্রাদে যেদিন প্রথম উঠলেন, আপনার গাল গরু ঠিক বিশ্বাস করতে পারিনি আমি। এখন দেখছি আমার সন্দেহই সত্যি। কোথায় আপনার সেই বিশাল ডিশ এরিয়াল, ডাক্তার? রাডার মাস্ট কোথায়, আর কোথায়ই বা ইলেকট্রনিক কম্পিউটার? কোথায় গেল ওগুলো? আগুটিদিনের দানব নিচয় পা দেয়নি এই আবহাওয়া কেন্দ্রে?'

কমান্ডারের দিকে চেয়ে চুপচাপ থাকল রানা।

'আসলে ও-সবই আপনার মনগড়া, এখানে ওগুলোর অস্তিত্ব কোনদিন ছিল না,' আবার বলে চললেন কমান্ডার, 'আপনি ডাক্তারী করতে আসেননি এখানে, অন্য কোন গুচ্ছ কারণ আছে। আপনি ডাক্তার কিনা সে ব্যাপারেও যথেষ্ট সন্দেহ হচ্ছে এখন আমার। আমার জাহাজের জন্যে ভাবনা আছে আমার, নভেলির আহতদের নির্যাসে দেশে ফিরিয়ে নেয়ার দায়িত্বও আমার ওপরে। কাজেই কোন রকম বুদ্ধি নিতে চাই না আমি।'

'মস্তা থেকে আপনার ওপরওয়ালাদের আদেশ কিছুই নয়, না?' কথা বলল রানা, 'ওগুলোর কোন গুরুত্বই নেই?'

'আছে। কিন্তু পুরো ব্যাপারটাই এত বেশি প্যাচালো মনে হচ্ছে, নিজের ওপরই আস্থা রাখতে পারছি না আমি,' পামলেন রাইকড। 'ভাবলেন। তারপর বললেন, 'আপনি একজন অত্যন্ত বহুসামর লোক, ডক্টর রানা, এবং সম্ভবত পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কিম্বাবাদী।'

'কুব কঠোর আর অপমানজনক শব্দ ব্যবহার করছেন, কমান্ডার।'

‘সত্যি কথা সব সময়েই খারাপ লাগে। দয়া করে উঠবেন কি?’

‘সরি। এখনকার কাজ এখনও শেষ হয়নি আমার।’

‘আই নী। ইউরি...’

‘আমার কিছু কথা বলার আছে। শুনবেন?’

‘আরেকটা রূপকথা?’ এদিক-ওদিক মাথা নাড়লেন কমান্ডার, ‘না। শুনব না।’

‘এবং আমিও কাজ শেষ না করে যাচ্ছি না এবার থেকে।’

কমন্ডারের দিকে চাইলেন কমান্ডার। আবার বেরিয়ে যাবার উপক্রম করল রুস্তভ, কিন্তু আবার ধেমের ঘোরে হলো তাক।

‘ঠিক আছে, ব্রাডহাউন্ডদের ডাকুন। কিন্তু ওদের মোকাবিলা করতে অনুবিধে হবে না আমার।’

‘মানে?’ ভুরু নোচকালেন কমান্ডার।

‘মানে সহজ।’ পকেট থেকে ওয়ানথারটা বের করল রানা। কোলম্যান ল্যাম্পের আলোয় নিকিয়ে উঠল নীলচে ধাতু। নলের ছোট্ট কানো মুখটা আরও কালো দেখাচ্ছে।

‘ওটা ব্যবহার করবার সাহস হবে না আপনার,’ অনিশ্চিত শোনাল রাইকভের কণ্ঠ।

‘অতটা নিশ্চিত হবেন না। বাইরের লোক দু’জনকে ডেকেই দেখুন।’

‘ভয় দেখিয়ে কোন লাভ নেই, ডাক্তার,’ রুস্তভ কণ্ঠে বলল রুস্তভ, ‘আসলে অতটা বেশরোয়া হতে পারবে না তুমি।’

‘বাজি ধরবে? ডাকো, বাইরের দু’জনকেও ডাকো।’ সেফটি কাচ অক্ষ করার মদু ক্লিক শব্দ হলো। ‘এসো, চেষ্টা করে দেখো এটা আমার হাত থেকে চিনিয়ে নেয়া যায় কিনা।’

‘নড়ো না, ইউরি,’ আদেশ দিলেন কমান্ডার, ‘লোকটা সিরিয়াস। আপনার কন্ট্রোলেশন লক করা বিক্ষকসে এই জাতীয় আরও খেলনা আছে নিশ্চয়, ডাক্তার?’ তিরু কণ্ঠ রাইকভের।

‘আছে। অটোম্যাটিক কারবাইন আছে, ছয় ইঞ্চি নাতাল-গান আছে। কিন্তু এখনকার মত ছোট পরিস্থিতিতে এই ছোট খেলনাটাই যথেষ্ট। আমার কথা শোনার ইচ্ছে হচ্ছে?’

‘ইচ্ছে হচ্ছে না, বাধা হচ্ছে।’

‘বেশ। গ্যাকো আর টাবুকে চলে যেতে বলুন। বাইরে দাঁড়িয়ে ওবু ওধু জমে গিয়ে লাভ হবে না ওদের। গ্যাকো কিছুটা জানে, কিন্তু মত কম জানবে, নিরাপদ বোধ করব আমি ততই।’

কমন্ডারের দিকে তাকিয়ে রাড় কাঁচ করলেন কমান্ডার। দরজার কাছে এগিয়ে গেল রুস্তভ, খুলল, সজীমের কিছু বলল, আঁকপাক করে এল আবার।

টোবলে গ্যাকো দিল রানা পিস্তলটা। বা হাত থেকে টেঁচা ডান হাতে নিয়ে ডাকল, ‘এদিকে আসুন। দেখুন আসে। এই যে আমার বন্ধু আজামাত কিবিস।’

দু’জনেই এগিয়ে এল। পিস্তল বাধা বিনিমিত পারা নিজে চলে এল ওরা, কিন্তু একবার ফিরেও তাকাল না অগুটার দিকে। আজামাত কিবিসের পড়ে থাকা অজান

দেহটা দেখাল রানা। পা-টা ছুঁয়ে দেখতে বলল। গায়ে হাত দিয়েই চমকে উঠল রুস্তভ। ‘বোঁচে আছে। বোঁচে আছে লোকটা।’

বিস্ফারিত হয়ে গেল কমান্ডারের চোখ জোড়া। পালস পরীক্ষা করে দেখলেন। বোঁ করে ঘুরে গেল মাথাটা।

‘আংটি, ওই সোনার আংটি...’ বলতে বলতে ধেমের গেলেন কমান্ডার।

‘ওটার কথা বাদ দিন,’ গুস্তার কণ্ঠে বলল রানা, ‘এদিকে দেখুন। এই যে এখানে। পরিহার করে বেরোছি আমি।’

কুঁকে দেখে বললেন রাইকভ, ‘ঘাড়টা ভেঙে গেছে নাকি?’

‘তাই ভাবছেন?’

‘ভারী কিছু পড়েছিল হয়তো,’ ঘরের পোড়া বীম...

‘কিন্তু এসব কুঁড়েতে কোন বীম নেই। ডাল করে ঘাড়টা পরীক্ষা করলে দেখবেন, দেড় ইঞ্চি জায়গা ছুঁড়ে গেছে। না, কোন বীমের খবর খেয়ে নয়, আসলে ওলি খেয়েছে বোঁচার। ঘাড় মুটো করে বুলেট বেরিয়ে যাবার কথা ছিল, কিন্তু খুনীর তাড়াতাড়ির জন্যে ওলি ফসকেছে। নিতাস্তই কপাল গুণে বোঁচে আছে এখনও।’

‘সর্বনাশ!’ এই প্রথমবার বিচলিত হতে দেখল কমান্ডারকে রানা। চোখ বড় বড় করে রানার দিকে চাইলেন। ‘খুন! আপনি বলছেন লোকটাকে খুন করা হচ্ছিল?’

‘কে?’ কোলাহালের স্বর বেরোল রুস্তভের গলা দিয়ে, ‘কে? এবং কেন?’

‘তা জানি না!’ এদিক-ওদিক মাথা দোলল রানা।

অদ্ভুত দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকালেন রাইকভ, ‘একটু আগে জেনেছেন আপনি ব্যাপারটা, না?’

‘গত রাতেই আবিষ্কার করেছি।’

‘গত রাতে আবিষ্কার করেছেন।’ কমান্ডারের বীর কথার ধরন দেখেই অনুমান করা যায়, চিন্তার ঝড় বইছে তার মাথায়। ‘এবং তারপরে আপনার সঙ্গে অসংখ্যবার দেখা হয়েছে আমার, কথা হয়েছে... কিন্তু...মাই গড, রানা, আপনি অমানুষ...’

‘শিওর,’ বলল রানা। ইঙ্গিতে টোবলে রাখা পিস্তলটা দেখিয়ে বলল, ‘ওটা দেখছেন? প্রচণ্ড শব্দ করে যখন ওলি ফুটেবে ওটা থেকে, তখনই খুনীর গলা থেকে যখন দেড় ইঞ্চি হাড় উড়িয়ে দেবে বুলেট, তখন আর অমানুষ থাকব না আমি। বিশ্বাস করুন কমান্ডার, লোকটাকে কুস্তার মত ওলি করে মারতে বিন্দুমাত্র হাত কাঁপবে না আমার, চোখের পাপড়ি পর্যন্ত কাঁপবে না।’

জোর করে আবেগ তাড়ালেন কমান্ডার। শব্দিত দৃষ্টিতে একবার ওয়ানথারটার দিকে তাকিয়ে রানার দিকে চাইলেন, ‘ব্যক্তিগত প্রতিশোধের কথা বাদ দিন, ডাক্তার। নিজের হাতে আইন তুলে নেবার অধিকার কারও নেই।’

‘হাসাবেন না। মূর্খে দাঁড়িয়ে ওসব ছেলেভোলানো কথা মানায় না। আরও কিছু জিনিস দেখার ব্যক্তি আছে এখনও আপনার। একটু আগে আবিষ্কার করেছি, হাত তুলে আরেকটা পোড়া ডালগোল পোকানো মাসমপিও দেখান রানা। একে ডাল করে দেখতে চান?’

‘মাপ করবেন, আমি পারব না,’ গলা শান্ত রাখার চেষ্টা চালাচ্ছেন রাইকড, ‘আপনিই বলুন কি হয়েছে?’

‘ওখানে দাঁড়িয়েই দেখতে পাবেন। পরিষ্কার করে রেখেছি আমি। এই যে, এখানে নাকের একটু ওপরে ছোট ছিঁচটা দেখতে পাচ্ছেন? মাপার পেছনের ছিঁচটা কিন্তু অনেক বড়। একই অঙ্গ, একই ধরনের বুনেট, একই লোকের কাজ। গর্তের সাইজ দেখেই বলে দেয়া যায়, সফট নোজ বুনেট, শক্তিশালী অস্ত্র থেকে ছোঁড়া হয়েছে। পয়েন্ট থ্রী এইট ক্যালিবারের কোল্ট, লুপের কিংবা মাউজার।’

শ্রদ্ধ রাইকড এবং রুস্তভ, দু’জনেই। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে টলে পাড়ে যেতে পারে যে কোন সময়।

‘কোণাকৃণি বেরিয়েছে বুনেট,’ বলে চলল রানা। ‘বুনেটের গতিপথ দেখেই বলে দেয়া যায় গুলি চালাবার সময় ওয়ে কিংবা বসে ছিল খুনি।’

‘দুটো খুন!’ বিড় বিড় করে বললেন কমান্ডার, ‘পুলিসকে জানানো দরকার।’

‘হ্যাঁ, বিকৃত শোনালা রানার কণ্ঠ, ‘ফোনে ডাকুন থানা থেকে পুলিশকে। বলুন—দয়া করে কয়েক মিনিটের জন্যে একবার এখানে আসতে পারেন, সার্জেন্ট?’

‘কিন্তু এসব দেখা আমাদের কাজ নয়,’ গলায় জোর নেই কমান্ডারের। ‘নভেলির বেঁচে থাকা আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্বই শুধু দেয়া হয়েছে আমাদের।’

‘নিশ্চয়ই লেনিনগ্রাদের ভালমন্দ দেখার দায়িত্বও আপনার। একজন খুনীকে জায়গা দিয়ে পুরো জাহাজসুদ্ধ লোককে বিপদে ফেলতে অস্বস্তি বোধ করবেন না?’

‘কি বলতে চান?’

‘এই আইস টেশনে কি করে আগুন লেগেছে বলে মনে হয় আপনার? অ্যাক্সিডেন্ট? কিন্তু জায়গা বুঝে, ঘর বুঝে বুঝে অ্যাক্সিডেন্ট হলো কেন? পরিকল্পনায় সামান্য ভুল করে ফেলেছে খুনি। আসলে ভাবতে পারেনি সে, অতি সন্দিক্ত এক আধজন লোককে উদ্ধারকর্মীদের সঙ্গে পাঠানো হতে পারে। ভেবেছিল, দুর্গম বরফের রাজ্যে এসে কে আর অত মাথা ঘামাবে। আপনি পছন্দ করুন আর না-ই করুন, কমান্ডার, খুনি উঠেছে আপনার জাহাজে। একজন কিংবা একাধিক।’

‘কিন্তু তাদের সবাই আহত। অক্ষত কিংবা পোড়া দাগ নেই, এমন একজনও...’

‘কি মনে হয় আপনার? পুরো সুস্থ দেহে জাহাজে উঠবে খুনি, অতই বোকা? দুনিয়াসুদ্ধ লোককে জানাবে—এই যে, এখানে আমি, স্টেশন নভেলিতে আগুন ধরিয়েছি, মানুষ খুন করেছি, এখন ধন্য আমাদের?’

‘কিন্তু অক্ষত থাকলেই তার ওপর লোকের সন্দেহ পড়বে কেন?’ প্রশ্ন করে বলল রুস্তভ।

‘তোমার ক্যাশিয়ারের মতই কোম্পানিও খোদেমদারিতির লাইন থেকে দূরে থাকার উপদেশ না দিয়ে পারছি না, ককশ গলা বানান। ‘যে এই অফটন ঘটিয়েছে, সে তোমার মত অতটা সফল মনের মানুষ নয়। অতি উৎসাহের ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট সে। সব বকমের পরিস্থিতির কথা আগেই ভাবে এই ধরনের লোক সবদিক বিবেচনা করে রাজ্য মাথায় কাজ করে। তানানার আহতদের সঙ্গে হচ্ছে করত

নিজেকেও পুড়িয়ে নিয়ে মিশে গেছে সে তাদের ভিড়ে।’

‘মাই গড!’ ঠাণ্ডায় নাতে নাতে বাড়ি খেতে শুরু করেছে, কিন্তু খেয়াল নেই যেন কমান্ডারের। ‘নারকীয় পরিকল্পনা!’ একেবারে হতচকিত হয়ে গেছেন তিনি ব্যাপার দেখে তনে। আমতা আমতা করে বললেন, ‘কিন্তু...কিন্তু এখন কি করতে পারি আমি?’

‘পুলিস ডাকতে পারেন।’

‘মানে?’

‘সহজ। যে কোন উদ্দরের পুলিশের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতা দেয়া হয়েছে আমাদের মস্তোড় ওপর-মহল থেকে। আমাদের পাঠানোই হয়েছে এই বিশেষ দিকটা তদন্ত করে দেখার জন্যে।’

‘এইবার মনে হচ্ছে সত্যি বলছেন আপনি, মাসুদ রানা,’ চিত্তাধিত, ধীর কণ্ঠে বললেন রাইকড, ‘গত চব্বিশ ঘটায় যা করেছেন, মিলে যাচ্ছে এতফলে। দশ মিনিট আগেও নিশ্চিত হতে পারছিলাম না। তা আপনি কি কোন ধরনের “পুলিস মান”?’

‘ইন্টেলিজেন্স অফিসার। বিদেশী হলো যাকে পরিপূর্ণ ভাবে বিশ্বাস করতে পারে কে.জি.বি.। বিশেষ দরকারের সময় ব্যবহারের জন্যে স্পেশাল আইডেনটিটি কার্ড রয়েছে আমার বিকফেসে। এখন বিশেষ সময়। হচ্ছে করলে দেখতে পারেন।’

‘কিন্তু আপনি আপনি একজন ডাক্তার...’

‘প্রাথমিক চিকিৎসার ট্রেনিং দেয়া হয় ইন্টেলিজেন্স এজেন্টদের। ব্যাল, ওই পর্যন্তই।’

দীর্ঘ কয়েক মুহূর্ত নীরবতার পর ফোড প্রকাশ করলেন কমান্ডার, ‘আগেই বলতে পারতেন একথা।’

‘কিংবা পুরো লেনিনগ্রাদে ঘোষণা করে দিতে পারতাম। এবং সকালে উঠে হয়তো দেখতাম নিজের কেবিনে নিজের বিছানার মরে পড়ে আছি। আপনারদের কাউকে বিশ্বাস করতে যাব কেন—কে খুনি জানি আমি? আপনার শার্লক হোমসগিরির জন্যে...বাকগে, ওসব কথা বাদ দিন। মস্তো থেকে পাওয়া আপনার ওপরঅলাদের নির্দেশ মত চললেই বুশি হবে এখন।’

‘কি নির্দেশ?’ জানতে চাইল রুস্তভ।

‘ডক্টর রানাকে সব বকমে সহযোগিতা করার নির্দেশ পেয়েছি সি.এন.ওর কাছ থেকে,’ বললেন কমান্ডার। ‘তিনি আরও জানিয়েছেন, অতান্ত সন্দেহপ্রবণ লোক ডক্টর রানা, এবং কোন ব্যাপারেই অন্ধকারে থাকতে পছন্দ করেন না। সাবমেরিন সম্পর্কে তার ভাল ধারণা আছে, কাজেই তাঁকে ঠকাবার চেষ্টা যেন না করি। কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক মেনে নিতে পারিনি আমি।’ রানাকে বললেন, ‘আমার জায়গায় আপনি হলেও একই কাজ করতেন, ডক্টর...মানে...’

‘মেজর রানা, কিংবা স্নেক রানা,’ মুচকি হাসল রানা। ‘আপনার জায়গায় আমি হলে আদেশ মেনে চলাই উচিত মনে করতাম, কমান্ডার।’

‘কীর আদেশ? মস্তোড়, না আপনার?’

‘মস্তোড় আদেশ, আমার অনুরোধ। কারও আমি একজন বিদেশী।’

‘আপনার এবারের কথা বিশ্বাস করতে পারি তো?’

‘এক বিন্দু মিছে নেই এতে। প্রথমেও কিন্তু যা বলেছিলাম, কিছুটা বাড়িয়ে বলেছি, তবে সবই বানানো নয়। বেশ অনেকটা সত্য ছিল তাতে। একটা বিশেষ ইলেকট্রনিক যন্ত্র সত্যিই ছিল এখানকার একটা কুঁড়েতে—আমেরিকান মিসাইলের কাউন্ট ডাউন আর লোকেশন জানাত ওটা, এখন ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। কোন ঘর বলে দিছি, দক্ষিণ সারির পশ্চিম থেকে দ্বিতীয়টা। আরও আছে। দিন-রাত একটা মস্ত রেডিও সাইড বেলুন তিরিশ হাজার ফুট ওপরে উড়ত। কিন্তু কোন রেডিও ছিল না তাতে, ছিল একটা বিশাল এন্টেনা। বেলুনে হাওয়া ভরার জন্যে ব্যবহৃত হাইড্রোজেন সিলিন্ডারে বিস্ফোরণ ঘটাতোই এতদূর ছড়িয়েছে আতন। ফুয়েল স্টোরে থাকত সিলিন্ডারগুলো।’

‘নভেলির কেউ ইলেকট্রনিক যন্ত্রটার কথা জানত?’ জানতে চাইলেন রাইকত।

‘দেখেছে সবাই, কিন্তু আসলে কি কাজ হত ওটা দিয়ে, অনেকেই জানত না। এদেরকে জানানো হয়েছে ওই মেশিনের সাহায্যে মহাশূন্যে কসমিক রে-র তদন্ত চলে। জানত মাত্র চারজন লোক। একজন আমার বন্ধু এবং আরও তিনজন লোক, দুইটনার দিন ওই মেশিন-ঘরেই ঘুমিয়েছিল তারা। ঘরটা পুরো ধ্বংস হয়ে গেছে এখন। অনুমান করতে পারছেন, আপনার সি.এন.ও কেন এত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন?’

‘চারজন লোক?’ সরাসরি রানার চোখের দিকে তাকালেন কমান্ডার। ‘কোন চারজন, মেজর?’

‘এই যে, এখানেই তো পড়ে আছে। এই সাতজনেরই চারজন।’

‘আরেকবার বিকৃত নাশগুলোর দিকে চাইলেন কমান্ডার, তারপর দ্রুত চোখ সরিয়ে নিলেন। রানাকে জিজ্ঞাস করলেন, ‘কিছু একটা গোপনাল হয়েছে এখানে, আগেই টের পেয়েছে মাফা, কি করে, জানেন?’

‘একটা টপ নিফ্রেট কোড ছিল আমার বন্ধুর কাছে। একজন ভাল রেডিও অপারেটরও ছিল সে। নিফ্রেট কোডে কিছুদিন আগে খবর পাঠিয়েছিল সে, কেউ নষ্ট করে দিতে চাইছে মনিটর। এর বেশি কিছু জানাতে পারিনি এ সম্পর্কে। এর দিন দু’য়েক পরেই আরেক মেসেজে জানিয়েছে, গভীর রাতে রুটিন চেক করতে গিয়ে ফুয়েল স্টোরে বহিরে আক্রান্ত হয় কিরিস। তাকে আহত এবং অজ্ঞান করে ফেলে যায় আক্রমণকারী। জ্ঞান ফিরে এলে প্রথমেই ফুয়েল স্টোরে ঢুকে আজামাত দেখতে পায়, একটা হাইড্রোজেন সিলিন্ডারের মুখ খুলে দিয়েছে কেউ, প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে সিলিন্ডার। বেলুনে করে এন্টেনা ওড়াতে না পারলে অকেজো হয়ে যাবে মনিটর, তাই গ্যাস ছেড়ে দিচ্ছিল কেউ। ভাগ্য ভাল কিরিসের, বরফে জমে যাবার আগেই জ্ঞান ফিরে পেয়েছিল। তাছাড়া এর ঠাণ্ডা মৃত্যু করার কমান্ড তো দেখতেই পাচ্ছেন, আগেও আরও কিছু ছোট্টাট ঘটনার কথা জানিয়েছে কিরিস—কল টনক নড়ে করুণাকর। কিন্তু কোন বরফা নেয়ার আগেই চূড়ান্ত আক্রমণ চালিয়ে বসেছে খুন্সী।’

‘তার মানে, আপনার বন্ধু এবং তাঁর তিন সহকারী ছাড়াও আরও কেউ জানে

মনিটরটার কাজ কি,’ বলল রুস্তভ। রাইকতের মতই পড়ে থাকা নাশগুলোর দিকে আরেকবার তাকিয়ে দ্রুত দৃষ্টি ফেরাল সে। ‘আমার মনে হয় কি জানেন?—কোন পাগলের কাজ এটা। ম্যানিয়াক। তাছাড়া ঠাণ্ডা মাথায় এমন নিষ্ঠুরভাবে পাইকারী খুন করতে পারে না কেউ।’

‘মোটাই পাগল নয় এই খুন্সী,’ বলল রানা। ‘ঠাণ্ডা মাথায়, ভেবে-চিন্তে, প্ল্যান করে খুন করেছে সে। বুলিনের ইত্যাকারীকেও তুমি পাগল বলবে নাকি? চুপ করে বইল রুস্তভ, কথা হারিয়েছে।

‘আমরা এখন কি করতে পারি, মেজর রানা?’ জিজ্ঞাস করলেন কমান্ডার। ‘প্রথম কথা জাহাজে ফিরে ভুলেও “মেজর” বলে ডাকবেন না আমাকে, ডাক্তারই বনবেন।’

‘তা নাহয় ডাকলাম, কিন্তু আর কি সাহায্য করতে পারি আমরা?’

‘কি সাহায্য করতে চান?’

‘লেনিনগাদের কমান্ডার পদটা অবশ্যই দেব না,’ হাসলেন রাইকত। কিন্তু হাসিটা হাসির মত মনে হলো না। ‘এ ছাড়া আর যে কোন সাহায্য চাইবেন, নির্দিষ্ট করে। শুধু মুখ দিয়ে উচ্চারণ করবেন কি করতে হবে।’

‘তার মানে, এবারে আমার কাহিনী বিশ্বাস হয়েছে?’

‘হয়েছে।’

পাঁচ

ক্রমেই নির্জন হয়ে আসছে আইস স্টেশন নভেলি। আহতরা যে কুঁড়েটায় ছিল তাতে এখন শুধু দু’জন রোগী—যমজ দুই ভাই আর ডাক্তার রুস্তভনকো। জাহাজে তোলার সময় মিলাহাইল আর একজন জু-এর লাশের সঙ্গে লাশ হিসেবেই চালিয়ে দেয়া হয়েছে আজামাত কিরিসকে। স্টেচারে করে জাহাজে নিয়ে তোলা হয়েছে। সবাইকে জানানো হয়েছে, আত্মীয়-বন্ধনের কাছে ফেরত দেয়া হবে ওগুলো। বাহুহাউসটা আরও বেশি যেন ঠাণ্ডা মনে হচ্ছে এখন। চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে অসংখ্য জিনিস-পত্র: কাপড়ের টুকরো, কাগজ, পোড়া তোষক, ছেঁড়া কম্বল, দস্তানা, বাসন-কোসন ইত্যাদি ছাড়াও আরও অনেক আজোবাজে টুকরো-টাকরা অনেক কিছু।

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল রানা। তার একটু পরেই ঢুকলেন কমান্ডার, তাঁর পেছনে রুস্তভ। একবার চেয়েই আবার রোগীদের দিকে মুখ ফেরাল রুস্তভনকো। রোগীদের মূর দরজার দিকেই ফেরানো। অজ্ঞান হয়ে আছে এখনও। সারা মুখে দ্রুত-বাইটের দাগ।

পশ্চিমের মেঝে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ঢাপা গলায় ডাকল রানা। সতর্কতায় নম্রু ঘটনা জানাল। কিন্তু ডাক্তার বলেই হয়তো, কিংবা অন্য কোন কারণে, কমান্ডার রাইকত তিনবা কপ্তনের মত অবাক হলো না রুস্তভনকো, তাঁরকে উঠে

লেনিনগাদ-২

সাহায্যের দুই ন-মাথ
কম্বল, বিলা

১৩১

আকাশ থেকেও পড়ল না। এমন ভাব দেখাল যেন এটা হয়, এসব হতে পারে। একে নিয়ে লেনিনস্থানের মোট চারজন লোককে জানাল রানা ব্যাপারটা, জানাল এই জন্যে যে এদের সাহায্য তার দরকার হবে।

'সব তো ওনলে,' রানার কথা শেষ হলে বললেন কমান্ডার, 'আহত লোকগুলোকে কোথায় রাখা যায়, বলো তো?'

'ছড়িয়ে ছিটিয়ে,' বলল রুডেনকো। 'কোন এক জায়গায় জড়ো করে রাখলে সন্দেহ করে বসতে পারে আমাদের দোস্ত।' তারচে অফিসারস কোয়ার্টার, জুদের কোয়ার্টার, সিক-বে সব জায়গাতেই রাখতে হবে রোগীদের। আর আজামাত—আমার মনে হয় আপনার কেবিনে ওকে রাখাই সবচেয়ে নিরাপদ, ক্যান্টেন।'

'তাই করো গে। ডাক্তার জ্যাকভকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করো। লোকটা কাজ-পাগল। কিন্তু খবরদার, কিরিমের কথা জ্যাকভকেও জানাবে না। তুমি, আমি, রুডেন আর গ্যাকো ছাড়া জাহাজের সবাই জানবে, কিরিম মৃত। লাশ-ঘরে ডবল তানা লাগিয়ে চাবি আমার কাছে রেখে দেব। কাজেই আমার অনুমতি ছাড়া লাশ-ঘরে ঢুকে পরীক্ষা করে দেখতে পারবে না কেউ, কোন লাশটা আছে, কোনটা নেই।'

'আহতদের পরনের কাপড়-চোপড় বদলে দিতে হবে। পুরানোগুলো কি করব?'

'হ্যাঁ, একটা পয়েন্ট,' ঘাড় কাত করলেন কমান্ডার। রানার দিকে একবার তাকিয়ে রুডেনকোকে বললেন, 'একটা কাপড়ও নষ্ট করবে না। যার যার কাপড়ে লেবেল লাগিয়ে নাম লিখে রাখবে। পরে পুলিশের কাজে লাগতে পারে।'

'দস্তানাগুলোর ব্যাপারে বিশেষ সাবধান হবেন,' বলল রানা। 'পরীক্ষায় গান পাউডারের নাইট্রোটের খোঁজ পাওয়া যেতে পারে।'

ঘাড় কাত করল রুডেনকো।

'আরেকটা ব্যাপার,' হুশিয়ার করল রানা। 'কেউ যেন অস্বাভাবিক কিছু আপনার অজান্তে আপনাকে দিয়ে বইয়ে দিতে না পারে। এই যেমন ধরুন, আপনার পকেটে কেউ কিছু ওজ দিল, কিংবা মেডিক্যাল কিটে ভরে রাখল, তাহলে নিরাপদে জাহাজে চলে যাবে জিনিসটা।'

রানার কথা শেষ হবার আগেই নিজের পকেট তল্লাশি শুরু করে দিল ডাক্তার। কিন্তু কিছু নেই।

'রানার মত সন্দেহপ্রবণ মন নয় তোমার,' বললেন রাইকভ। 'তা এখন জাহাজে যাও। ইউবি, তুমিও যাও।'

রুডেন আর রুডেনকো চলে যেতেই কাজে নামল রানা। প্রথমেই এগিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করল দুই ভাইকে, সত্যিই অজ্ঞান হয়ে আছে ওরা। ঘরটায় তল্লাশি চালান রানা। তাকে সাহায্য করলেন কমান্ডার। দেখা গেল তল্লাশির কাজ ভালই জানেন রাইকভ, কোনরকম ফাঁক নেই। পুরো ঘরটা তম তম করে খুঁজেও অস্বাভাবিক কিংবা সন্দেহজনক কিছু পাওয়া গেল না।

'খামোকা কষ্ট করলাম,' হতাশ হয়েছেন কমান্ডার।

'এঘরে নেই,' ভাবছে রানা। 'আর কিছু না পেলেও পিস্তলটা তো পাওয়া যাবে! কোথায়? নিশ্চয় কাজ শেষ করে উড়ে ফেলে দেয়নি জিনিসটা খুনী। কারণ তার কাজ এখনও শেষ হয়নি। তাছাড়া অস্ত্র হাতছাড়া করতে চায় না কখনও এই ধরনের লোকেরা। কখন আবার দরকার লেগে যায়, এই চিন্তা সরাতে পারে না কিছুতেই মন থেকে। তাহলে কোথায় আছে জিনিসটা? এই বান্ধবহাউসের কোথাও নেই। তাহলে? বাকি রইল আবহাওয়া অফিস আর ল্যাবরেটরি।'

'পোড়া ঘরগুলোর যে কোনটার ফংসতুপের কোথাও বেধে দিতে পারে,' বললেন রাইকভ।

'নাহ। বরফে ক্ষতি হয় আগ্নেয়াস্ত্রের। ফংসতুপের কোথাও লুকিয়ে রাখলে ওই পিস্তল আর কোনদিন কাজে লাগতে পারবে না সে। কাজেই ওসব জায়গায় রাখেনি। চলুন, আগে যাই আবহাওয়া অফিসে, দেখি খুঁজে।'

আবহাওয়া অফিসের প্রতিটি শেলফ, প্রতিটি বাক্স, আলমারি, সব দেখা হয়ে গেল। মেটাল কেবিনেটের ফাঁপা জায়গাগুলোও দেখা শেষ। যন্ত্রপাতিগুলো খুলে দেবার কথা ভাবছে রানা এই সময় হঠাৎ কমান্ডার বললেন, 'দাঁড়ান। একটা আইডিয়া এসেছে মাথায়। আসছি আমি।'

এক মিনিট পরেই ফিরে এলেন রাইকভ। হাতে কয়েকটা জিনিস। তাজা পেট্রলের গন্ধ আসছে ওগুলো থেকে। ল্যাম্পের আলোয় চকচক করছে একটা পিস্তল—মাইজার অটোমেটিক, একটা চুরি—গ্রেডের আগা ভাঙা, আর দুটো বাবার মোড়া প্যাকেট। না খুলেই বুঝতে পারল রানা, ভেতরে কি আছে। পিস্তলের জন্যে স্প্যার মাগাজিন।

'কোথায় পেলেন ওগুলো?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ট্রাঙ্কের পেট্রল ট্যাংকে।'

'তাজ্জব হয়ে গেল রানা।

'ওখানে খোঁজার কথা মনে এল কেন?'

'আপনার কথায়,' বললেন, বরফে আগ্নেয়াস্ত্রের ক্ষতি হয়। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে এল, সারা নভেলিতে একটাই জায়গা আছে, যেখানে কামড় বসাতে পারবে না বরফ। সাব জিরো টেম্পারেচারেও জমে না অ্যালকোহল আর গ্যাসোলিন। অ্যালকোহলের বোতলে পিস্তল ঢোকানো যাবে না, বাকি থাকল গ্যাসোলিন। গ্যাসোলিনের টিন নিরাপদ নয়, কারণ ওখান থেকে তেল নিয়ে ব্যবহার করতে হয়। এক মাত্র নিরাপদ জায়গা তাহলে ট্রাঙ্কের গ্যাস ট্যাংক। ট্যাংকের ভেতরে খোঁজ করতেই পেয়ে গেলাম।'

'ভাল জায়গাই বেছেছে লোকটা, কিন্তু খুব ভাল নয়। তেল বরফ হয়ে যায়নি ঠিক, কিন্তু বরফের মত ঠাণ্ডা হয়েছে। আসলে বাতুর ক্ষতি করে ঠাণ্ডা।'

'এই কথাটা জানে না হয়তো সে। আর যদি জানেও, এর চেয়ে ভাল জায়গা খুঁজে পায়নি।'

কমান্ডারের হাত থেকে পিস্তলটা নিল রানা। মাগাজিনটা পরীক্ষা করল। খালি।

ডুর্ভ কুঁচকে দেখেছেন কমান্ডার, ভাবছেন, তারপর হঠাৎই বলে উঠলেন,

‘আপনার আঙুলের ছাপ বসে যাচ্ছে জিনিসটায়।’

‘তথু আমার আঙুলের ছাপই পাওয়া যাবে। পেট্রোলে চোবানোর পরই খুন্সীর হাতের ছাপ উঠে গেছে। তাছাড়া নিচয়ই গ্লাভস পরে ছিল সে।’

‘তারলে এটা বুঝছিলেন কেন তথু ওধু?’

‘সিরিয়াল নম্বর। যদি পুলিশ পারমিট দেয়া থাকে এটার জন্যে সহজেই মালিককে খুঁজে বের করবে পুলিশ।’

মাথা ভাঙা ছুরিটার দিকে চাইল রানা। ‘আপন মনেই বলল, পিস্তলকে ধুপা করে অনেক খুন্সী। বড় বেশি শব্দ হয়, নিরাপদে কাজ সাবতে আসেনা। কিন্তু তবু পিস্তল বেছে নিয়েছে খুন্সী। কেন? ছুরিটা ভেঙে গেছে বলে।’ বাইকভের দিকে চেয়ে বলল, ‘নরম রোডের ছুরি। খুবই কাজের, কিন্তু তাড়াতাড়ি করলে কিংবা হাড়ে লাগলে সহজেই ভেঙে যায়। সম্ভবত পাজরার হাড়ে আটকে গিয়েছে। হ্যাঁচকা টান মেরে খুলতে যাওয়ায় ভেঙে গেছে। একটা লাশের বুকের ভেতরে পাওয়া যাবে ছুরির ভাঙা ফলাটা।’

‘মানে... মানে আপনি বলতে চাইছেন আরও একজন লোককে খুন করা হয়েছে? এই ছুরি দিয়ে?’

মাথা ঝাঁকাল রানা। ‘প্রথম শিকার। ছুরিটা ভেঙে যাওয়ার ফলেই অগত্যা পিস্তল ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছে খুন্সী।’

‘ছুরি দিয়ে কাকে খুন করল?’

‘জানি না। জানার দরকারও মনে করছি না। কোন লাভ নেই।’

‘হঁহ! আপনি মনেই মাথা নাড়লেন কমান্ডার। তারপর মূব তুলে বললেন, ‘চলুন যাই। ব্যান্ডহাউস থেকে জাহাজে ফোন করি। কেউ এসে অজ্ঞান লোক দুটোর কাছে থাকুক। একেবারে জমে গেছি, জাহাজে ফেরা দরকার।’

‘ফোন করার দরকার নেই। আপনি গিয়ে কাউকে পাঠিয়ে দিন। ততক্ষণ আমি আছি। যান।’

‘মেজর রানা, গত রাতের সারারাত ঘুমাননি আপনি।’

‘একটানা কয়েক রাত না ঘুমানোরও অভ্যাস আছে আমার। আপনি যান, এখানেই থাকছি আমি। বড় নির্জন নীরব জায়গা। অনেক কিছু ভাবতে হবে আমাকে এখন। ভাবনার উপযুক্ত জায়গা এটা। যান আপনি।’

অদ্ভুত দৃষ্টিতে রানার দিকে চাইলেন কমান্ডার। বিদেশী এই লোকটাকে এখনও ঠিক বুঝতে পারেননি। কিন্তু আর তর্ক করলেন না। একবার কাঁধ ঝাকিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

ভাবনার কথা বলে কমান্ডারকে ভাগিয়েছে রানা, আসলে ভাবার কোন দরকার নেই তার। সময়ও নেই। অজ্ঞান দুই ভাইয়ের পাহারায়ও থাকল না। টর্চ লাইট নিয়ে বেরিয়ে এল আবার ঘর থেকে। বাইরে মেরু-অন্ধকার নামছে। ভীষণ ক্লান্ত আর একাধী বোধ করছে সে এখন।

‘আবার ল্যাবরেটরিতে এসে ঢুকল রানা। বিকৃত লাশগুলোর কাছে আবার ফিরে যেতে মোটেই ভাল লাগছে না তার, কিন্তু উপায় নেই। এ যতই আছে

কোথাও জিনিসগুলো, ও জানে। ভয়াবহ এই জায়গার বাতাস পরিবেশকে এড়িয়ে চলবে মানুষ, সেটাই স্বাভাবিক। কাজেই নিরাপদ জায়গা হিসেবে এই ঘরটাকেই বেছে নেবে খুন্সী, কোন সন্দেহ নেই।’

ল্যাবরেটরির দেয়াল খেঁবে দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি শেলফ, আলমারি। বিভিন্ন আকারের জার, বোতল, টেক্সট টিউব, স্টেন, বকযন্ত্র আর এমনি সব জিনিসে বোঝাই থাকলো। ওজলোর দিকে একবার চোখ তুলেও তাকাল না রানা। সোজা এগিয়ে গেল ঘরের কোণের দিকে, লাশগুলো যেখানে পড়ে আছে। আপপাশের আলমারি আর শেলফগুলোর ওপর বার কয়েক টর্চের আলো ফেলল, দেখল। না, ওসব জায়গায় থাকতে পারে না, ভাবল রানা। আলো ফেলল নিচের দিকে। সাংঘাতিক পোড়া তালগোল পাকানো দুটো মাংসপিণ্ড, যা এককালে দুটো মানুষ ছিল, পড়ে আছে একটা ফ্লোরবোর্ডের ওপর। কয়েকটা লাশ ভিত্তিয়ে ওদুটোর কাছে এগিয়ে গেল রানা। মনের সমস্ত জোর একত্রিত করে উবু হলো। বা হাতে তৈলে ফ্লোরবোর্ডের ওপর থেকে সরাল পোড়া মাংসপিণ্ড দুটোকে। নিজের অজান্তেই শিউরে উঠল একবার। বা হাতেই ফ্লোরবোর্ডের ঢাকনা ধরে টান দিল।

ছোটখাট একটা সুপারমার্কেট বসানোর তাল করেছিল যেন কেউ। অসাংখ্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রেরা ফ্লোরবোর্ডের ভেতরটা। বিভিন্ন পাত্রে সাজিয়ে রাখা হয়েছে ড্রাই সুপের প্যাকেট, গরুর মাংস, ফল, শাকসব্জি—এই বরফের দেশে মানুষের দেহে প্রয়োজনীয় ভিটামিন আর প্রোটিন সরবরাহ করতে পারে, এমন ধরনের খাবারই আছে ওখানে। ছোট একটা প্রেশার-স্টোভ আর কয়েক গ্যালন কেরোসিনও আছে। পাত্রগুলোর পাশে দুই সারিতে সাজিয়ে রাখা হয়েছে চকচকে নাইফ সেল, চল্লিশটা।

এখানে যা দেখার দেখা হয়ে গেছে। ফ্লোরবোর্ডের ঢাকনাটা আবার নামিয়ে রাখল রানা। বেরিয়ে এল ল্যাবরেটরির থেকে।

আবার আবহাওয়া অফিসে এসে ঢুকল সে। মেটাল কেবিনেটগুলোর পেছনের ফাঁপা বোর্ড সরিয়ে ভেতরটা দেখল। যা আশা করেছিল, নেই, কিন্তু একটা অদ্ভুত জিনিস পেল। একটা ছয় ইঞ্চি বাই চার ইঞ্চি সবুজ রঙ করা খাতব বাত্র। একটা গোল কনটোলার বসানো, সুইচ এবং টিউনার দুটোরই কাজ করে। দুটো গ্রাসড-ইন ডায়ালও বসানো আছে, কিন্তু কোন ধরনের চিহ্ন বা নম্বর নেই। বাত্রের এক পাশে একটা ছিদ্র, পিতলের পাতে ঢাকা।

সুইচ টিপে দিল রানা। সবুজ আলো জ্বলে উঠল একটা ডায়ালে। অন্য ডায়ালটায় কোন পরিবর্তন নেই। এটা এক ধরনের ম্যাজিক আই টিউনিং ডিভাইস, বুঝল রানা। কন্ট্রোল ঘুরিয়ে টিউনিং করতে লাগল সে, কিন্তু কোন কিছুই ঘটল না। তার মানে দ্বিতীয় ডায়ালটাকেও জাণ্ড করে তুলতে হবে। কিন্তু কি করে? ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জিনিসটা পরীক্ষা করে দেখল সে। ছিদ্রটায় টেলিফোনের স্ট্যাভাড প্রাণের পিন ঝাপে ঝাপে ঢুক যাবে, বোঝা যাচ্ছে। এই ধরনের জিনিস খুবই দুর্লভ, কিন্তু এর সঙ্গে রানার পরিচয় আছে। আমেরিকানরা একে বলে ‘সাগ্রাহ’ ডিভাইস। রোভিও সিগনালের বিকল্পীয় করতে এর তুলনা হয় না। বিজ্ঞানীরা এটা ব্যবহার করেন অন্য কারণে। কোন মহাকাশ-ফেরতা স্পেস ক্যাপসুল সাগরের কোথায়

এসে পড়ল খুঁজে বের করেন তাঁরা এই যন্ত্রের সাহায্যে।

কিন্তু এই জিনিষ কি কাজে ব্যবহৃত হত আইস টেশন নভেলিতে? আমেরিকানরা কোথায় রকেট কিংবা মিসাইল ছুঁড়ে, খুঁজে বের করার কাজে লাগত ইলেকট্রনিক যন্ত্রটর, সহায়তা করত বেলুন এরিয়াল, কিন্তু এই বুদে স্মল-রেঞ্জ জিনিসটা কি কাজে লাগত, বোঝা যাচ্ছে না।

টেকিলে রাখা পোর্টেবল রেডিও ট্রান্সমিটার আর তাঁর পাশের করিত-শক্তি নাইফ সেন্ডলোর দিকে চাইল একবার রানা। ডায়ালিং কাউন্টারে ওয়েভ ব্যান্ড শো করছে এখনও নির্দেশক-কাটা, এই ওয়েভ দেখেই লেনিনগ্রাদে সিগনাল পাঠিয়েছে বেডিও অপারেটর। এগিয়ে গেল রানা। নাইফ সেন্ডলোর নিকে তীক্ষ্ণ নজর দিল। নতুন কিছুই নেই। সারি দিয়ে বসিয়ে সিরিজ কানেকশন করা হয়েছে ব্যাটারিগুলোকে। নিকেল-ক্যাডমিয়াম সেন্ডলোর পরস্পরের সঙ্গে সংযোগ সৃষ্টিকারী রবারকোটেড তারের দণ্ডা-মোড়ানো মাথা নিয়ে অটোকানো হয়েছে রেডিও টারমিনালের সঙ্গে। পেঁচিয়ে কিংবা আলাই করে নয়, অটোকানো হয়েছে শক্তিশালী শিপ্রং-লোডেড স-টুথ ক্লিপ দিয়ে। লিলিপুট-কুমিরের চোয়ালের মত অবিকল দেখতে এই ক্লিপ চমৎকার জিনিষ। বিদ্যুৎ-শক্তি সামান্যতম অপচয় হবার জো নেই এই ক্লিপ ব্যবহার করলে।

ক্লিপ দুটো খুলে মিল রানা। টর্চের আলো ফেলে নুয়ে ভালমত পরীক্ষা করে দেখল টারমিনাল। ক্লিপের দাঁতের দাগ আছে টারমিনালের গায়ে, অতি সূক্ষ্ম।

আবার গিয়ে স্যাবরেটরিতে ঢুকল রানা। লাশ ভিত্তিতে গিয়ে ফ্লোরবোর্ডের ঢাকনা তুলল। বসে পড়ে টর্চের আলোয় পরীক্ষা করতে লাগল নাইফ সেন্ডলোকে। সেন্ডের কাপ এবং তলার পর্দায় তীক্ষ্ণ ধাতব কিছুর ঘোড়া কিংবা ঘষা লাগার চিহ্ন বর্তমান। তারমানে ওগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। যদিও খুবই অল্প সময়ের জন্যে, কিন্তু ব্যবহার হয়েছে ঠিকই।

কয়েকটা ব্যাটারি খুলে পরীক্ষা করে দেখার পর আবার ওগুলো আগের জায়গায় রেখে দিতে গেল রানা। হাত থেকে বসে পড়ল একটা ব্যাটারি, ফ্লোরবোর্ডের মেঝেতে পড়ে ফাঁপা আওয়াজ হলো। আদে, নিচে আরও কুঠুরি আছে মনে হচ্ছে।

জিনিসপত্র সরিয়ে ধাতব মেঝেটা নিয়ে টানাটানি করতেই উঠে এল ওটা, আসলে মেঝে নয়, আরেকটা ঢাকনা। নিচে আরেকটা কুঠুরি আছে। সিলিন্ডারের মত জিনিসটা পাওয়া গেল ওখানেই। ছত্রিশ ইঞ্চি মত লম্বা আর ছয় ইঞ্চি বাস। পিতলের স্টপকক আছে, শ্রেণার গজ শো করছে 'ফুল'। ওটার পাশেই পড়ে আছে একটা প্যাকেট, আঠারো বাই আঠারো ইঞ্চি এবং চার ইঞ্চি পুরু। ওপরে স্টেনসিল করে লেখা: 'রেডিও-সনডে বেলুনস'। খাবার-দাবার, ব্যাটারি, হাইড্রোজেন সিলিন্ডার, বেলুন-বাং, চমৎকার সব জিনিষ।

এখানে যা দেবার দেখে নিয়েছে। সব কিছু আবার আগের মত শুছিয়ে রাখল রানা। তারপর বেরিয়ে এল বাইরে। বাহুহাউসের দিকে বণ্ডা দিল।

বরফের দেশে আবার নেমেছে। এতক্ষণ উত্তেজনার মধ্যে ছিল বলে চেয়ারমই করেনি, এখন ঠাণ্ডাটা টের পেল রানা হাড়ের মধ্যে। বাইরে বেরোনোর এক

সেকেন্ডের মধ্যেই হি-হি করে কাঁপতে লাগল। স্রুত পা চালিয়ে এসে ঢুকল বাহুহাউসে। দাঁতে দাঁতে বাড়ি যাচ্ছে। বিশাল হিটারটার ওপর এসে প্রায় ব্যাপিয়ে পড়ল সে।

হাত-পা-গা কিছুটা গরম করে নিয়ে আবার উঠল রানা। টর্চ হাতে বেরিয়ে পড়ল আবার। গতি বেড়েছে বাতাসের। ঠাণ্ডার সূঁচগুলো আবার জ্যান্ত হয়ে উঠেছে। গরম লোশাকের ফাঁক দিয়ে ঢুকে যাচ্ছে ভেতরে, বিধছে জায়গামত।

পরের বিশ মিনিটে পুরো ক্যাম্প এলাকাটায় টর্চ হাতে আধ ডজন বার চক্কর দিল রানা। প্রতিটি চক্করে কয়েক গজ করে বাস বাড়াল। ছয়বার চক্কর দিয়ে মাইলখানেক পথ অতিক্রম করেছে রানা, চিবুকে ফ্রস্ট-বাইটের হালকা আক্রমণ অনুভব করেছে এখন। আচমকা সমগ্র অনুভূতি হারিয়ে ফেলেছে চামড়া, তারমানে পাকাপোক্তভাবে কামড় বসাতে যাচ্ছে ঠাণ্ডা। আর দেরি করলে অসুবিধা হবে। ফিকল রানা। স্রুত পা চালানল ক্যাম্পের দিকে।

বাহুহাউসের দিকে চলার পথে আবহাওয়া অফিস আর ল্যাবরেটরির পূর্ব পাশ দিয়ে যাবার সময় টর্চের আলোয় অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ল বলে মনে হলো রানার। আবহাওয়া অফিসের পশ্চিম দেয়ালের নিচে এক জায়গায় বরফ একমেয়ে ধূসর-সাদা নয়, মাঝে মাঝে কালো কালো ছোপ দেখা যাচ্ছে। কোন দাগই এক বর্গ ইঞ্চির বেশি বড় নয়। এগিয়ে গেল রানা। বরফের এক ইঞ্চি নিচে সেনিয়ে আছে জিনিসগুলো। টর্চের আলোয় ঘোলাটে বরফের নিচ থেকে দেখা যাচ্ছে, পত্রিকারই বলতে হবে। আবহাওয়া অফিসের দেয়ালে আলো ফেলল রানা। তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করল। কিন্তু না, দেয়ালের কোথাও নেই কালো দাগ।

আবহাওয়া অফিসের ভেতরে গিয়ে ঢুকল আবার রানা। বেশিক্ষণ খোঁজাখুঁজি করতে হলো না, একটা হাতুড়ি আর জু-ডাইভার নিয়ে বেরিয়ে এল। কালো দাগওয়ালা বরফের একটা চাঙড় তুলে নিল হাতুড়ি আর জু-ডাইভারের সাহায্যে। সোজা নিয়ে চলে এল বাহুহাউসে।

মিনিট দশেক চেষ্টা করে হীটারের পাশে ফেলে রেখে পুরো গলিয়ে ফেলা গেল বরফের চাঙড়। পানির সরু একটা ধারা একেবেঁকে বইল বাহুহাউসের মেঝেতে। হীটারের উত্তাপের সীমানা ছাড়িয়েই আবার বরফ হয়ে গেল পানির ধারা। কালো দাগটা কিন্তু আসলে দাগ নয়, পোড়া কাগজের টুকরো। হীটারের পাশেই পড়ে আছে। ঘরের বাইরে বরফের মাঝে পোড়া কাগজের টুকরো। ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিকই মনে হলো রানার কাছে।

এতকণে দু'জন অজ্ঞান লোকের দিকে নজর দেবার সময় পেল রানা। এগিয়ে গিয়ে একবার পরীক্ষা করে দেখল। কবুলের তলায় গরমই আছে ওদের শরীর। দেখে মনে হয় আরামে ঘুমোচ্ছে, কিন্তু ডাক্তার না হলেও এটুকু বোঝার শক্তি আছে রানার, আগামী চক্ষিণ মন্টার ওদেরকে স্থানান্তরিত করার ঝুঁকি নেয়া যাবে না। এই প্রথম মনে পড়ল তাঁর, লেনিনগ্রাদ থেকে লোক পাঠাননি কমান্ডার।

আসলে তাই-কতও বুঝতে পেরেছেন, শুধু বসে বসে ভাবার জন্যে একাকী বাহুহাউসে রয়ে যাচ্ছিল রানা, কিছু একটা করলে। যার জন্যে একাকী থাকার প্রয়োজন অনুভব করেছে সে। এটা বুঝতে পেরেই যমজ ভাইদের কাছে বসে

লেনিনগ্রাদ-২

থাকার লোক পাঠাননি। অনুমান করেছেন, ডাকবে রানা।

ঠিকই ডাকল রানা। ফোন তুলে লোক আসতে দেবি হচ্ছে কেন জানতে চাইল সে। লেনিনগ্রাদ থেকে দু'জন নাবিক এসে পৌছতেই জাহাজে ফিরে গেল।

ছয়

বিশ্বয় এক বিকেল। ক্রেমন যেন প্রথমত্রে ভৌতা পরিবেশ লেনিনগ্রাদের ভেতর। এতদিন উত্তেজনার ভেতর কাটিয়েছে জাহাজের প্রতিটি লোক, ভেবেছে, আইস স্টেশন নভেলির কথা। এখন স্টেশনের খোঁজ মিলেছে, আহতদের উদ্ধার করে জাহাজে নিয়ে আসা হয়েছে। এমনতেই সাবমেরিনে জীবন খুব একটা প্রাণবিক বা আনন্দের নয়, তার ওপর এই বরফের দেশে অনিশ্চিত অবস্থার মাঝে কতগুলো পোড়া-অধপোড়া, ফুস্ট-বাইটের শিকার রোগীকে জাহাজে নিয়ে হালকা পরিবেশ আশাও করা যায় না। তাছাড়া ক্রুদের অনেকেরই বন্ধু টর্পেডোমান বুলিনের মৃত্যু হয়েছে মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে। এখনও জাহাজেই আছে লাশটা। লোকেরা জানে, এর সঙ্গে যোগ হয়েছে আরও তিনটে লাশ। ক্রুদের কেবিনে বড়িও বাজছে না, টেলিভিশনের অনুষ্ঠান দেখার মত মনের অবস্থা কারও নেই। পুরো জাহাজটাকে একটা বিশাল আলোকিত কবরের মত মনে হচ্ছে।

কম্বডকে তার কেবিনেই খুঁজে পেল রানা। বাকের কিনারে চুপ করে বসে আছে লেফটেন্যান্ট, পরনে এখনও ফারের ট্রাইজার, কঠিন শীতল চেহারা। নীরবে বসে বসে রানাকে পারকা খুলতে দেখল কম্বড। খালি শোস্তার হোলস্টারটা খুলে নিয়ে পারকার সঙ্গে ছকে মুলিয়ে রাখল রানা। ট্রাইজারের পকেট থেকে পিস্তলটা বের করতেই হঠাৎ কথা বলল কম্বড, 'ওগুলো খুলো না, ডাক্তার, বাইরে ভীষণ ঠাণ্ডা।'

'কোথায় যাচ্ছ...'

'কবর দিতে। নভেলির পোড়া লাশগুলোর কথা তুলে গেলেন? ওদেরকে কবর দিতে হবে না? কি হতভাগা বেচারারা! দেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে, আত্মীয়স্বজন কেউ দেখল না, কফিন নেই, কাবও চোখের পানি নেই, ক'জন হতভাগা নাবিক গিয়ে ত্রো বার দিয়ে বুঁচিয়ে গর্ত করে তার ভেতরে ওইয়ে দিয়ে আসবে, ঘড়ি দেখল সে, 'এতক্ষণে গর্ত খোঁড়া হয়ে গেছে নিশ্চয়।'

'কই, বাইরে কাউকে তো দেখলাম না।'

'খোঁজ করোনি হয়তো। পশ্চিম দিকেই গেছে ওরা?'

কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। একই কথা ডাকছে দু'জনে। মনের পর্দায় ভেসে উঠেছে পোড়া বিকৃত লাশগুলোর চেহারা।

খাপে পোরা রানার ওয়ালখারটার দিকে তাকাল, একবার কম্বড। মাউ মাউ মাউন জুলছে চোখের মণিতে। জাপা, কঠিন, হাঁচা গলায় বলল সে, 'ওল্লোরের বাক্স! রানা, ক্রেমন যেন ছটফট করে উঠল কম্বড, 'ওই শয়তানের বাক্স! এখনও

এই জাহাজেই আছে, না? প্রীজ, ওধু নামটা বলো, কে?'

'জানলে তোমার অপেক্ষায় থাকতাম?' নিষ্ঠুর হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটে। কথার মোড় ঘোরাল, 'হ্যাঁ ভাল কথা, ক্রুডেনকো রোগীদের ক্রেমন দেখাশোনা করছে?'

'ভানই। একটা আগে ওর ওখান থেকে এসেছি।'

হাত বাড়িয়ে হোলস্টার থেকে আবার পিস্তলটা বের করে নিল রানা, আবার ক্যাবিট্র ট্রাইজারের পকেটে ভরে রাখল।

'শান্ত কর্তে বলল কম্বড, 'এখানেও?'

'এখানেই এখন বেশি দরকার এটা।'

কেবিন থেকে বেরিয়ে এল রানা। সার্জারির দিকে চলল। আর্ট গ্যালারির রঙীন একটা কার্টুন ছবির দিকে পেছন করে নিজের টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে আছে ক্রুডেনকো। একটা খোলা বইয়ের পাতায় মন বসানোর চেষ্টা করছে। পেছনে দরজা বন্ধ করার শব্দে ফিরে চাইল সে।

'কি খবর?' স্থপকরা পুরানো কাপড়গুলোর দিকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

'ইনটারেস্টিং কিছু নেই। তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে লেফটেন্যান্ট কম্বড। দেখুন আপনি কিছু পান কিনা।'

মেঝেতে ফেলে রাখা হয়েছে আহতদের গা থেকে খুলে নেয়া কাপড়চোপড়। ভাঁজ করে প্রতিটির গায়ে নিখুঁত লেবেল আটকানো হয়েছে। কাপড়ের গাদার পাশে কয়েকটা ছোট অ্যাটাচি কেস, আর কিছু পলিথিনের ব্যাগ রাখা। ওগুলোতেও লেবেল লাগানো।

'যমজ দুই ভাইয়ের খবর কি?'

'ভানই দেখে এসেছি। তবে এখনই নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না, কাপড়ের গাদার কাছে এসে বসে পড়ল রানা। জানে কিছু পাবে না, তবু একটা একটা করে প্যান্ট-শার্ট তুলে নিয়ে পকেট হাতডাল। কিছু নেই। লাইনিঙের প্রতিটি ইঞ্চি টিপেটুপে দেখল, নেই ওখানেও। অ্যাটাচি আর পলিথিনের ব্যাগগুলো খুলল। খুঁজে দেখল আহতদের ব্যক্তিগত প্রতিটি জিনিস, শেভিং কিট, চিঠিপত্র, ফটোগ্রাফ, গোটা তিনেক ক্যামেরা। ক্যামেরার চেম্বার খুলে ভেতরটা দেখল, খালি। চোখ তুলে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'ডাক্তার জ্যাকভের মেডিক্যাল কেসটা ওর সঙ্গেই আছে?'

'কাউকে আপনি বিশ্বাস করেন না, না? এমনকি একজন ডাক্তারকেও না?'

'না।'

'অমিও না,' হাসল ক্রুডেনকো। ঠোঁট দুটো সামান্য ফাঁক হলো ওধু। 'আপনার ইভিল ইনফ্লুয়েন্স। জ্যাকভের ব্যাগটা এক ফাঁকে পরীক্ষা করে দেখেছি আমি। ভেতরের প্রতিটি জিনিস দেখেছি। এমনকি তলার পুরু ডামড়ার আন্তরকও টিপেটুপে দেখেছি। সন্দেহজনক কিছুই নেই।'

'আমাকে আর হাতড়াতে হবে না তাহলে। তা আপনার রোগীরা ক্রেমন আছে?'

'রোগী মানে তো পুরো এক হাসপাতাল। নয়জন...না না...' এদিক-ওদিক

দেখে নিয়ে ফিসফিস করে বলল কুডেনকো, 'দশ। তারই আছে। নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে গেছে, এই সন্ধিতেই অর্ধেক রোগ সেরে যায়।' হাত বাড়িয়ে টেবিলে রাখা কার্ডগুলো কাছে টেনে এনে সবচেয়ে ওপরেরটা তুলে নিল। দেখতে দেখতে বলে গেল, 'ক্যাপ্টেন কুমারের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। ভয়ের কিছু অবশ্য নেই, কিন্তু তার মুখের পোড়া ক্ষতগুলো সত্যিই জঘন্য হয়ে উঠেছে। তার ওপর ফ্রন্ট-বাইট। ডকে পৌঁছেই মস্তকের প্রাস্টিক সার্জনের কাছে পাঠাতে হবে। দুই যমজ নিফেচ-এর অবস্থা তো জানেনই। সুবিধে এই, যে বেশি পোড়েনি ওরা। নভেলির মেট-অফিসার দু'জনও তেমন পোড়েনি। কিন্তু ক্ষুধা আর শীতে সাংঘাতিক কাহিল হয়ে পড়েছে। উপযুক্ত খাবার ছাড়া, গরম কবনের তলায় শুয়ে বিধাম নিলে আগামী দু'দিনেই সেরে উঠবে, আশা করছি। কসমোপড, আরেকজন মেট অফিসার, এবং ল্যাব টেকনিশিয়ান সেগেই বুয়েলের অবস্থা ওদের সবার চেয়ে ভাল। মডারেট বার্নস, মডারেট ফ্রন্ট-বাইট। দেখে পরিস্থিতিই বোঝা যায়, শীত আর ক্ষুধা কাহিল করতে পারেনি এদের দু'জনকে। অথচ দুই যমজ—যাকগে, একেক জনের সহ্য ক্ষমতা একেক রকম। বাকি—সিনিয়র বেডিও অপারেটর কুডিন, ডাক্তার জ্যাকভ, বাবুটি আনাতালি, ট্রাষ্টার ড্রাইভার আলেক্সি—ও বলতে ভুলে গেছি, জেনারেলের দৈন্যশোনাও সে-ই করত—এই চারজনের বেশ কয়েক জায়গায় পুড়েছে, ফ্রন্ট-বাইটও ছাড়েনি। একটু দুর্বল অবশ্যই, কিন্তু শীঘ্রই ঝাড়া হয়ে উঠবে। ব্যস কম এদের চারজনেরই, গায়ে গতেরও তাগড়া জোয়ান। আসলে শয্যাশায়ী বলতে ক্যাপ্টেন কুমারও আর যমজ দুই ভাই, এই তিনজনই।' একটু থেমে আবার এদিক-ওদিক দেখে নিল ডাক্তার। তারপর গলার দর খাদে নামিয়ে বলল, 'আপনার দোস্তের তো বেড়ালের জান। কিছুতেই মরতে চান না। আশা করছি, ঝাড়া হতে বেশি দিন লাগবে না। বড়জোর সাত দিন। কিরিমের বেঁচে যাওয়াটা একটা অলৌকিক ব্যাপারই বলতে হবে। মুসলিমদের একটা প্রবাদ আছে শুনেছি: রাখে আল্লা মাঝে কে। প্রবাদটা ফলে যাচ্ছে আজামাত কিরিমের বেলায়। গুলি, শীত, আতুন—সব কাটিয়ে বেঁচে থাকবেন বলে যেন জেদ ধরেছেন তপ্তলোক।'

দরজায় নক করে উকি দিলেন কমান্ডার রাইকভ। রানাকে দেখে বললেন, 'ফিরে এসেছেন?' তারপর কুডেনকোর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ছোট্ট একটা সমস্যা, ডাক্তার।' পেছনে তাকিয়ে সরে জায়গা করে দিলেন কমান্ডার। পেছন থেকে তাঁর পাশে এসে দাঁড়াল আইস স্টেশন নভেলির বাবুটি আনাতালি। রাশিয়ান নৌ-বাহিনীর পোর্ট অফিসারের পোশাক পরনে, আর কোন পোশাক তার গায়ে ফিট হচ্ছে না হয়তো। বাবুটিকে দেখিয়ে বললেন রাইকভ, 'কি করে জানি ওনে ফেলছে ও, বাইরে এক অনুষ্ঠানে যাচ্ছি আমরা। ব্যস, এসে ধরেছে আমাকে। মৃত সঙ্গীদের শেষ বিদায় জানাতে যাবেই। মানা করি কি করে বলো? এমনতেই শরীর খারাপ। অবশ্য তুমি যদি অমত—'

'আমি একেবারেই বাজি নই, ক্যাপ্টেন,' বেশ জোরে সাপেই অমত প্রকাশ করল কুডেনকো।

'আপনার অমতে কিছুই এসে যায় না, ডাক্তার,' বাবুটিকে ঘাড়ের ওপর দিয়ে উকি দিল রেডিও অপারেটর কুডিন। 'আমরা যাচ্ছি। বিশেষ করে আমাকে তো

কিছুতেই ঠেকাতে পারবেন না। মিশকা সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল আমার।'

'জানি, কেমন লাগছে আপনাদের,' সহানুভূতি ঝরল কুডেনকোর কণ্ঠে, 'কিন্তু শরীরের যা অবস্থা! শুয়ে থাকে ছাড়া আর কোন কাজে কিছুতেই মত দিতে পারি না। মহা সমস্যায় ফেললেন দেরি আমাকে।'

'আমি এই জাহাজের ক্যাপ্টেন,' মোলায়েম গলায় বললেন কমান্ডার, 'ডাক্তারের কথা নাহয় শুনলে না তোমরা, কিন্তু আমার আদেশ তো আর অমান্য করতে পারবে না।'

'আপনি আমাদের মহা সমস্যায় ফেলছেন, কমরেড ক্যাপ্টেন,' বলল কুডিন, 'কিন্তু দলবেধে এসে আপনার বিরুদ্ধে ধর্মঘট করছি না আমরা, কমরেড, করজোরে আরজি জানাচ্ছি।'

ভুরু কুচকে রানার দিকে চাইলেন কমান্ডার, 'আরেকজন ডাক্তারের মতামত শোনা যাক?'

'ডাক্তার কুডেনকোর নির্দেশ অমান্য করা উচিত হবে না ওদের,' বলল রানা। 'কিন্তু সামান্য ব্যাপারে জাহাজে সিভিল-ওঅর বাধিয়েও লাভ নেই। পাঁচ-ছ'দিন যখন টিকে থাকতে পেরেছে ওরা, আর কয় মিনিট বাইরে কাটাতে মরে যাবে না।'

'বেশ,' স্বস্তির শ্বাস ফেললেন কমান্ডার, 'কিন্তু যদি এদের কারও কিছু হয়, আপনি দায়ী থাকবেন, ডক্টর মাসুদ রানা।'

অন্তোষ্ঠিক্রিয়ার জন্যে একেবারেই অনুপযুক্ত জায়গা আইস ক্যাপ। কিন্তু এখানে, এই দুর্গম বরফের দেশে ড্রাম বাজিয়ে কফিন-শোভাযাত্রা আশাও করে না কেউ। লেনিনস্থানের আরামদায়ক উচ্চতা থেকে বাইরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় হঠাৎ বেরিয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ধর ধর কাঁপুনি উঠল ওদের। পাচ ধমধমে অন্ধকার চারদিকে। বাতাসের বেশ আরও বেড়েছে। আবার জ্যাক হয়ে উঠেছে তুষার-কণা। বাতাসের গতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভাদ নৃত্য শুরু হয়েছে তুষারেরও।

লেনিনস্থানের নার্চ লাইটের তীর আলো ভৌতিক ওই পরিবেশকে আরও ভৌতিক ঘোলাটে নাটকীয় করে তুলেছে। বরফ ঝোড়া গর্তগুলোকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে শোকর্তরা, মাথা নিচু। তাদের পায়ে কাঁচ কাঁচ কানভাস মোড়ানো লাগন্তলো পড়ে আছে। বাইবেলের একটি শ্লোকও উচ্চারিত হলো না, বিড় বিড় করে কিছু বললেন কমান্ডার, কিন্তু তুষার মেগানো ঝড়ো বাতাসের সাই সাই শব্দের জন্যে কিছুই বোঝা গেল না।

হঠাৎই শেষ হয়ে গেল সব কিছু। রাইফেল-গ্যালুট নেই মৃতের সম্মানে, বিউগলের করুণ আওয়াজ নেই, শুধু নিব্বান শূন্যতার মাঝে ঝোড়ো বাতাসের আর্তনাদ। মৃত কাজ সমাধা করল মৃতের দিতাকাকীরা। তাড়াহাড়ি কিছু বরফের টুকরো গর্তে ফেলেন কর্তব্য শেষ করল। কানভাসের বেশির ভাগই উন্মুক্ত রয়ে গেছে। কিন্তু জানে ওরা, বড়জোর চম্পিশ বঁটা। আগামী চম্পিশ ঘন্টার মধ্যেই তুষারে ঢেকে যাবে গর্ত, কঠিন বরফে রূপ নিয়ে গর্তের চির মুখে দেবে চিরতরে। বরফের ওই কবরে কে জানে কতদিন একই আবেগ রয়ে যাবে লাগন্তলো। এখন যেভাবে রেখে যাওয়া হচ্ছে, ঠিক তেমনি ভাবেই। হয়তো, কে জানে, হাজার বছর

পরে কোন একদিন কোন কারণে বরফ সরে আসবে ওখান থেকে খোলা সাগরে, গলে যাবে, টপ করে বরফের কবর থেকে পানিতে খসে পড়বে লাশগুলো, তলিরে যাবে মেরু-সাগরের নিচে।

জীবনে বিষয় করণ পরিবেশ অনেক দেখেছে রানা, কিন্তু এমনটি দেখেনি কোনদিন। মনেপ্রাণে প্রার্থনা করছে সে, আর যেন কোনদিন দেখতে না হয়। ভয়ঙ্কর একটা চাপা আক্রোশ ফুসছে তার বুকের ভেতর। নিজের অজান্তেই কঠিন হয়ে উঠেছে চোয়াল। কতখানি অমানুষ হলে এমন কাজ করতে পারে মানুষ? হাজার 'ইজম' এর দোহাই দিলেও রানা কোনদিন মানতে পারবে না এই অন্যায়, এই অমানুষিকতা—না কমিউনের, না ক্যাপিটালের।

মাথা নিচু করে, তুষার-মেশানো বাতাসের আক্রমণ এড়ানোর কার্য চেষ্টা করতে করতে জাহাজের দিকে রওনা দিল ওরা। বরফের গায়ে ঠেকে থাকা সাবমেরিনের সেইলের ছাদ বরফ-সমতল থেকে বিশ ফুট উচুতে। প্রায় বাড়া এই সেইলের ছাদে ওঠার জন্যে লোহার সিঁড়িতে হ্যান্ড-গ্রিপ অবশ্যই আছে। দড়িও কুলিয়ে রাখা হয়েছে পাশাপাশি, বাড়তি সুবিধের জন্যে। কিন্তু তবু উপরে ওঠা এখন ভয়ানক বিপজ্জনক। বরফ জমে জমে পিচ্ছিল হয়ে আছে লোহার সিঁড়ি, হ্যান্ড-গ্রিপ। জমে লোহার শিকের মত কঠিন হয়ে আছে দড়ি। ওদিকে ঝোড়ো বাতাসের দাপট। সিঁড়ি বেয়ে সেইলে উঠতে গিয়ে যে কোন মুহূর্তে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।

ঘটলও।

একের পর এক উঠে যাচ্ছে ওরা সিঁড়ি বেয়ে। ছয় ফুট মত উঠেছে রানা, তার ঠিক নিচেই ম্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান সের্গেই ব্যুল। একটা হাত পড়ে গেছে, কাজেই একা পিচ্ছিল সিঁড়ি বেয়ে ওঠা তার পক্ষে অসম্ভব। ওপরে থেকে তাকে উঠতে সাহায্য করেছে রানা। এই সময় মাথার ওপরে একটা চাপা চিৎকার শোনা গেল।

ওপর দিকে তাকাল রানা। অন্ধকারে, মনে হলো সেইলের কিনারের দাঁড়িয়ে তারুসামা রক্ষার জন্যে প্রাণপন লড়ছে একটা ছায়া। কিন্তু পারল না। পিছনে নিচে পড়তে শুরু করেছে ছায়াটা। বিপদের গন্ধ পেয়ে গেছে রানা। চকিতে অনুমান করে নিল, ছায়াটা ব্যুলের ওপর এসে আছড়ে পড়তে পারে। তাহলে ব্যুলকে নিয়ে গভিয়ে পড়বে নিচে। টেকনিশিয়ানের কাজে হাতের চাপ বাড়াল রানা, হ্যান্ড-গ্রিপ ধরল যতটা সম্ভব আরও শক্ত করে।

রানার মাথা আর পিঠের কয়েক ইঞ্চি ওপর দিয়ে তীব্র গতিতে গিয়ে নিচে বরফে আছড়ে পড়ল ভারী কিছু। ময়দার বস্তা পড়ার মত একটা চাপা শব্দের পর পরই শোনা গেল তীব্র আরেকটা আওয়াজ। প্রথমে দেহ তাকপরে মাথা, ভাবল রানা। হঠাৎ অনুমানই—নিশ্চিত হতে পারল না সে, এই দুটো শব্দের পর পরই অস্পষ্ট আরও একটা শব্দ ওনেতে পেল বলে মনে হলো তার।

রানার ঠিক ওপরের লোকটাকে ডেকে ব্যুলের তাকটা ধরিয়ে দিল রানা। তারপর পাশ কাটিয়ে নিচে নেমে এল। যেই পড়েছে, কপালে দুঃখ আছে তার। সেইলের ছাদ থেকে এখন নিচের বরফে পড়া আর লোহার ছাদ থেকে কতদূর

মেঝেতে আছড়ে পড়া সমান কথা।

রানা ব্যুলের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে দিতেই নিচে নেমে গেছে রক্তভ। রানা সেখানে পৌছানোর আগেই টপ জ্বলে ফেলেছে সে। দেখল রানা, একটা নয়, দুটো দেহ পড়ে আছে বরফের ওপর। নির্ধর, নিশ্চয়, কোন মড়াচড়া নেই। ডাক্তার রুডেনকো আর ডাক্তার জ্যাকড।

'কি হয়েছিল, দেখেছ?' কবুতকে জিজ্ঞাস করল রানা।

'না। খুব বেশি ভাড়াভাড়ি ঘটে গেছে। এটুকু খেয়াল করেছি, ওপরে উঠেছিল রুডেনকো। কোন কারণে পড়ে গেছে, পড়ার সময় জ্যাকডকে নিয়ে পড়েছে। আমার পাশেই ছিল জ্যাকড।'

'তার মানে রুডেনকোর জান বাচিয়ে দিল জ্যাকড। ও নিচে পড়েছে, তার ওপর পড়েছে রুডেনকো। ছাদ থেকে সরাসরি নিচে পড়লে ছাত্ত হয়ে যেত তোমাদের ডাক্তার। তা হেঁচাচেরে জন্যে বলতে হয় এখন। দড়িতে টেকচার বেধে ওদের কুলিয়ে কুলিয়ে তুলতে হবে।'

'কেন, ইশ ফিরবে না?'

'একজনের ফিরবে, কিন্তু অন্যজনের একটু দেরি হবে। কোনজন ঠিক জানি না। তীব্র শব্দটা শোনেনি? বরফে মাথা ঠুকে যাবার আওয়াজ।'

রক্তভ চলে গেল টেকচারের জন্যে। রুডেনকোর পাশে গিয়ে বসল রানা। ডাক্তার কোটের মাথার কাছটা একপাশে সরিয়ে দিল। মাথার ডান পাশে, কানের ইঞ্চিখানেক ওপরে তিন ইঞ্চি জায়গা নীলচে-কালো হয়ে গেছে। চামড়া ফেটে রক্তও বেরিয়েছে সামান্য, কিন্তু ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে আরও রক্ত বেরোনো বন্ধ করে দিয়েছে। আর ইঞ্চি দু'য়েক সামনের দিকে আঘাতটা লাগলে, বরফে আরেকটা কবর খোঁড়ার দরকার হত। রুডেনকোর খুলি অস্বাভাবিক শক্ত, অনুমান করল রানা।

ঘন ঘন হালকা ভাবে বইছে রুডেনকোর শ্বাস-প্রশ্বাস। তবে নাড়ির গতি ঠিকই আছে। জ্যাকডের অবস্থা রুডেনকোর চেয়ে ভাল। তার আনোরাকের হৃদ টেনে সরিয়ে দিল রানা। টর্চের আলোয় পরীক্ষা করে দেখল। বা দিকে মাথার খানিকটা জায়গা গোল হয়ে ফুলে উঠেছে। আছড়ে পড়ে বাড়ি খেয়েছে ওখানটাতেই। তার মানে তৃতীয় মদু শব্দটা ঠিকই ওনেছে রানা, অনুমান নয়।

দুই বেহঁশ ডাক্তারকে টেকচারে বেধে নিতে মিনিট দশেক লাগল। ওদের দু'জনকে ভেতরে নেবার পর সিক-বেতে আরও কিছু কট এনে পাতা হলো। দুই ডাক্তারকে পাশাপাশি শোয়ানো হলো দুটোতে।

শক্তিত কমাতার রাইকত রানার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করল রানা। প্রথমে ধরল রুডেনকোকে। ওর ব্যাপারে কথাসাধা করে ধরল জ্যাকডকে। সবে কতে আইয়োডিন লাগিয়েছে, এমন সময় চোখ মেলল জ্যাকড। মুখ বিকৃত করে চকিতে হাত নিয়ে গেল মাথার পেছনে। উঠে কলার চেঁচা করল, কিন্তু বাধা দিল রানা।

'ওহ, হুট, আমার মাথা।' কলিয়ে উঠল জ্যাকড। কয়েকবার চোখ বুজল-খুলল। নে। তারপর একবার মাথা ঝাড়া দিয়ে তাকাল রানার দিকে। সেখান থেকে পাশে

ফেরাল দৃষ্টি। রুডেনকোকে দেখে বড় বড় হয়ে গেল চোখ, বিশ্বাস করতে পারছে না যেন। ফিসফিস করে বলল, 'বৌচে আছে তো? কে এমন করল?'

'কি করল?' পাখী প্রশ্ন করলেন রাইকভ।

'ডাক্তার রুডেনকোকে আমার ওপর ফেলল কে?'

'মনে করতে পারছেন না?'

'মনে?' অস্বস্তি বোধ করছে জ্যাকভ। 'না, না তো...' কটে ওয়ে থাকা রুডেনকোর দিকে আবার চোখ পড়তেই থেমে গেল। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে, ও... ডাক্তার রুডেনকো পড়েছিল আমার ওপর।'

'ঠিকই বলেছেন,' বলল রানা, 'ওকে ধরার চেষ্টা করেছিলেন?'

'ধরার চেষ্টা? না। সময়ই পাইনি। চোখের পলকে ঘটে গেল ব্যাপারটা। ও আমার ওপর এসে পড়ল, তারপর আর কিছু মনে নেই,' রুডেনকোর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'বেশি ব্যথা পেয়েছে?'

'পেতে পারত। কপাল ভাল, বৌচে গেছে। আপনারও কপাল ভাল ডাক্তার, মরতে মরতে বৌচে গেছেন। তা, কষ্ট হচ্ছে খুব?'

'না, তেমন কিছু না,' উঠে বসল জ্যাকভ, 'আপনাকে সাহায্য করব?'

'আপনাকে ওসব এখন ভাবতে হবে না,' বললেন কমান্ডার রাইকভ, 'খেয়ে নিয়ে যুম দিন। পাখী বারো ঘণ্টা। ওয়ার্ডরুমে খাবার দিতে বলে দিচ্ছি আমি।'

'ঠিক আছে,' হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে শ্রান হাসল জ্যাকভ। কট থেকে নেমে দাঁড়াল। 'বারো ঘণ্টা যুম সত্যিই দরকার আছে আমার।'

মাথা ঝাড়া দিল জ্যাকভ। নিজেকে পায়ের ওপর ঝাড়া বাবার চেষ্টা করছে। একটি সূঁচির হয়ে নিয়ে হাঁটতে আক্রমণ করল। চলে গেল ওয়ার্ডরুমের উদ্দেশ্যে।

'এখন?' দরজা বন্ধ করে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে রানার দিকে চাইলেন রাইকভ।

'অনুসন্ধান করুন, পড়ার আগের মুহূর্তে রুডেনকোর কাছাকাছি কে ছিল। ওর জান ফিরে এলে অবশ্য ওর মুখ থেকেই জানা যেতে পারে।'

'কি বোঝাতে চাইছেন?' রানার দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে প্রশ্ন করলেন কমান্ডার।

'ও কি আপনাপ্রাণ পড়েছিল, নাকি খাঙ্কা মারা হয়েছিল, জানতে হবে না?'

'খাঙ্কা! ভুল কৌচকালেন কমান্ডার, 'কে? কেন?'

'কে সাত-আটজন লোককে খুন করল নভেলিতে? কেন?'

'হাঁ,' আর কোন কথা বললেন না রাইকভ। দীর্ঘ এক মুহূর্ত রানার চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর ঘুরে দাঁড়ালেন।

রুডেনকোর কাছে একটা চেয়ারে বসল রানা। কটে ওয়ে থাকা ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে গভীর ভাবে ভাবছে কিছু।

পনেরো মিনিট পরে ফিরে এলেন রাইকভ। মনে দুঃখই পেছেন দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন রানার সামনে।

'সূঁচি দিয়ে করতে পারেননি,' বলল রানা।

'টেলিগ্ৰাফি জানেন নাকি আপনি?' শ্রান হাসলেন রাইকভ। 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন, সূঁচি দিয়ে করতে পারিনি। তবে এটুকু জেনেছি, চীফ টার্পেডোমান ফিউদর

সুমিপভ রুডেনকোর আগে রিজ্ঞে পৌঁছেছিল। আচমকা চিৎকার শুনে ঘুরে চোরেই আবছা দেখতে পায় উল্টো পড়ে যাচ্ছে কেউ। অন্ধকারে কে পড়ছে, ঠিক ঠাইর করতে পারেনি সে। চিৎকারটা অবশ্য রুডেনকোর বলেই মনে হয়েছে সুমিপভের।

'উল্টো পড়ল? আশ্চর্য! আপনমনেই বলল রানা। 'শরীরের বেশির ভাগই সেইনের রিজ্ঞে উঠে এসেছিল রুডেনকোর। এই অবস্থায় উল্টো যাওয়া পিছলে যেতে পারত, কিন্তু তাহলেও দু'হাতে কোমি চেপে ধরে পতন ঠেকাতে পারত।'

'কোন কারণে ফিরে চেয়েছিল হয়তো,' বললেন রাইকভ। 'তাছাড়া সাংঘাতিক পিচ্ছিল হয়ে আছে কোমি, তুলে যাচ্ছেন কেন?'

'রুডেনকো পড়ে যেতেই কিনারে ছুটে এসেছিল বুদ্ধি সুমিপভ?'

'হ্যাঁ।'

'দশ ফুটের মধ্যে কাউকে দেখেছিল?'

'কি করে দেখবে? অন্ধকারে কিছু দেখা যাচ্ছিল না, সে তো আপনিও জানেন। দুই ডাক্তার পড়ে যেতেই নিচে টর্চ জ্বলেছিল। ওই আলো আরও অন্ধ করে দিয়েছিল তখন সুমিপভকে। তাছাড়া কে আছে না আছে দেখার চেয়ে, ট্রেনচার আনার চিন্তাই বড় হয়ে উঠেছিল তখন তার কাছে।'

'তারমানে অন্ধকারেই থেকে গেলাম।'

'তাই-ই মনে হচ্ছে।'

রুডেনকোর দিকে তাকিয়ে কি ভাবল রানা। কমান্ডারকে বলল, 'আজ রাতে গ্যাকোর কোন কাজ আছে?'

'কেন?'

'রুডেনকোকে আজ রাতে পাহারা দেবে।'

'পাহারা! গলার স্বরে কোন পরিবর্তন নেই কমান্ডারের, তবে দুই চোখের পাতা অতি সামান্য একটু বুজে এল। 'তার মানে আপনি শিওর, এটা অ্যান্ড্রিভেট নয়?'

'জানি না, তবে কোন ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না। ভয়ঙ্কর এক কিংবা একাধিক খুশী রয়েছে আমাদের মধ্যে। যদি সত্যিই রুডেনকোর ব্যাপারটা কোন দুর্ঘটনা না হয়ে থাকে, আবার আঘাত আসবে তার ওপর। এবং এবারে আর মিস করতে চাইবে না খুশী।'

'কিন্তু একজন ডাক্তার কার কি বিপদের কারণ হতে পারে? রুডেনকো সম্পর্কে যতটা জানি আমি, ওর কোন শত্রু নেই।'

'আপনার প্রশ্নের এখুনি কোন জবাব দিতে পারছি না, কমান্ডার। কিন্তু গ্যাকোকে চাই আমি। রুডেনকোর পাহারায় থাকতেই হবে আজ ওকে।'

'পাঠেন,' হাসলেন কমান্ডার। 'বেশি তর্ক করলে তো আবার মজোর ভয় দেখিয়ে বসবেন।'

রাইকভ চলে যাবার ঠিক দুই মিনিট পরেই এসে হাজির হলো গ্যাকো। হালকা বাদামী রঙের শার্টের ওপরে সারমেরিন-অফিসারের ওভারল পড়েছে। মুখ চোখ গভীর। তার স্বভাব অনুযায়ী রানাকে দেখে হাসল না। রুডেনকোর কটের

দিকে একবারও তাকান না গ্যাকো। সোজা এসে রানার সামনে দাঁড়ান, 'আমাকে ডেকেছ?'

'বলো, গ্যাকো।'

গ্যাকো বলল। তার প্যান্টের একদিকের পকেট উচু হয়ে ফুলে আছে। সেদিকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা, 'কি ওটা?'

এবারেও হাসল না গ্যাকো। বলল, 'সব সময়েই প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সঙ্গে রাখতে পছন্দ করি আমি।'

'এই বিশেষ যন্ত্রটা দেখি তো।'

দ্বিধা করল গ্যাকো। কি ভাবল, তারপর শাণ করল। পকেটে হাত ঢুকিয়ে টেনে বের করে আনল জিনিসটা। চকচকে ইস্পাতের একটা পাইপ রেক।

হাত বাড়িয়ে জিনিসটা নিল রানা।

'চমৎকার লোক তুমি, গ্যাকো,' বলল রানা, 'মানুষের মাথার খুলি কংক্রিটের তৈরি ভাবছ নাকি? এটা দিয়ে কারও মাথায় আলাতো করে একটা ঢোকা দিলেই খুনের দায়ে দড়িতে বুলবে তুমি।'

টেবিলে রাখা মেডিক্যাল ট্রে থেকে এক রোল ব্যান্ডেজ তুলে নিল রানা। 'রেকের মাথায় গুজু দশেক জড়িয়ে নিলে কার্যকারিতা কমবে একটু।'

'কি বলছ, ঠিক বুঝতে পারছি না,' যান্ত্রিক শোনাল গ্যাকোর কণ্ঠ।

'বুঝিয়ে দিচ্ছি,' গ্যাকোর অনুপস্থিতিতে এ-পর্যন্ত যা যা ঘটেছে সব বলল রানা সংক্ষেপে। সবশেষে জানান, 'কুডেনকোকে পাহারা দিতে হবে।'

কিছুই বলল না গ্যাকো। কিন্তু চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেছে। ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড নাড়া খেয়েছে। এই প্রথম কুডেনকোর কটের দিকে চাইল। তারপর আবার চোখ ফেরাল রানার দিকে।

'তোমরা মারাত্মক নয় কুডেনকোর আঘাত,' বলল রানা, 'তবে আজ রাতে ঠাঁশ না-ও ফিরতে পারে। দ্বিতীয়বারে আর তুল করতে চাইবে না খুনি, পাকাপোক্ত কাজ করবে।'

নিজেকে আবার স্বাভাবিক করে নিয়েছে গ্যাকো। চেহারা মতই গলাটাও যান্ত্রিক, 'তারমানে আমাদের দোস্ত আবার আঘাত হানতে চাইবে?'

'চাইবে, আমি, কমান্ডার রাইকত আর লেফটেন্যান্ট কুন্তত ছাড়া এখন আর কারও প্রবেশ সহ্য করবে না আজ রাতে। তবে দেখো, মরে না যায় আবার। হাঁশ ফিরলেই জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করতে হবে।'

'রেকের মাথায় দশগুজু ব্যান্ডেজ জড়ানোর পরামর্শ নিছক তাইলে?'

'হ্যাঁ, এই নাও,' রেক আর ব্যান্ডেজের রোল গ্যাকোর হাতে তুলে দিল রানা। 'আবার টপিরার করছি, মেরে ফেলো না। কানের পেছনে আলাতো একটা ঢোকা, কাস। পেছনের ওই পর্দাটার আড়ানে বসে থাকবে। একটা হাত রাখল গ্যাকোর কাঁধে। 'তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, নভেলিতে কিরিমের দেবশোশান করার জন্যে।'

রোল খুলে ব্যান্ডেজ জড়ানো শুরু করল গ্যাকো রেকের মাথায়। পাঁচাত্তই একবার চোখ তুলে চাইল পাশের কার্টিন-সজ্জিত বাকহেডের দিকে।

'বাটা কখন আসবে, কে জানে।'

গ্যাকোকে রেখে বেরিয়ে এল রানা। খুনি হোক বা না হোক, ওরা তিনজন ছাড়া অন্য যে-ই গ্যাকোর সামনে পড়বে আজ রাতে, কপ লে বাবা বি আছে তার, ভাবল রানা। তবে এছাড়া আর কোন পথ নেই। সব রকম সম্ভাবনাতা অবলম্বন করতই হবে এখন। মনে মনে সবুস্ত হলো রানা, জানে না, কুডেনকোকে পাহারা দেবার জন্যে গ্যাকোকে রেখে এসে তুল করেছে সে। জানে না, তুল লোককে পাহারা দেবার জন্যে প্রহরী নিযুক্ত করেছে।

এতই দ্রুত এতই আচমকা দ্বিতীয় দুর্ঘটনাটা ঘটল, সতর্ক হবার অবকাশও পেল না রানা।

কিছু প্রয়োজনীয় ওষুধসহ মেডিক্যাল স্টোরের রুম থেকে বের করা দরকার। কুডেনকো অজ্ঞান, তাই স্টোরে ঢোকান অনুমতি চাইল রানা রাইকতের কাছে এবং পেল।

কিন্তু প্রথমেই স্টোরে না ঢুকে একটা প্রয়োজনীয় কাজ সারল রানা। টেপশন নভেলিতে দুই যমজ ভাইকে দেখে ফিরে এল রাত দশটা পগাদ। খুঁজে বের করল সাসকিনকে। তার কাছেই স্টোরের চাবি দিয়ে নিজের নেবিনে গেছেন রাইকত। নির্জন কন্ট্রোলরুম, ওখ রানার অপেক্ষায় বসে আছে সাসকিন।

আগে আগে চলল সাসকিন, পেছনে রানা। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল ওরা ইনারশিয়াল-নেভিগেশন রুমে। এখানে ঢুকলেই কেমন একটা অদ্ভুত অনুভূতি জাগে রানার মনে। চারদিকের বিপুল ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিগুলো মাঝে নিজে একটা ইলেকট্রনিক স্নোবট বলে মনে হয়।

ইলেকট্রনিক রুমের এক কোণে মোঝাতে একটা বিশাল হ্যাচ, এগিয়ে গিয়ে হ্যাচের লকটা খুলল সাসকিন। রানা আর সে ধরাধরি করে ওপরের দিকে টেনে তুলল ঢাকনিটা। একশো পঞ্চাশ পাউন্ড ওজন হবে, অনুমান করল রানা। একটা ক্যাভিং ল্যাচ-এ ঢাকনির হুক আটকে খাড়া করে রাখা হলো।

ঢাকনির ভেতরের পিঠে পর পর তিনটে আটো ঝালাই করে লাগানো। নিচের সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে ওপরে ওঠার সময় এই আটোকে সাপোর্ট হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

ইস্পাতের মই বেয়ে নেমে গেল সাসকিন। সুইচ টিপে লাইট জ্বালল। এরপর নেমে গেল রানা।

ছোট স্টোর রুম। কিন্তু লেনিনগ্রাদের অন্যান্য ঘরের মতই জিনিসপত্রের ভাসা। জিনিসপত্র বলতে এখানে ওষুধ আর মেডিক্যাল সাঙ্গসরঞ্জাম, সুন্দর করে সাজিয়ে-ওছিয়ে রাখা। কুডেনকোর কাজ। প্রতিটি ওষুধের বাক্স, সাঙ্গসরঞ্জামের মাঝে নিখুঁত লেবেল আটকানো। তিন মিনিটেই প্রয়োজনীয় সব ওষুধ ইত্যাদি খেঁব করতে নিচে একটা ব্যাগে ভরে ফেলল রানা। ব্যাগটা সাসকিনের হাতে দিয়ে আগে আগে ঘর বেয়ে উঠে গেল।

মইয়ের মাথায় দাঁড়িয়ে নিচে আত বাড়াল রানা। ব্যাগটা এগিয়ে দিল সাসকিন। লাইট নেভাল। মইয়ের গোড়ায় এসে দাঁড়াল। রানা বোঝিয়ে গেলে সে উঠে আসবে।

বাগটা ডান হাতে নিয়ে সাপোর্টিং আংটা ধরার জন্যে বাঁ হাত বাড়াল রানা। একটা আংটা চেপে ধরল। চাপ দিয়ে হ্যাচের বাইরে তুলতে গেল নিজেকে। কিন্তু বেরোনো হলো না। তার পরিবর্তে একশো পঞ্চাশ পাউন্ড ওজনের ভারী ঢাকনিটা পড়ল দড়াম করে।

এক সেকেন্ডের কয়েক ভাগের এক ভাগ সময়ে নিজের অজান্তেই মাথাটা নিচু করে ফেলল রানা। তাইতাই বেঁচে গেল মাথা। যদি সরে আসতে না পারত, ঢাকনিটা পড়ত তার মাথায়, খুলি ফেটে মগজ বেরিয়ে যেত এতক্ষণে। বেঁচে গেল ঠিকই, কিন্তু একেবারে অক্ষত রইল না। হ্যাচ-কোমিং-এ মাথার এক পাশ চলা খেলো। ছেড়ে গেল অনেকখানি জায়গা। আর বাঁ হাতের কাজ পর্যন্ত চাপা পড়ল কোমিং ও ঢাকনার মাঝখানে।

ব্যথায় আত্ননাদ করে উঠল রানা। বাগটা ছেড়ে দিয়েছে হাত থেকে। পড়েছে গিয়ে সাসকিনের মাথায়।

'কি, কি হলো, ডাক্তার?' নিচ থেকে সাসকিনের উচ্চিৎ কণ্ঠ শোনা গেল।
'লাইট জ্বালো। এসো, জলদি! ঢাকনি সরাতে সাহায্য করো আমাকে!' দাঁতে দাঁত চেপে বলল রানা।

'মধ্যমা আর কড়ে আঙুল গেছে আপনার, ডাক্তার রানা,' বলল জ্যাকভ। রানার বাঁ হাত নিজের হাতের তালুতে রেখে টিপেটুপে পরীক্ষা করছে।

'মানে?' পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন কমান্ডার রাইকড।

'ছেঁচে গেছে। দু'জায়গায়।'

'ঠিক হবে তো?' উৎকণ্ঠা ব্যরছে কমান্ডারের গলায়।

'তা হবে,' অনিশ্চিত শোনা গেল জ্যাকভের কণ্ঠ। 'তবে সময় লাগবে।'

আপনমনেই কি বিড় বিড় করলেন কমান্ডার। তারপর ঘুরে চাইলেন সাসকিনের দিকে। কঠিন গলায় বললেন, 'তোমার মত একজন দক্ষ জাহাজী এমন কেয়ারলেস হবে, ভাবিনি। ভাল করেই জানা আছে তোমার, স্ট্যান্ডিং ল্যাচে হ্যাচ কভার আটকানোর পর চেক করতে হয়। দেখতে হয় ঠিক আছে কিনা। চেক করেনি কেন?'

'করেছি, স্যার,' বলল সাসকিন। অসহায় বোধ করছে কেমন যেন, অস্বস্তি বোধ করছে। 'ল্যাচ আটকানোর ফ্রিক শব্দ পরিষ্কার শুনতে পেয়েছি। এরপরও টেনেটুনে দেখছি। ঠিকমতই লেগেছিল ল্যাচ। হালপ করে বলতে পারি।'

'লেগেছিল? তাহলে খুলল কি করে?' ধমকে উঠলেন কমান্ডার। 'আসলে ভালমত লাগনি ল্যাচ। ফ্রিক শব্দ হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু ভালভাবে আটকায়নি। তাই না?'

রানার হাতের দিকে তাকিয়ে চূপ করে বইল সাসকিন। 'কি জবাব দেবে?'

এক মুহুর্তে বিভিন্ন দরনের ট্রাবলস্ট রানার হাতে তুলে দিল ডাক্তার জ্যাকভ। 'খেয়ে ফেলুন। আরাম পাবেন। আর এই হে ব্যাডলজ বৈধে নিলাম, পানি লাগাবেন না,' প্রফেশনাল ভঙ্গিতে কিছু নিরুদ্ভাসিক কথা যান্ত্রিকভাবে বলে গেল জ্যাকভ। তারপর জিভ কাটল। 'ছি-ছি, একজন ডাক্তারকে এসব কি বলছি!'

'হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছি কি?' আবার ধমকে উঠলেন রাইকড। 'যাও এবার থেকে। যতোসব অপদার্থ জুটেছে আমার কপালে।'

মাথা নিচু করে অপরাধীর মত বেরিয়ে গেল সাসকিন। নেনদিকে তাকিয়ে যেন নিজেকেই শোনালেন কমান্ডার, 'গাফিলতি! কাল সকালে বিচার করব এর।'

'আমিও যাই, যুমেইগে,' নিজের ব্যাগ আর যন্ত্রপাতি গুছিয়ে নিয়ে উঠে চলে গেল জ্যাকভ।

'হয়তো কাল সকালে নয়,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা, 'তারপরের দিন কিংবা আরও কয়েকদিন পাবে কোন সকালে দুর্ব্যবহারের জন্যে সাসকিনের কাছে মাপ চাইতে হবে আপনাকে, কমান্ডার।'

'মানে?' সরাসরি রানার চোখের দিকে তাকালেন রাইকড। 'তুঝ কুঁচকে গেছে। বরফের মত শীতল চোখের দৃষ্টি।'

'কুঁকি নিয়েছিল কেউ,' বলল রানা। 'তবে বেশি নয়, কারণ ওই সময়ে সাবমেরিনের বেশির ভাগ লোকই ঘুমিয়ে গেছে। কন্ট্রোল রুমও নির্জন ছিল। সুযোগটা নিয়েছে সে।' বাবার সময় আপনার কাছে স্টোর রুমে যাবার অনুমতি চেয়েছিলাম। ওই সময় ওখানে ছিল সে, আপনি অনুমতি দিয়েছেন শুনেছে। খাওয়া শেষ হলে ঘুমোতে চলে গেছে বেশিরভাগ লোক। আমি গিয়েছি নভেলিতে। সাসকিন চারি নিয়ে বসে ছিল আমার অপেক্ষায়। সে ছাড়া দ্বিতীয় আরও একজন বসে ছিল। আমি স্টেশন থেকে ফিরে এসে সাসকিনকে নিয়ে স্টোর রুমে নেমে গেলে নিঃশব্দে হ্যাচের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে সে। ওখুদে নিয়ে আমি আগে উঠে আসব কি সাসকিন উঠে আসবে, জানত না সে, ওই জায়গাটায় জুয়া খেলেছে। আমি আগে উঠলে তার উদ্দেশ্য সফল হবে, আর যদি না-ই আসি, তো তেমন কিছু যায় আসে না। ওখু বুলিনের মত আরেকটা জীবন অকারণে যাবে। আসলে, আমরা স্টোরে নেমে যাবার পর ল্যাচ খুলে দেয়া হয়েছিল, কমান্ডার।'

'এখুনি যাচ্ছি আমি,' খেপার মত বললেন কমান্ডার। 'যে-ই কাজটা করে থাকুক, কেউ না কেউ তাকে দেখেছে। তদন্ত করে দেখলে--'

'খামোকা সময় নষ্ট করবেন, কমান্ডার,' বাধা দিয়ে বলল রানা। 'অত অসাবধান সে নয়। তাহাড়া এখুনি হৈ চৈ করলে আমার কাজের ক্ষতি হবে। আরও বেশি সাবধান হয়ে পড়বে সে, ডুব মারবে গভীর পানিতে। তখন তাকে খুঁজে বের করাই কঠিন হবে।'

'তাহলে নভেলির সব ক'টাকে ধরে কোন কেবিনে তালি বন্ধ করে রাখব। বন্দরে পৌছার আগে হাড়ব না একজনকেও।'

'সেক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর ওই খুনীকে কোনদিনই হয়তো খুঁজে পাব না। তাকে মুক্ত রাখতে হবে, তার নিজের পথে চলতে দিতে হবে। অনেক মাথা খাটিয়ে বের করতে হবে আমাদের প্রাঙ্গল নোকাটিকে।'

'কিন্তু এটা হতে দিতে পারি না। খুনী মুক্ত থাকলে, জাহাজসুদ্ধ সবাইকে বিপদে ফেলতে পারে।'

'এছাড়া আর কোন উপায় নেই, কমান্ডার।'

'কি করতে বলছেন তাহলে?'

সকালে উঠেই তদন্ত কমিশন বসার। জিজ্ঞাসাবাদ করব নাভেলির প্রত্যেকটি লোককে। অবশ্য খুনখারাবির কথা বলব না কিছু। জিজ্ঞেস করব কি করে আত্মন নাগল, দুর্ঘটনাটা কিভাবে ঘটল, ইত্যাদি ইত্যাদি। সতর্ক থাকলে হয়তো প্রয়োজনীয় কিছু আবিষ্কার করতেও ফেলতে পারি ওদের কথা থেকে।

‘তাই ভাবছেন, না?’ সন্দেহ প্রকাশ করলেন কমান্ডার, ‘আমি কিন্তু বিশ্বাস করতে পারছি না। আপনি খুনখারাবির কথা না বললেও খুনী ঠিকই অনুমান করে ফেলেছে আপনি সন্দেহ হয়ে উঠেছেন। নইলে এই আফাত আসত না আপনার ওপর।’

‘সন্দেহ হয়েছে বলেই আমাকে খুন করতে চেয়েছে, ভাবছেন?’

‘এছাড়া আর কি কারণ থাকতে পারে?’

সৈকনেই কি রুডেনকো মরতে মরতে বোঁচেছে, মনে করছেন? ডাক্তার তো আমার মত লোক নয়।’

‘কি জানি। ওর ব্যাপারটা অসলেই দুর্ঘটনা হতে পারে।’

‘হতে পারে,’ বলল রানা। ‘কিন্তু এব উল্টো ব্যাপারটাই বেশি বিশ্বাস মনে হচ্ছে আমার। দেখা যাক, আগামীকাল কিছু আবিষ্কার করতে পারি কিনা। চেষ্টা করে যেতে হবে।’

রানা নিজের কেবিনে ফিরতে ফিরতে মাঝরাত হয়ে গেল। রুস্তভ ঘুমে অচেতন। লাইট জ্বালিয়ে তার নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটাল না স্নানা। কাপড়চোপড় কিছুই খুলল না, শুধু পা থেকে জুতো খুলে ফেলল। বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে একটা কপল টেনে নিল পলা পর্যন্ত।

ঘুমোল না রানা। ঘুমোতে পারছে না। অসহ্য ব্যথা। ভাঙা আঙুলে, দুই নার পকেট থেকে জ্বাকুডের দেয়া বেদনা-নাশক ট্যাবলেট খাব করল, দু’বারই না খেয়ে আবার পকেটে রেখে দিল।

ওয়ে ওয়ে ভাবছে রানা। সিদ্ধান্তে এসে গেছে, কেউ, কোন কারণে চাইছে না লেনিনগ্রাদে কোন ডাক্তার থাকুক। কিন্তু কেন? আরও আধ ঘণ্টা নিজের মনের দায়েই উত্তরটা খুঁজল রানা, তারপর হঠাৎই উঠে বসল বিছানায়। জুতো পরল না। মোজা পায়েই বণ্ডা দিল সিক-বের দিয়ে।

নিঃশব্দে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল রানা, আবার নিঃশব্দেই ভেজিয়ে দিল পান্না। একটা অল্প পাওয়ারের লাল আলো জ্বলছে দ্বারে। রান আলোয় নিজের কটে কাউনকে পড়ে থাকতে দেখল রানা। সুইচ টিপে ছাতে বসানো আলো জ্বলল সে। আচমকা তীব্র আলোর বন্যায় ভেঙ্গে গেল ঘর, চোখ মিট মিট করল রানা।

পর্দাটার দিকে তাকাল একবার। সামান্যতম দুলছে না। একেবারে নিখর, পুজছে অন্ত হয়ে।

‘নাড়ি মেরে বসো না, গ্যাকো। আমি রানা।’

পর্দা এক পাশে সরিয়ে বেরিয়ে এল গ্যাকো। ডান হাতে আলতোভাবে কুলছে ব্যাল্কেজ-জড়ানো বেলুটা। চেহারা য হতাশ।

‘তোমাকে আশা করিনি,’ বলল গ্যাকো, ‘ভাঙটা নিষ্পিণ করছে, কারণ মাথায়...’ রানার হাতের দিকে চোখ পড়তেই চমকে ধমেন গেল, ‘রানা, তোমার

হাত? কি হয়েছে?’

‘আমাদের দোস্ত এন্টী মজা করেছে, এই আর কি,’ হাসল রানা। ‘আমার বেঁচে থাকাটা পছন্দ হচ্ছে না তার কোন কারণে।’

‘কি ঘটেছে, সংক্ষেপে জানান রানা।’

‘এই জাহাজে, রুস্তভকে ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করো আমি, গ্যাকো?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

‘পিনি,’ নির্দিষ্ট জবাব দিল গ্যাকো।

‘কাউকে না জাপিয়ে, চুপচাপ লুকিয়ে তাকে এখানে আনার ব্যবস্থা করতে পারো?’

কোন প্রশ্ন করল না গ্যাকো। শুধু বলল, ‘সে হাঁটতে পারে না, তুমি জানো রানা।’

‘ওকে বয়ে আনার মহ গায়ের জোর তোমার আছে।’

হাসল গ্যাকো। ‘ফিরে এল তিন মিনিট পয়েই। পিনিংকে নিয়ে এসেছে।’

পঁয়তাল্লিশ মিনিট সাপল রানার সব কথা বুঝিয়ে বলতে। তারপর গ্যাকোকে জানাল, আর রুডেনকোকে পাহারা দিতে হবে না। বেরিয়ে গেল দু’জন।

নিজের কেবিনে আবার ফিরে এল রানা।

এখনও ঘুমিয়ে আছে রুস্তভ। লাইট জ্বালতেও বিন্দুমাত্র নড়ল না, একইভাবে ঘুমিয়ে রইল।

ঘীরে ঘীরে ফারের পোশাক পরল রানা। বাঁ হাত অকেজো, প্রচণ্ড ব্যথা। কাপড় পরতে খুবই অসুবিধে হলো। রিফকেন্স খুলে ট্রাষ্টরের অয়েল ট্যাংকে রাখা মাইজার পিস্তল, রবার-মোড়ানো ম্যাগাজিন দুটো আর ভাঙা ছুরিটা বের করল। ট্রাউজারের পকেটে জিনিসগুলো রেখে রিফকেন্স বন্ধ করে লাইট নেতাল। আবার বেরিয়ে পড়ল কেবিন থেকে।

কন্ট্রোলরুমে ঢুকে দেখল একজন অফিসার ডিউটি দিচ্ছে। কমান্ডারের নতুন নির্দেশ হয়তো, ভাবল রানা।

সপ্তম দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল অফিসার। আহত দুই যমজ ভাইকে দেখতে যাচ্ছে, অফিসারকে জানাল রানা। চেহারা য কোন পরিবর্তন নেই অফিসারের, শুধু একদিকের একটা ভুরু অতি সামান্য উঠল-নামল একবার।

বাকহাউসে এসে দুই যমজ ভাইকে পরীক্ষা করল রানা। দু’জনেই অবস্থার উন্নতি হয়েছে। ওদের পাহারায় নিয়োজিত দু’জন ক্রুকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এল আবার। কিন্তু প্রথমেই লেনিনগ্রাদে ফিরে গেল না। ট্রাষ্টর শেডে গিয়ে ঢুকল। পকেট থেকে পিস্তল, ম্যাগাজিন আর ভাঙা ছুরি বার করে আবার রেখে দিল পেট্রোল ট্যাংক।

তারপর ফিরে গেল সাবমেরিনে।

‘এসব প্রশ্ন করতে আমারও ভাল লাগছে না,’ কঠে মধু ঢালছে রানা, ‘কিন্তু কি করব। সরকারী আদেশ। আমি এবং আপনারা সবাই সরকারী লোক। কি করে নভেলিতে দুর্ঘটনা ঘটেছে জেনে নিয়ে যত তাত্ত্বিক সম্ভব রেডিওতে কর্তৃপক্ষকে জানানোর আদেশ দেয়া হয়েছে আমাদের,’ ঘর ভর্তি লোকের দিকে একবার তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘আপনটা লাগল কি করে, জানা আছে কারও?’

নিজেকে শুধু ডাক্তারই নয়, নভেলির আহত আর লেনিনবাদীদের জু-অফিসারদের কাছে সরবরাহ মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা বলে ঘোষণা করেছে রানা একটা আগে। রানার কথা মেনে নিয়েছে বেশির ভাগ লোকেই। আহতদের উদ্ধার কাজে সক্রিয় ভূমিকা নেবে সরবরাহ মন্ত্রণালয়, এতে অবাক হবার কিছু নেই। আর আহত লোকের চিকিৎসার জন্যে একজন অভিজ্ঞ ডাক্তারের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি, এ তো সহজ কথা। কাজেই দুর্ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে গিয়ে খুব একটা অসুবিধে হলো না রানার।

‘আপন যে লেগেছে এটা প্রথম আঘাতের ক্রি আমি,’ একটা দ্বিধা করে বলল নভেলির বাবুটি, আনাতালি অভয়। এখনও সুস্থ হয়ে ওঠেনি, কিন্তু উন্নতির পরিচায়ক লক্ষণ চোহাওয়া। হলঘরে এই সকালে উপস্থিত নভেলির আহত আটজনের মতই রাতের ঘুম, উন্নতমানের খাবার আর গরম পোশাক চাকচিকা এনেছে অভয়ের চোহাওয়াও। অবশ্য পোড়াকড় আর ফুস্ট-বাইটের দাগগুলো বাদ দিয়ে ক্যাপ্টেন কুমারভকেও এই সকালে আর ততটা কাহিল মনে হচ্ছে না। মাত্র আধঘণ্টা আগে ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসে গোথাসে খাবার গিলেছে সে।

‘রাত দুটো হবে তখন,’ বলে গেল অভয়, ‘আপন ভালমতই ধরে গেছে। দাঁট দাঁট করে জ্বলছে। আমি...’

‘কোথায় ঘুমোচ্ছিলে তুমি?’ বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

‘রান্নাঘরে। ওটাকেই ডাইনিং হলও বানিয়েছিলাম আমরা। উত্তর সারির পশ্চিম মাথার ঘরটা।’

‘একটি ঘুমোচ্ছিলে?’

‘না। মিকো, খায়রত আর ননেটিও ছিল আমার সঙ্গে। ঘরের একপাশে ওয়েছিলাম আমি আর মিকো। দুইদিকের দেয়াল ঘেঁষে রাখা দুটো বিশাল আলমারি। খাবার আর রান্নার অন্যান্য সাজসরঞ্জাম রাখা ওগুলোতে। ঘরের অন্যান্যপাশটা টেবিল পেতে ডাইনিং হল হিসেবে ব্যবহার হত। এখানেই ওয়েছিল ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান দু’জন, যাদের খায়রত আর ননেটি।’

‘দরজার কাছাকাছি ছিল ওরা?’

‘ঠিকই ধরেছেন। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল আমার। খোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসছে, খুক-খুক করে কাশতে শুরু করেছি। ঘরের পুর্বের দেয়ালে আপন জড়িয়ে পড়েছে।

মিকোকে কয়েকটা ধাক্কা দিয়েই উঠে নৌড় দিলাম। দরজার কাছে ফায়ার এক্সটিংগুইশার। খাবা মেরে ব্র্যাকেট থেকে খুলে আনলাম, কিন্তু প্রচণ্ড ঠান্ডায় বিকল হয়ে গিয়েছিল বোধহয়, কাজ করল না। আবার ছুটলাম। ধোয়ায় অন্ধকার হয়ে গেছে ঘর। আন্দাজে ছুটে গিয়ে জোরে ধাক্কা দিলাম খায়রত আর ননেটিকে, চেষ্টা করে বেরিয়ে যেতে বললাম। বেরিয়ে যাবার সময় আমার পায়ের ওপর এসে পড়ল মিকো। ক্যাপ্টেন কুমারভকে খবর দিতে বললাম তাকে।’

‘ক্যাপ্টেন কুমারভকে জাগিয়েছিলে তুমি?’ মিকোকে জিজ্ঞেস করল রানা।

‘ওর খোঁজেই যাছিলাম। পুরো এলাকাটাই তখন জ্বলছে দাঁট দাঁট করে, যেন দাবানল। বিশ ফুট ওপরে উঠে গেছে আগুনের শিখা। বাতাসে পোড়া তেলের ঝাঝাল গন্ধ। তেলের ড্রাম বাস্ট করল, এদিক-ওদিক তেল ছিটকাল। প্রতিটা বিন্দুর সঙ্গে জড়াজড়ি করে ছিটকে পড়ল আগুন। এই আগুন আর তেল এড়িয়ে অনেক ঘুরে যেতে হয়েছিল আমাদের।’

‘পূর্ব দিক থেকে বাতাস বইছিল?’

‘দক্ষিণ-পূর্ব। কিংবা বলা যায় পূর্ব-দক্ষিণ-পূর্ব। বাই হোক, জেনারেলের হাউসের ওদিক দিয়ে অনেকখানি ঘুরে গিয়েছিলাম আমি, বাক্সহাউসে। ওখানেই আমাদের পেয়েছেন।’

‘তারপর ক্যাপ্টেনকে জাগিয়েছিলে?’

‘আগেই জেগে গেছেন তিনি, বেরিয়ে চলে গেছেন। আর জাগবেন না কি, যেভাবে তেলের ড্রামগুলো ফাটছিল। মরা জিন্দা হয়ে যায় কান ফাটানো সেই বিস্থিরিশমে। ক্যাপ্টেন আর...এই যে ও, কুয়েল, এরা দু’জন ফায়ার এক্সটিংগুইশার নিয়ে মেজর কিরিমের ঘরের আগুন নেভাতে চেষ্টা করছেন তখন প্রাণপণে।’

‘কুয়েল স্টোরের সোজা পশ্চিমের ঘরটা তো?’

‘হ্যাঁ। সে এক ভয়াবহ দৃশ্য! ফায়ার এক্সটিংগুইশার নিয়ে বাস্তব ক্যাপ্টেন, কিন্তু এতই উত্তাপ, কাছে ঘেঁষতে পারছেন না। বাতাসে ক্রমাগত তেল ছিটকাচ্ছে, এক্সটিংগুইশার কোমাই জ্বলছে বলে মনে হলো আমার, আগুন নেভাবে কি!’

‘আগের প্রশ্নে ফিরে যাওয়া যাক,’ হাত তুলে বলল রানা, ‘আপন লাগল কি করে?’

‘নিজেরাই হাজার বার আলোচনা করছি আমরা,’ কথা বলল ডাক্তার জ্যাকব। ‘কিন্তু হদিস পাইনি। তবে অনুমান করেছি, আপনটা ওর হয়েছে কুয়েল স্টোর থেকে। কিন্তু কি করে আপন লাগল, দ্রুত এদিক-ওদিক মাথা নাড়ান ডাক্তার, ‘না, ডাক্তার, আমরা জানি না। কিন্তু এখন আর ওসব জেনে, কোন লাভ আছে কি?’

‘আছে, অবশ্যই আছে। এ ধরনের ঘটনা যেন আর না ঘটে, বাবুলা নিতে হবে এরপর থেকে। দুর্ঘটনার কারণটা জানার জন্যেই বিশেষ করে পাঠানো হয়েছে আমাদের,’ মিকোর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা, ‘আচ্ছা, মিকো, কুয়েল স্টোর আর জেনারেলের ঘরের দায়িত্ব ছিল তোমার ওপর। আপন লাগার ব্যাপারে কোন ধাক্কা আছে তোমার?’

‘না। ইলেকট্রিক স্পার্ক হওয়া সম্ভব হতে পারে...কোন একটা ড্রামে ছিল হয়ে

গিয়ে হয়তো অয়েল তেল্পার উঠছিল। ওই ঘরে দুটো বড় বড় ইটার ছিল, ঘরের টেম্পারেচার জিরো 'হরীতে রাখার কাজে লাগত। তেলের বাষ্পকে ইটাবের আওন কোনভাবে ইগনাইট করেছিল কিনা কে জানে! কিন্তু আমার এই পাগলামি-চিন্তা বিশ্বাস করে বসবেন না যেন আবার।

'সিগারেটের আওনও কিন্তু তেলের বাষ্প আওন বরাতে পারে।'

রক্ত জমল মিকোব মুখে। দেখুন কমবেশ, আমাকে আমার কাজ শেখাবেন না। সিগারেটের আওন! কচি খোকা নাকি আমি যে এই সহজ কথাটা জানব না? কয়েক সোপেরে বাসে সিগারেট খাব... আপনি...

'বাগায়াগিরি কিছু নেই, মিকো,' সবম গলায় কথা বলল রানা, 'আসলে তোমাকে কিছু বলছি না আমি, শুধু সম্ভাবনাটার কথা ভাবছি।' রক্তয়ের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'মিকোকে তো ক্যাপ্টেনের কাছে পাঠালে। তাৎপর্য?'

'রেডিওরুমের দিকে ছুটলাম। ঘরটা বাগায়াগিরির দক্ষিণে, আর হ্যাঁ, মেজর কিরিমের ঘরের পশ্চিমে...'

'ল্যাবরেটরির টেকনেশিয়ান দু'জন? ডাইনিং হল ছাড়ার আগে শিওর হয়েছিলে, খায়রুজ আর ননেটি জেগেছে?'

'না, ডাক্তার,' চোখ নামিয়ে নিয়ে বলল অতর। একটি কুঁজো হয়ে গেছে কাঁধ, চেহারা ভাবশূন্য। 'আমার দোষেই মারা গেছে ওরা। সাংঘাতিক পরিস্থিতি তখন ডাইনিং হলের ভেতরে, দক্ষিণের দেয়াল জুড়ে, ঘরের ভেতরে জলন্ত তেল, ধোয়া পর্যন্ত যেন জ্বলছে। শ্বাস নিতে পারছিলাম না। কিন্তু সত্যি বলছি, ওই আওনের মাঝেই দু'জনকে ডেকেছি আমি, জোরে চেঁচিয়ে, ধাক্কা দিয়েছি।

'আমি ওনেছি তাব চিংকার,' সাকী দিল মিকো। 'সে সময় ওর পাশেই ছিলাম আমি।

'ধাক্কা দিয়ে আর অপেক্ষা করিনি,' আগের কথার খেই মরল অতর, 'সোজা বেরিয়ে এসেছি। জানের ভয় সবারই আছে। আমি ভেবেছিলাম, আমার পেছনে পেছনেই বেরিয়ে আসছে খায়রুজ আর ননেটি। কিন্তু তখন নিজের জান বাঁচানো ছাড়াও অন্য চিন্তা রয়েছে আমার মনে। অন্য ঘরের লোকদের উদ্ধার করতে হবে, সামনে ছুটেছি শুধু, পেছনে তাকাইনি। হঠাৎই কি মনে করে পেছনে তাকিয়ে দেখি, ওরা নেই। দেরি হয়ে গেছে তখন।

'রেডিওরুমের দিকে ছুটেছিলে, না?' আপনমনেই বলে রুভিনের দিকে তাকাল রানা। জিজ্ঞেস করল, 'ওখানেই তো তুমি যুমোতে, না, রুভিন?'

'হ্যাঁ, আমি এবং আমার সহকারী, মিলাহাইল,' মৃত সহকারীর কথা বলতে গিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল রুভিন। 'ঘরের পাটিশানের ওপারে, মানে পূর্বের অংশে ছিলেন ডাক্তার জ্যাকব। সামান্য পরিসর, কিন্তু তাতেই ওষুধ, বিছানা আর আইন স্যাম্পল টেস্ট করার যন্ত্রপাতি রাখতেন ডাক্তার।

'ওই ঘরটার পূর্বের অংশেই প্রথমে আওন খবর কথা, 'তাই না ডাক্তার?' আচমকা জ্যাকবকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'ঘরেও ছিল 'তাই' সাকার করল জ্যাকব। 'মুনের মাঝেই শ্বাস বন্ধ হয়ে এসেছিল আমার। প্রথমে মনে করেছিলাম দুঃস্বপ্ন, কিন্তু চোখ মেলে দেখি আমার

ওপর ঝুঁকে আছে ছেলোটো, মিলোর কথা বলছি। চেঁচাচ্ছে আর কাঁধ ধরে বাক্সাচ্ছে আমাকে। কি বলছিল, মনে করতে পারছি না, তবে নিশ্চয় আওন লাগার কথাই বলছিল। কিন্তু তখনও অনুভূতি পরিষ্কার হয়নি আমার। পরক্ষণেই প্রচণ্ড চড়া ক্রোম দুই গালে। আমাকে পুরোপুরি জাগানোর চেষ্টা করেছে ছেলোটো। এরপর ভাল করে কিছু না বুকেই লাফিয়ে উঠলাম। সব ডাক্তারদেরই যেমন হয়, হাতের লাঠি বা ছাতার মত, নিজের অজান্তেই আগে মেডিক্যাল কিটটা হাতে নিলাম। আরও কিছু যন্ত্রপাতি নেব কিনা ভাবার আগেই আমাকে ধাক্কা মেবে, প্রায় টেনে-হিঁচড়ে বের করে নিয়ে এল মিলো,' স্বাভাবিক কল ডাক্তার, 'তার মত ছেলে হয় না!'

'মিলাহাইলকে জাগাল কে?'

'অতর,' জবাব দিল রুভিন। 'আমাকে আর মিলাহাইলকে... দু'জনকেই ও জাগিয়েছে। দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা মারতে মারতে সমানে চেঁচিয়েছে। ও না এলে আমি আর ডাক্তার এতকণে বরফের তলায় গুয়ে থাকতাম! ঘরের বাতাস সাংঘাতিক বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল। অতর আসতে আর কয়েক সেকেন্ড দেরি হলেই কাজ শেষ হয়ে যেত আমাদের। মিলাহাইলকে ডাক্তারকে জাগাতে বলেই দরজা ফুলতে গিয়েছি আমি।

'ওনে মনে হচ্ছে, তালা দেয়া ছিল দরজায়?'

'আটকে গিয়েছিল, তালা না। দিনের বেলায়ই বরফ জমে পাতা আটকে যায়, আর এ তো রাতের বেলা। যুমোতে যাবার আগে ইটার বন্ধ করে দিয়ে খ্রীপিং-কাণে ঢুকতাম আমরা, কলে দরজায় বরফ জমত আরও বেশি। শুধু আমাদের ঘরই নয়, নভেলির সব ঘরের দরজায়ই এমন বরফ জমত। প্রায়ই আটকে যেত পাতা। সকালে কঠিন বরফের আন্তরল ভেঙে দরজা ফুলতে হত।

'তারপর কি হলো?'

'দৌড় দিলাম,' বলল রেডিওমান। 'কালো ধোয়া আর তেলের উড়ন্ত ফোয়ারার জন্যে কিছু দেখতে পেলাম না। গজ বিশেক যাবার আগে দুঃখলামই না, আসলে কি ঘটছে। পুরো ক্যাম্প এলাকায় আওন! রাত দুটোয় বরফের দেশে আচমকা ঘুম থেকে জেগে উঠে যদি দেখেন পুরো ক্যাম্পে শুধু আওন আর আওন, মাথা ঠিক থাকবে? কিন্তু আশ্চর্যই বলতে হবে, প্রথমেই একটা চিন্তা আমার মাথায় ঢুকল, এস.ও.এস. পাঠাতে হবে। আবার ফিরে গিয়ে ঢুকলাম রেডিও হাউসে।

'আমাদের জীবনের জন্যে রুভিনের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ,' এই প্রথম কথা কল বুয়েল। গোলপাঁ গালের এই লোকটা বেন-এর টাফ-টেকনেশিয়ান ছিল।

'ধামো তো! ধমকে উঠল রুভিন। 'কারও ওপকীর্জন গাইবার সময় এটা নয়।

'আমাকে বলতে দাও,' শাস্ত কণ্ঠে বলল বুয়েল। 'ডাক্তার রানা ফুল রিপোর্ট চাইছেন আমাদের কাছে।' রানার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ক্যাপ্টেন কুমারভের পিগুপিটুই বাক্সাউল থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম আমি। কায়ার এক্সটিংউইশার নিয়ে আওন নেতাবার চেষ্টা করেছি। মিকো ঠিকই বলেছে, কোন কাজই হাছিল না। আওন নেতাব কি, কাছেই এগোতে পারছিলাম না আমরা। ভয়ঙ্কর আওনের জন্যে কাছেই যেতে পারছিলাম না, অন্ধ জানি আমরা, ভেতরে মেজর কিরিমের চারজন লোক আটকা পড়েছে। ওদের বের করে আনার কোন উপায় দেখছিলাম না।

রেডিওরুমের কি অবস্থা আমাকে দেখতে বললেন ক্যান্টেন। একটার কোম শেষ হয়ে গিয়েছে, আরেকটা এক্সটিংউইশার আনার জন্যে যাচ্ছেন তিনি, একথাও বললেন।

‘রেডিও হাউসেও ভালমতই আড্ডন লেগেছে। ছুটে পতিমের দরজার কাছে গিয়ে দেখলাম, উপড় হয়ে পড়ে আছেন ডাক্তার জ্যাকড, তাকে তোলার চেষ্টা করছে অভয়। আমাকে দেখে চোঁচিয়ে উঠল অভয়, হাত লাগাতে বলল। একা টেনে সরাতে পারছে না সে ডাক্তারকে। এগিয়ে গেলাম। এই সময় ছুটে এল রুডিন। রেডিও হাউসের দরজার দিকে যাচ্ছে। পাগল হয়ে গেল নাকি রুডিন, অবাক হলাম। কিন্তু দরজায় দাঁড়িয়ে চোঁচিয়ে আমাদের সরে যেতে বলল ও। বলল, যে করেছে হোক পোট্টেবল রেডিওটা বের করে আনতে হবে। সব ক’টা তেলের ড্রাম শেষ, জেনারেটর শেষ, বাবার ঘরে আড্ডন লেগেছে। খবরটা জানিয়েই খোলা দরজা দিয়ে রেডিও হাউসে ঢুকে গেল রুডিন। আড্ডন জ্বলছে দরজার ফ্রেমে। ছাদ জ্বলছে, বেড়া জ্বলছে। যে-কোন মুহূর্তে ধসে পড়তে পারে। হু-হু করে কালো ধোয়া বেরুচ্ছে খোলা দরজা দিয়ে। কি করে যে জ্যাকড বেরিয়ে এল আবার সে সেটাই আশ্চর্য।’

‘এজন্যেই ওর-মুখ আর হাত এমন পুড়েছে?’ শান্তকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন কমান্ডার রাইকড। দূরে, ওয়ার্ডরুমের এক কোণে দাঁড়িয়ে কথা শুনেছেন তিনি। এই আলোচনায় তাঁর অশ্রুহরণের প্রয়োজনীয়তা নেই, কিন্তু সব কথা তাঁরও শোনা দরকার, এজন্যেই তাঁকে এখানে থাকতে অনুরোধ করেছে রানা।

‘হ্যাঁ, কমান্ডার ক্যান্টেন।’

‘রুডিনের প্রমোশন আর ঠেকানো গেল না,’ মন্তব্য করলেন কমান্ডার।

‘চলোয় যাক প্রমোশন!’ প্রায় খেঁকিয়েই উঠল রুডিন। ‘আমার সঙ্গীদের কি হবে, তনি? আমার তো সামান্য পুড়েছে মাত্র, কিন্তু মিলো? ও তো পুড়ে মরেই গেছে। তাকে কি প্রমোশন দেয়া হবে? কি করেছে ও, জানেন? ফিরে এসে রেডিও হাউসে ঢুকে দেখি, মেইন ট্রান্সমিটারের সামনে বসে আছে মিলো। শান্ত, স্থির। রেডলার ফ্রিকোয়েন্সিতে এস.ও.এস. পাঠাচ্ছে। ওদিকে আড্ডন ধরে গেছে তার কাপড়। টেনে-হিঁচড়ে চেয়ার থেকে নামিয়ে আনলাম ওকে, কয়েকটা নাইফ সেল নিয়ে বাইরে ছুটে যেতে বললাম। পোট্টেবল ট্রান্সমিটারটা আর এক বায়্র ব্যাটারি নিয়ে আমিও ছুটলাম দরজার দিকে। ভেবেছি, আমার পেছনেই আনছে মিলো, কিন্তু আঙনের গর্জন আর ড্রাম বিস্ফোরণের শব্দে তার পায়ের আওয়াজ শুনেলাম না। চোখে না দেখলে তখনকার দৃশ্য বলে বোঝানো কঠিন। ছুটে দূরে নিরাপদ জায়গায় গিয়ে রেডিও আর ব্যাটারির বায়্র নামিয়ে রাখলাম। তারপর দ্বিতীয়বার ফিরলাম। অজান হয়ে বরফের ওপর পড়ে আছেন ডাক্তার, তাঁর হাঁশ ফেরানোর চেষ্টা করছে অভয়। মিলোকে দেখেছে কিনা জিজ্ঞেস করলাম তাকে। কিন্তু মিলোর কোন খবর দিতে পারল না সে। সোজা ছুটলাম দরজার দিকে। এই সময়ই আকাশ ভেঙে পড়ল মাথায়—’

‘আকাশ ভাঙেনি, ভুল ওখানে দিল বুয়েল।’ মেরেছিলাম ওকে আমি। পেছন থেকে কানের ওপর। নইলে আত্মহত্যা করত সে।’

‘হাঁশ ফিরে পাবার পর তোমাকে খুন করার ইচ্ছে হয়েছিল,’ বিগল কণ্ঠে বলল রুডিন। ‘বেচারি মিলো—’

‘তা তো হবেই,’ মুখ বাঁকাল বুয়েল। ‘উপকারীকে বাঘে খায় তো। এমন জানলে হাতের সুখ মিটিয়ে নিতাম আরও কয়েকটা ঘুসি মেরে। সে যাকগে, তারপর কি হলো বলছি। ডাক্তার জ্যাকডের দিক থেকে নজর ফিরিয়ে হঠাৎ চোঁচাতে শুরু করল অভয়। বায়্রভ আর ননেটির কথা মনে পড়ে গেছে তার। আরও কয়েকজন এসে জমায়েত হয়েছে আমাদের পাশে, তাদের মানে বায়্রভ আর ননেটি নেই। বাস, ছুটল অভয়। রান্নাঘরের দরজার কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। দরজার জায়গায় নাচানাচি করছে আঙন, ধোয়া বেরোচ্ছে গল গল করে। অভয়ের শিঁচু শিঁচু ছুটেছিলাম আমি। ওর ভাবগতিক বিশেষ সুবিধে মনে হলো না। রুডিনের মত এও একই ইচ্ছে হয়েছে বুঝতে পেরে সেই একই ব্যাপার করলাম। লোককে পেটানোর নেশায় পেয়েছিল মেন। মারলাম তার কানের ওপর এক ঘুসি। বাস, চিৎপটাং।’ অভয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘দুঃখিত আনাতোলি, কিছু মনে করো না। উদ্ভাদ হয়ে গিয়েছিল তখন। উপায় ছিল না।’

‘জান কানের নিচে চোয়ালে হাত বোলাল অভয়। ‘বড় শক্ত হাত তোমার, সেগেই। এখনও যথা আছে।’

‘অভয়কে নিয়ে সরে এসাম নিরাপদ দূরত্বে,’ আবার বলে গেল বুয়েল। ‘এই সময় সুলভকে নিয়ে এসে হাজির হলেন ক্যান্টেন কুয়ারভ। মেইন বায়্রহাউসে ঘুমিয়েছিল সুলভ। ক্যান্টেন বললেন, সমস্ত ফায়ার এক্সটিংউইশার বরফে জমে গেছে, অকেজো। রেডিওরুমে মিলো আটকা পড়েছে, তুললেন ক্যান্টেন। সুলভকে নিয়ে আবার গিয়ে ঢুকলেন বায়্রহাউসে। দু’জনে দুটো কঞ্চল পানিতে ভিজিয়ে নৌড়ুলেন রেডিও হাউসে। ওদের বাধা দিতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু সরে দাঁড়াতে বললেন আমাকে ক্যান্টেন।’ রান হাসল বুয়েল, ‘ক্যান্টেন কুয়ারভ কাউকে কোন আদেশ দিলে অমান্য করার উপায় থাকে না।’

‘থমে দম নিল বুয়েল, তারপর আবার বলল, ‘ভেজা কঞ্চল মাথায় ফেলে নিজেদের ঢেকে নিলেন ক্যান্টেন আর সুলভ। রেডিও হাউসে গিয়ে ঢুকলেন। কয়েক সেকেন্ড পরই মিলোকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে বেরিয়ে এলেন ক্যান্টেন। দু’জনেই জ্বলছেন মশালের মত। সুলভের কি হলো বুঝতে পারলাম না, বেরিয়ে এল না সে। ওদিকে মেজর কিরিমের ঘর আর বাবুচিখানার ছাদ ধসে পড়েছে। দুটো ধ্বংসস্থলের কাছেও ঘেঁষা যাচ্ছে না। ভেতরের লোকগুলোকে আর বের করার দরকার নেই, বুঝলাম।’

‘ওড,’ ধীরে ধীরে বলল রানা। ‘অগ্নিকাণ্ডের চমৎকার বর্ণনা দিয়েছ তুমি। তারপর কি হলো?’

‘মায়িতু নিলাম আমি,’ কথা বলল জ্যাকড, ‘অবশ্য তেমন কিছু করতে পারিনি। ওষুধ নেই, প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম নেই, কি করতে পারতাম? সবাইকে নিয়ে আঙনের কাছ থেকে সরে গেলাম। কতক্ষণ পরে জানি না, ধীরে ধীরে নিভে এল আঙন। তেলের ড্রাম বিস্ফোরণের আওয়াজ আর শোনা যাচ্ছে না। সবাইকে নিয়ে গিয়ে ঢুকলাম বায়্রহাউসে। কিন্তু চিকিৎসার তেমন কোন ব্যবস্থা করতে পারলাম

না। নিজে যথেষ্ট পুড়েছে, কিন্তু আমার সহকারী হিসেবে চমৎকার কাজ দেবার কড়িন। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা যাদের, বিছানায় শুইয়ে দিলাম। মিনোর অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। বুঝলাম, বাচানো যাবে না। এরপর আর কি?

‘পরের কয়েকটা দিন আর বাত খাবার পেলেন না কিছু, এই তো?’

‘কিছু না। উদ্ভাণও নেই। জেনারেলের নেই, হাঁটার জুলবে কোথেকে? আলোও নেই, কোলম্যান ল্যাম্প ছাড়া। বরফ গলিয়ে খানিকটা খাবার পানি বের করতে পেরেছিলাম। সবাইকে আদেশ দিয়েছিলাম, যা কিছু পাওয়া যায় জড়িয়ে নিয়ে গুয়ে থাকতে। তাপ আর এনার্জি বাচানোর প্রয়োজন ছিল।’

‘তোমারও খুব দুরবস্থা গেছে, কড়িন, বলল রানা। ‘মারাত্মক পোড়া-জখম নিয়ে এস ও এস, পাঠিয়েছ।’

‘আমি একা নই,’ বলল কড়িন। ‘ডাক্তার জ্যাকব নির্দেশ দিয়েছেন, এস ও এস, বন্ধ করা যাবে না। সমস্ত সকলেই পালা করে মেসেজ পাঠাবে। কঠিন কিছুই নয়। ব্যারেরট সাগরে ট্রলারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছিল বুয়েল। ফাঁকে ফাঁকে ডাক্তারও মেসেজ পাঠাতে সাহায্য করেছেন। মিকো আর অডয় তো রেডিওর সামনে বসেই সময় কাটিয়েছে। কসমোপডও প্রথম দিন হাত লাগিয়েছে, কিন্তু পুড়ে অন্ধ হয়ে গেছে বোচারা। চোখের যজ্ঞায় শেষ পর্যন্ত আর পারেনি।’

‘পুরোপুরি আপনিই নেতৃত্ব দিয়েছেন, না ডাক্তার?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

‘না না। প্রথম চম্বিশ ঘণ্টা শুধু... ওই সময়টা কেমন এক বিমূর্ততার মাঝে কাটিয়েছেন ক্যান্টেন। তারপর শকটা কাটিয়ে উঠে তিনিই নেতৃত্ব দিয়েছেন। আমি তো শুধু বড়ি গেলোতে জানি। নেতাগিরি করার লোক আলাদা, বিশেষ করে ওই ভয়াবহ সময়ে তো সঠিক পরিচালনা একটা সাংঘাতিক... না, কমরেড না, আমার ধাত পুরো আলাদা। ক্যান্টেন কুমারভই এ ব্যাপারে উপযুক্ত লোক।’

‘কিন্তু আপনার কাজকর্মও প্রশংসার যোগ্য,’ স্বীকার করল রানা। ‘হলের প্রতিটি লোকের মুখের দিকে চাইল একবার করে। নভেলির আহতদের উদ্দেশে বলল, ‘ডাক্তারকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারবেন না আপনারা। ভয়ঙ্কর এক অভিজ্ঞতা হয়েছে আপনারদের। সে যাই হোক, বেঁচে যে ফিরে আসতে পেরেছেন, ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিন।’ একটু থেমে বলল, ‘তবে আঙন লাগার কারণ আর বুঝি বের করা গেল না।’ মিকোর দিকে তাকিয়ে বলল, ‘আঙন লাগার কারণ হিসেবে তোমার ধারণা নেহায়েত পাগলামি নয়, মিকো। তবে একটা শিগ্ধা হয়েছে সারা দুনিয়ার বিজ্ঞানীদের। ভবিষ্যতে ক্যাম্পের একশো গজের মধ্যে আর কুয়েল স্কোর রাখবে না কেউ।’

মীটিং এখানেই শেষ করল রানা।

লিক-বেতে ফিরে এসেছে ডাক্তার জ্যাকব। কুশ জিরেছে জটেন্দ্রকোর। ওয়ার চেপ্টা করেছে, কিন্তু জোর করে শুইয়ে বেখেছে ডাক্তার জ্যাকব। সামনে যথেষ্ট কাজ, কিন্তু সমাল দেয়ার যোগ্যতা জ্যাকবের আছে। উপাড়া কতের ব্যাভেজ বুলানো, শিনিনের আড়া ইটুর এক্স-রে করা, ইত্যাদি অনেক কাজ করতে হবে তাকে আগামী দুই ঘটায়।

নিজের কেবিনে ফিরে এল রানা। দ্বিককেন বুলে একটা ছোট্ট ওয়ালেট বের করল। দ্বিককেনের তালি আবার লাগিয়ে দিয়ে এসে ঢুকল রাইকভের কেবিনে। লক্ষ করল হাসি নেই কমান্ডারের মুখে। অশ্রু যাত্রার শুরুতে রানাকে দেখেনেই মুখ হাসি হাসি করে তুলতেন কমান্ডার।

রানাকে দেখেই কোনরকম ভয়িকা না করে কথা বলে উঠলেন রাইকভ, ‘দুই যমজ ভাইকে যেমন করে হোক জাহাজে তুলতে চাই আমি। তাহলে যত তাড়াতাড়ি বন্দরে ফিরে যেতে পারব, মঙ্গল হবে সবার জন্যে। আপনার তদন্তে কোন ফল হবে না, বুঝতে পারছি। বন্দরে পৌঁছে যতক্ষণ না পুলিশ ডাকতে পারছি, শান্তি পাব না। লেনিনগ্রাদে ভয়ঙ্কর খুনীকে নিয়ে মোটেই বস্তি পাচ্ছি না আমি, মেজর।’

‘তিনটে জিনিস, ডান হাতের তিনটে আঙুল দেখাল রানা। ‘এক, যমজ দুই ভাইকে জাহাজে তুলতে আরও কিছু দেরি করতে হবে। দুই, পুলিশ এই মহা ধুরন্ধর খুনীর টিকিও ছুঁতে পারবে না। এবং তিন, আজকের জিজ্ঞাসাবাদে কিছু লাভ হয়েছে। তিনজন লোক সন্দেহমুক্ত হয়ে গেছে আমার কাছে।’

‘কিছু একটা মিস করেছে নিশ্চয়ই আমি।’

‘না। আমি এমন কিছু জানি, যা আপনার জানা নেই। ল্যাবরেটরিতে একটা ফ্লোরবোর্ডের নিচে চট্রিশটা নাইফ সেল আছে। তাজা, কিন্তু ব্যবহার করা হয়েছে।’

‘আমাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলেন নিশ্চয়ই?’

‘গামোকা কাউকে কিছু বলতে নিষেধ আছে আমাদের।’

‘লোকের সঙ্গে সহজে বন্ধুত্ব নষ্ট হয় না তাহলে আপনার?’

‘সজ্জা দিচ্ছেন। কাজের কথায় আসি, ওই ব্যাটারি সেলগুলো কে ব্যবহার করেছিল, প্রশ্ন জাগে না মনে? এস ও এস, পাঠাতে যারা বাঙ্কহাউস ছেড়েছে তাদেরই কেউ ব্যবহার করেছে ওই ব্যাটারি। বাঙ্কহাউস থেকে নড়তে পারেনি দুই যমজ ভাই, আর ক্যান্টেন কুমারভ। বাকি রইল মিকো, অডয়, ডাক্তার জ্যাকব, বুয়েল, কসমোপড আর কড়িন। এই ছয়জনের মধ্যেই কেউ একজন খুনী।’

‘নাইফ সেলগুলো কি কাজে ব্যবহার করেছিল?’ জানতে চাইলেন রাইকভ। ‘আর যদি তাদের কারও তাজা ব্যাটারি আছে জানা থাকত, কেন গামোকা শক্তি শেষ হয়ে আসা ব্যাটারি ব্যবহার করে জীবনের ঝুঁকি নিয়েছে? এসব প্রশ্নের উত্তর নিশ্চয়ই জানা আছে আপনার?’

‘সব প্রশ্নেরই জবাব থাকে,’ ঘুরিয়ে কথা বলল রানা। ‘সব প্রশ্নেরই জবাব পাবেন। তার আগে এটা দেখুন, ওয়ালেটের ভেতর থেকে আইডেনটিটি কার্ড বের করল সে। বাড়িয়ে ধরল কমান্ডারের দিকে।

‘ইস,’ পড়ে কাঠী আবার ফেরত দিতে দিতে বললেন কমান্ডার, ‘কাউটার এসপিওনাজ। স্পেশাল এজেন্ট—খান কে জি.বি.র। কিন্তু প্রয়োজন না পড়লে তো পরিচয় পত্র দেখায় না স্পাইরা?’

‘তিনটে কার্ড,’ অস্বাভাবিক তিন আঙুল দেখাল রানা। ‘আবার ওপর বিশ্বাস জন্মতে চাই আপনার, কারণ আপনার সাহায্য আমার মরকার। এত সবকিছুর মূল

কার্কাটা ও জানা দরকার এখন আপনার। পারকিন-আলমত পেত্রোকি স্যাটেলাইট মিসাইল-ট্রাকার ক্যামেরার নাম শুনেছেন কখনও?

‘চমৎকার গালভরা নাম,’ বিড়বিড় করলেন রাইকত। ‘না।’

‘কসমস বা সামোস-এর নাম শুনেছেন? সামোস ফাইভ?’

‘স্যাটেলাইট অ্যান্ড মিসাইল অভজারভেশন সিস্টেম?’ মাথা ঝাঁকালেন রাইকত। ‘হ্যাঁ, শুনেছি। কিন্তু এসবের সঙ্গে নৃশংস এক খুন্সীর কি সম্পর্ক?’

সম্পর্কটা জানাল রানা বিস্তারিত। একবারও বাধার সৃষ্টি না করে গভীর মনোবোধে শান্তভাবে রানার প্রতিটি কথা শুনলেন কমান্ডার। তারপর চেয়ারের পেছনে হেলান দিয়ে বলে বললেন, ‘উত্তর জানা হয়ে গেছে আপনার, বুঝতে পারছি। কিন্তু কে? হারামজাদাকে এখনি ধরে হাতকড়া লাগাচ্ছেন না কেন?’

‘হাতকড়া লাগাবেন?’

‘লাগাব মানে?’ ভুরু কুঁচকে রানার দিকে তাকালেন রাইকত, ‘কেন, আপনার ইচ্ছে নেই?’

‘জানি না এখনও। তবে, আমার মনে হয় ওকে একটি সময় দেয়া উচিত। ওকে ধরার আগে দলের রাফব বোয়ালগুলোর নাম ঠিকানা জেনে নিতে চাই আমি। তাছাড়া, খুন্সী একজন না হয়ে একাধিক হতে পারে, সেক্ষেত্রে সব কটাকে ধরা দরকার।’

‘একাধিক খুন্সী,’ বিড় বিড় করলেন কমান্ডার। হতাশভাবে এদিক-ওদিক মাথা নাড়ালেন। দুই হাতের কনুই টেবিলে ঠেকিয়ে ভালুতে ডিব্ব রাখলেন। কি ভাবলেন, তারপর বললেন, ‘যাকে আপনি চিনেছেন, তাকেই এখন ধরা দরকার। বরফের তলা দিয়ে শত শত মাইল যেতে হবে আমাদের। ছয়জন লোককে সাধারণ চোখে চোখে রাখা সম্ভব নয়, মেজর। সাবমেরিন সম্পর্কে সামান্যতম জ্ঞান থাকলেও যে-কোন মুহূর্তে আমাদের সর্বনাশ করে বলতে পারে ম্যানিফেস্ট।’

‘সাবমেরিন ক্ষতি করে আমাদের মারতে চাইলে সে-ও বাঁচতে পারবে না, কথাটা ভুলে যাচ্ছেন কেন?’

‘মাথা খারাপ লোকের ওপর বিশ্বাস রাখা বোকামি।’

‘জাহাজসুদ্ধ সবাইকে মেরে সাতরে বাড়ি ফিরবে বলতে চাইছেন, নাকি একা জাহাজ চালিয়ে নিয়ে যাবে ভাবছেন?’

চুপ করে বইলেন কমান্ডার, জবাব দিলেন না।

‘বুঝেছেন তো ব্যাপারটা? এবার তাহলে শোনা যাক, ছয়জনের কাকে সন্দেহ হয় আপনার,’ বলল রানা।

‘সত্যালে কথা বলার সময় প্রতিটি লোকের দিকে তীব্র নজর রেখেছি আমি। মন দিয়ে সবার কথা শুনেছি। তা, রুডিনকে কেমন লাগে আপনার?’

‘কেন, রেডিও অপারেটরের সঙ্গে ব্যাটারির যোগ আছে বলে সন্দেহ করছেন? কিন্তু রেডিও ব্যবহার করতে ওর মত ট্রেনিং বোকের দরকার হয় না। দু’দিনেই যে-কোন আনিড্রিক নাইফসেল ব্যবহার করে রেডিও মেসেজ পাঠানো শিখিয়ে দিতে পারি আমি।’

‘রুডিনের পক্ষেই ব্যাটারি চুরি করা সব চেয়ে সহজ,’ বললেন রাইকত।

‘অবশ্য হ্যাঁ, জ্যাকভের জন্যেও সহজই ছিল। কারণ রেডিও হাউসেই থাকত সে।’

‘তারমানে রুডিন আর জ্যাকভকে সন্দেহ করছেন আপনি?’

‘আপনি করছেন না?’

‘করছি। কিন্তু আপনার মত সন্দেহ করলে ছয়জনের কাউকেই বাদ দেয়া যায় না। ফ্লোরবোর্ডের তলায় প্রচুর খাবার পড়ে আছে। বাবুর্চিখানায় ঘুমোত মিকো আর অভয়। দু’জনের পক্ষেই খাবার চুরি করা সহজ। ফ্লোরবোর্ডের তলায় হাইড্রোজেন নিলিটার আর রেডিও-সঙ্গে বেলুনও আছে। সাবমেরিনে ঘুমোত বুয়েল আর কসমোপড। তাঁদের দু’জনের পক্ষে এইসব জিনিস সরানো খুবই সম্ভব। তাই না?’

‘বড় গোলমালে ব্যাপার!’ কে খুন্সী ঠিক করতে না পেরে, অস্থির হয়ে উঠেছেন কমান্ডার, ‘নাকি ইচ্ছে করেই মাথা খারাপ করছেন আমার?’

‘আমি করছি না। বলছি, শুধু একটা ঘটনা বা কারণে কাউকে খুন্সী সাব্যস্ত করে কস্ম অন্তিত। রুডিনকে সন্দেহ করছেন, অথচ সে-ই নিজের জীবনের মায়া না করে রেডিও হাউসে চুকেছিল ট্রান্সমিটার বাঁচানোর জন্যে। এর পরেও আরও মারাত্মক ঝুঁকি নিতে যাচ্ছিল। বুয়েল ওকে আটকে না রাখলে মিলাহাইলকে বাঁচাতে গিয়ে মারাই যেত হয়তো। ভেজা কফল গায়ে মাথায় জড়িয়ে ঢুকেও রেহাই পায়নি মূলত।’

‘তাছাড়া মিলাহাইলকে নাইক সেলগুলো নিয়ে বেরোনোর নির্দেশ দিয়েছে রুডিন। নিজের ভেতরে দুর্বলতা থাকলে ব্যাটারির কথা উল্লেখ করত কি সে? মিলাহাইল আবিষ্কার করে ফেলত না, বেশ কিছু সেল চুরি গেছে? আরেকটা ব্যাপার, অভয় বলেছে রেডিও হাউসের দরজা বরফ জমে আটকে গিয়েছিল। আপনি মনে করেন দরজা ওভাবে আটকা থাকা সত্ত্বেও ম্যাচের কাঠি জ্বলে ভেতরে থেকে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে রুডিন? আত্মহত্যা করার জন্যে?’

‘ওকালতি করে রুডিনকে সন্দেহমুক্ত করে দিচ্ছেন তো?’ ধীরে ধীরে বললেন রাইকত। ‘জানি, এখন আর জ্যাকভের বিপক্ষে বলেও সুবিধে করতে পারব না, ওর পক্ষেও দাঁড়িয়ে যাবেন,’ হাসলেন কমান্ডার।

‘ওকালতি করার কোন দরকারই নেই আমার,’ বলল রানা। ‘কিন্তু একেবারে নিশ্চিত প্রমাণ না পেলে কারও ঘাড়েই খুনের দায় চাপিয়ে দেয়া যায় না। জ্যাকভের কথাও কিছু বলি। রেডিও হাউস থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে এলে দরজার কাছেই মুখ ধুবড়ে পড়েছিল সে। রুডিনের মত সে-ও একই ঘরে ছিল। বরফে দরজা আটকে আছে কি নেই, না জেনে আগুন লাগানোর মত বোকা সে-ও নয়। এমনি ছোটখাট আরও অনেক ব্যাপারই তার ঝগক্ষে যাবে। তবে তার ঝগক্ষে সব চেয়ে বড় যে ঘটনাটা ঘটেছে, সেটা হলো সেইল থেকে নিচে পড়ে যাওয়া। ও ছিল কডেনকোর নিচে। আপনার কি মনে হয় নিচে থেকে টান মেরে কডেনকোকে নিজের ওপর ফেলেছে জ্যাকভ? আত্মহত্যার এতই শব্দ চেপেছিল?’

‘মাগেই তো বলছি, রুডিন আর জ্যাকভের বিপক্ষে আপনার সঙ্গে তর্ক করে পারব না,’ বললেন রাইকত।

‘ওক। যদি সত্যিই খুন্সী হয়ে থাকে, ওদের বাঁচানোর বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার

নেই। তবে একজন উকিল যেভাবে ব্যাপারটা চুলচেরা বিশ্লেষণ করত, আমি তাই করছি মাত্র।

‘মিকো,’ ধীরে ধীরে বলে গেলেন রাইকভ, ‘কিংবা বাবুর্চি অভয়—এদের ব্যাপারটা আশ্চর্য লাগেনি আপনার কাছে? ঘরের পুরে, দরজার কাছ থেকে দূরে ঘুমিয়েছিল নৃজনে। অথচ দরজার কাছাকাছি থেকেও ঘোয়ায় দম বন্ধ হয়ে গেল খায়রত আর ননেটির, পুড়ে মারা গেল। অভয় নাকি চৈচিয়ে, ধাক্কা মেরে জাগানোর চেষ্টা করছে ওদের, পারেনি। কেন? আশুন লাগল আশেই ঘরে গিয়েছিল, কিংবা অজান? এমনও হতে পারে, খাবার সত্যিই মিকো আর অভয়, সেখানে ফেলে খায়রত-ননেটি, বাস, মুখ বন্ধ করে দেয়া হয় ওদের। তাছাড়া শিশুর, তলি আর ভাঙা ছুরিটার কথাই ধরুন। ওগুলো লুকানোর জায়গাটা বড় অন্ধুত। ট্রাইবের পেট্রোল ট্যাংক। ভেবে দেখুন, মিকো ট্রাইব ড্রাইভার। আরও একটা ব্যাপার, ক্যান্টেন কুমারভকে জখাতে যেতে যেন ইচ্ছে করেই নেতি করেছে মিকো। বাহরউসে যেতে তার অসুবিধে হাফিল আতনের জন্যে, অথচ রেডিও হাউসে গেল অভয়, সহজেই। তার কথাই আরও গোলমাল আছে। বলছে, বাহরউসে খাবার সময় নাকি টেবিলের ড্রাম বার্ট করেছে। যদি তাই হয়, আশুনটা লাগল কিভাবে? এত মারাত্মক আশুন? আশুন লেগেছে দেবেই ক্যান্টেন কুমারভকে সতর্ক করতে ছুটল মিকো, যেন এছাড়া তার আর করার কিছুই ছিল না।

‘চমৎকার, কমান্ডার, দারুণ! দারুণ কতগুলো পয়েন্ট তুলে ধরেছেন! কিন্তু মিকোর বিপক্ষে একটু বেশি বলে ফেললেন না? সে যদি সত্যিই খুনী হয়ে থাকে, এভাবে বোকার মত কথা বলে ফেসেস যাবে?’

‘কি করে আশুন লাগল এটা তদন্ত হবে তাইবনি হয়তো সে। কিংবা ভেবেছিল নভেলিতে যে খুন-খারাবি হয়ে গেছে, তা টেরই পাবে না কেউ, কেউ সন্দেহ করবে না।’

‘কিন্তু আশুন কি করে লাগল এটাই মূল প্রশ্ন ছিল আমার। দেখুন কমান্ডার, আগেও বলেছি, খাবার বলছি: সাংঘাতিক ধুরন্ধর এক খুনির পেছনে লেগেছি আমরা। এত সহজে তাকে ধরা যাবে না। অনেক ভেবে চিন্তে কাজ করে এই ধরনের লোকেরা। কি কি বাধা বিপত্তি আসতে পারে, সেসব আগেই ভেবে নিয়ে তবে কাজে নামে। নিজের মত কিংবা তার চেয়েও বুদ্ধিমান-কেউ নেই, একথা ভুলেও ভাবে না তারা। কাজেই প্রতিটি ঘটনা ঘটানোর আগে চুলচেরা হিসেব-নিকেশ করে দেখে নেয়া ভাল হচ্ছে কি হচ্ছে না।’

‘কি জানি। মাথটাই খারাপ হয়ে যাবে!’ তারী পলায় বললেন রাইকভ। ‘কপাল ভাল আমার, নিউক্লিয়ার সাবমেরিন চালানোর মত সহজ দায়িত্ব দেয়া হয়েছে আমাকে। কিন্তু মেজর, বাবুর্চি অভয়ের ব্যাপারটা?’

‘মিকোর সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে তাইবনি?’

‘যদি ধরি একই ঘরের চারদিকের মধ্যে দু’জনকে খুন করা হয়েছে, তাহলে জীবিত অন্য দু’জনের ওপর সন্দেহ থাকা পাড়ে না? আর কনসোলভ এর বুয়েলের কথা কি তারছেন?’

‘চাফ, বুদ্ধিমান। ওরা দু’জন যদি খুনী হয়ে থাকে, জায়েল থেকেই হোলা করিন

হবে।’

রানার চোখের দিকে সরাসরি তাকানো কমান্ডার। লেনিনগ্ৰাদ এক হাজার ফুট পানির তলায় নেমে যাবার সময় যেমন লেগেছিল রানা, তেমনি দৃষ্টি ফুটেছে রাইকভের চেহারায়। এক দিকেই একটা দৃক অতি সামান্য উঠল নামল। ধীরে ধীরে পলায় বললেন কমান্ডার, ‘ঠিক আছে, নভেলির আরও অনেক বন্দী করছি না আমি। ছাড়াই থাকুক খুনী। জানি না কেন, কিন্তু আপনার ওপর একটা গভীর আস্থা অনুভব করছি, মেজর রানা। আশা করি শেষ পর্যন্ত আপনার ওপর আমার এই আস্থা অটুট থাকবে। কিন্তু মেজর, একটা ব্যাপার, একটা কথা ঝট-ঝট করছে মনে।’

‘পোড়া লাশগুলোকে ল্যাবরেটরিতে সরানোর পরামর্শ দিন কে, যাতে বিকৃত লাশের তলায় প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো নাকিয়ে রাখতে পারা যায়, এই তো আপনার প্রশ্ন?’

‘রান হাসলেন রাইকভ। ‘ঠিক ধরেছেন। নভেলির লোকদের এই প্রশ্নটা করলেই তো অনেক সহজ হয়ে যায় অনেক কিছু।’

‘না, কঠিন হয়ে যায়। নভেলিতে খুন-খারাবি হয়েছে একথা জেনে গেছি আমরা, এটা জানে না এখনও খুনী। এই প্রশ্নটা করলেই সন্দেহ হয়ে যাবে তার। আমার যা মনে হয়, আদেশটা দিয়েছিলেন ক্যান্টেন কুমারভ।’

কয়েক মাস আগে বলে, আকাশে থাকত মেরু সূর্য, দিনটা হাত উজ্জল বাকমাকে। কিন্তু এখন আকাশে সূর্য নেই। বৎসরের এই শেষভাগে এই ল্যাটিটিউডে সূর্য প্রাকার কথাও নয়। কিন্তু তবু চমৎকার আবহাওয়া, এই বরফের রাজ্যে যতটা চমৎকার হওয়া সম্ভব ততটাই। নভেলিকে আবিষ্কার করে রানা আর বাহরউস লেনিনগ্ৰাদে বওনা দেবার পর ছত্রিশ ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। তখনকার সঙ্গে এখনকার আবহাওয়ার তুলনা করলে সত্যিই ব্যাপারটা অলৌকিকভাবে ঘটেছে বলেই মনে হয়। পুরো ওকু হয়ে গেছে ছুরির মত ধারাল পুলাল-বাতাস। বরফ-কুটির উড়ন্ত নদী যেন নিজের আত্মনায় ফিরে গেছে। কুড়ি ডিগ্রী উঠে গেছে উত্তাপ। পৃথিবীর এই বরফ-চর্মানিতে দৃষ্টিও চলছে এখন বেশ অনেক দূর, এর বেশি আশা করা যায় না শীতকালে।

অস্বাভাবিক অস্বস্তিকর পরিবেশে লেনিনগ্ৰাদের সীমিত পরিসরে বন্দী থেকে থেকে হাঁপিয়ে উঠেছে নাবিকেরা। মুখে বাতাসে খোলা জায়গায় বেড়ানোর কিছুটা অস্ত্র সুযোগ যখন পাওয়া গেছে, হারাতে রাজি নয় তারা। আরও একটা ব্যাপার, আইস স্টেশন নভেলি তাদের দারুণ কৌতূহলের বস্তু। এতদিন এত কষ্ট করে এত দীর্ঘ পথ পেরিয়ে কোন জায়গায় এসে পৌঁছাল লেনিনগ্ৰাদ, যদি দেখতে চায় মোখ দেয়া যায় না নাবিকদের। তাছাড়া নাবিকদের অনেকেরই এর আগে আইস-কাপে আসেনি, যা রাখা তো নূরত্ব কথা। কাজেই তারা নামতে চাইবে, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু বুধ ফুটে কেউ জানাল না নিভেলের উল্লেখ। নাবিকদের মনের উল্লেখ মোখ মোখই অনুমান করে ফেলেছেন মেন রাইকভ, তাদের অনুমতি দিলেন না। তারা এগিয়েটা নাগাদ প্রায় নামই হয়ে গেল লেনিনগ্ৰাদে।

দুপুরের একটু আগে সিক-বেরে এসে ফের রানা। টানখানই পাওয়া গেল

লেনিনগ্ৰাদ-২

১৬৩

ডাক্তার জ্যাকভকে। এমন মুড় নিয়ে আছে সে সেখানে, যেন লেনিনগ্রাদের এই এলাকাটা তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি। পোড়া যা আর ফুটবাইটের ক্ষতগুলো অনেকখানি ভাল হয়ে এসেছে ইতিমধ্যেই।

‘এই যে, ডাক্তার,’ বলল রানা, ‘ডাক্তারি তেমন জমল না মনে হচ্ছে?—কেমন আছে রোগীরা?’

‘রোগী আর কই!’ হতাশ হয়েছিল যেন জ্যাকভ, ‘কডেনাকো আর শুয়ে থাকছে না। মেরু-ভালুকের মত প্রাণশক্তি তার, উঠে পড়েছে। ক্যাপ্টেন কুমারও এখনও তেমন সুস্থ হননি, তবে ডায় ও নেই আর। বাকিগুলো তো একেবারেই সেরে গেছে। কার চিকিৎসা করব? চমৎকার বাবাব, গরম বিছানা আর নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরেছে বুঝতে পেরেই আসলে ভাল হয়ে গেছে সবাই। দেশে এই ধরনের রোগী সংখ্যায় বেশি হলে আমাদের না খেয়ে মরতে হত।’

‘অঞ্চ দেখুন কাওটা,’ যেন রোগীদের ব্যাপারে জ্যাকভের মতই রানাও অবাক হয়েছিল। ‘আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে বাঙ্কহাউসে ওদেরকে যদি বলতেন শীঘ্রি সুস্থ হয়ে উঠবে ওরা, পাগলই ঠাটুরাত আপনাকে।’

‘আসলে কি জানেন, মনের জোর বড় জোর। অনেক সময় অনেক কঠিন রোগও অবিশ্বাস্যভাবে সেরে যায় শুধু রোগীর মনের জোরের কারণেই। অন্যকে বলে আর কি করব, আপনি তো, মশাই, আরও অবাক করেছেন আমাকে। দুটো ভাঙা আঙুল নিয়ে ঘুরছেন, কথা বলছেন, একেবারে স্বাভাবিক, যেন কিছুই হয়নি! অবশ্য নাকি আপনার হাত? ব্যথা করে না?’

‘করে,’ স্বীকার করল রানা। ‘একেক সময় ব্যথার চোটে হাতটাই কেটে ফেলে দিতে ইচ্ছে করে।’

‘আনুন তো আরেকবার দেখি। ব্যাডেজটা বেঁধে দিই নতুন করে।’

দেখল জ্যাকভ। রানার ধাক্কা, ডাক্তার বলেই তেমন একটা মৌল্যেয়ম হাতে কাজ করল না জ্যাকভ, কিংবা অনুমান করল রানার বোধশক্তি বলতে কিছু নেই। তাই নিছক বীরত্ব দেখানোর জন্যেই যেন দাঁত-মুখ খিঁচে চোখ বন্ধ করে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে রানা, লেনিনগ্রাদের ইস্পাতের ছাদ ফুঁড়ে বেরিয়ে যাওয়া থেকে অনেক কষ্টে বিরত রাখল নিজেকে।

কাজ শেষ করে ভুরু কুঁচকে রানার দিকে চাইল জ্যাকভ, ‘আমি শিওর, ডাক্তার রানা, বোধশক্তি বলতে কিছু নেই আপনার দেহে। যাব যা কাজ, রোগী ছাড়া ডাক্তার বাচে? ওই দুই ন্যাটা যমজ তাই না থাকলে হাঁপিয়েই উঠতাম এতক্ষণে। দেখি যাই, একবার দেখে আসা দরকার ওদের।’

‘চলুন আমিও যাবি,’ বলল রানা। ‘আমাদের মস্তবোব জনো অধীর হয়ে আছেন কমান্ডার রাইকভ। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে সরে যেতে চান তিনি।’

‘কেমন?’ গলায় আরও জ্যাকভের, ‘তবে মনে হচ্ছে উদ্ভিগ হয়ে পড়েছেন কমান্ডার?’

‘বলুন। বরফেরে বিশ্বাস নেই। যে কোন মুহুর্তে অস্টিন বাধিয়ে করতে পারে। বুজ্ঞে আসতে শুরু করলে কাজই সেরেছে। আপাততী কতদিন এখানে আটকে

থাকতে হবে লেনিনগ্রাদকে কে জানে! দু’ এক বছর আরও থাকার ইচ্ছে আছে নাকি এখানে আপনার?’

হাসল জ্যাকভ। হঠাৎ কথাটা মনে পড়তেই হাসি মিলিয়ে গেল মুখ থেকে, ‘বরফের তলায় কতদিন থাকতে হবে আমাদের? মানে, খোলা সাগরে কবে নাগাদ পৌঁছবে লেনিনগ্রাদ?’

‘রাইকভ বলেছেন চল্লিশ ঘণ্টা। তবে তেমন পরিস্থিতি হলে চল্লিশ দিনও থাকতে হতে পারে। না না, অত উদ্ভিগ হবার কিছু নেই। ওপরের চেয়ে বরফের তলাটা অনেক বেশি নিরাপদ, মানে বিপদের সম্ভাবনা কম।’

সন্তুষ্ট হতে পারল না জ্যাকভ, কিন্তু আর কোন কথাও বলল না। নিঃশব্দে নিজের মেডিক্যাল কিটটা তুলে নিল। এগিয়ে চলল কন্ট্রোল রুমের দিকে। শিছু নিল রানা।

ওদের জন্যেই অপেক্ষা করছেন কমান্ডার রাইকভ। রানা আর জ্যাকভকে নিয়ে খোলা হ্যাচ দিয়ে রাইরে বেরিয়ে এলেন তিনি। স্টেশন নভেলির দিকে চলল তিনজনে।

পথে বেশ কিছু নাবিকের সঙ্গে দেখা হলো তাদের, লেনিনগ্রাদে ফিটের যাচ্ছে তারা। মুখ ভার। কেন, বুঝতে অসুবিধে হলো না রানার। নভেলির কক্ষাল নিশ্চয় খুব সুদৃশ্য বস্তু নয়।

আবহাওয়ার অকস্মাৎ পরিবর্তনে উগ্রপ বেড়ে গেছে। তার ওপর চল্লিশ ঘণ্টা একটানা হীটার চালু থাকায় বাঙ্কহাউসের ভেতরটা একটু বেশিই গরম হয়ে উঠেছে। দেয়াল গরম হয়ে যাওয়ায় এক ফোঁটা বরফ নেই রাইরের দিকে, সব গলে পড়েছে। হাঁশ ফিরেছে দুই যমজের একজনের, নিকোলাইয়ের। বালিশে ডর দিয়ে উঠে বসেছে সে, গরম সুপ খাচ্ছে। তাকে সাহায্য করছে দু’জন প্রহরী-নাবিকের একজন।

‘বাহ!’ রাইকভের দিকে ফিরল রানা, ‘একজন তো বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছে।’

‘হুঁ,’ রানার কথায় সায় দিয়ে মাথা ঝাঁকাল জ্যাকভ। এগিয়ে গিয়ে বুনিয়োনের ওপর কুঁকে দাঁড়াল। কয়েক সেকেন্ড মনোবাণ দিয়ে পরীক্ষা করল। তারপর সোজা হয়ে কমান্ডারের দিকে চেয়ে বলল, ‘অত্যন্ত অসুস্থ। একে নাড়ানো যাবে না, ক্যাপ্টেন।’

‘আমি যদি দায়িত্ব নিই,’ ভোঁতা শোনা কমান্ডারের কণ্ঠ, ‘অনুমতি দেবেন তো, ডাক্তার?’

রাইকভের কথাগুলো কেমন যেন ব্যবসায়ীসুলভ ব্যক্তিগত মনে হলো রানার কাছে। কিন্তু কমান্ডারকে দোষ দিতে পারল না সে। জ্যাকভ এখনও সন্দেহ মুক্ত হয়নি তার চোখে।

রাইকভের হয়ে যেন মাগ চাইল রানা, জ্যাকভের দিকে তাকিয়ে কমান্ডার-ভঙ্গিতে লাগ করল, তারপর এগিয়ে গিয়ে কুঁকে দাঁড়াল বুনিয়োনের ওপর তার পক্ষে সম্ভব সব রকমে পরীক্ষা করে সোজা হয়ে কমান্ডারের দিকে চাইল ডাক্তার জ্যাকভ ঠিকই বলেছেন, ক্যাপ্টেন। বুনিয়োন সত্যিই অসুস্থ। তবে আমার মনে হয় তাকে লাহাজে স্থানান্তর করা যাবে।

‘ডাক্তার বানা বুনিয়েন আপনার বোগী নয়। তার চিকিৎসার ভারও আপনার ওপর নয়’ প্রতিবাদ করল জ্যাকব।

‘জানি আমি দুঃখিত, ডাক্তার। কিন্তু লেমিনগ্ৰাদ আর নাবিকদের কথাও ভাবতে হবে। একজনকে জেনো পুরো জাহাজসুদ্ধ সবার জীবনের কুঁকি নেয়ার উপায় নেই আমার,’ শান্ত কণ্ঠ কমাডারের।

‘কিন্তু...’

‘আর কোন কিছু নয়। বললামই তো, বুনিয়েনের দায়িত্ব আমি নিলাম,’ বললেন কমাডার। ‘ডাক্তার জ্যাকব, বুনিয়েনের স্থানান্তরের ব্যাপারটা আপনি দেখানোনা করলে সত্যিই কতজ বোঝ করব। সাহায্যকারী হিসেবে যে ক’জন লোক দরকার, দিন।’

অগত্যা রাজি হলো জ্যাকব, কিন্তু মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে মোটেই মনুষ্ট হতে পারেনি সে। তবে বুনিয়েনের জাহাজে স্থানান্তরের তার উপযুক্ত লোকের হাতেই দিয়েছেন কমাডার।

বুনিয়েন আর নিকোলাইকে লেনিনগ্ৰাদে নিয়ে যাবার পর ইঁটার, টেলিফোন, তার, ইঁটাডি জাহাজে ফিরিয়ে নিতে দেবি হলো না। শেষ লোকটা সাবমেরিনে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা। তারপর ওটি ওটি পায়ে গিয়ে ঢুকল ট্রাঙ্কর শেডে।

পেট্রোল ট্যাংক জাহাজে ছুরিটা আছে ঠিকই, কিন্তু লিফ্টন আর তারির মাগাজিন দুটো গায়েন হয়ে গেছে। যে এই জিনিসগুলো নিয়ে শেছে সে ডাক্তার জ্যাকব নয়। কারণ লেমিনগ্ৰাদ থেকে বেরোনোর পর থেকে জাহাজে অগত্যা ফিরে যাওয়া পর্যন্ত সাবাকণ জ্যাকবের সঙ্গে আঠার মত লেগেছিল রানা।

বিকেল তিনটেয় ডুব দিল লেমিনগ্ৰাদ।

বরফের তলা দিয়ে এগিয়ে চলল দক্ষিণে, বোলা সাগরে- ইন্দেশ।

আট

মৃত, জাহাজবেই কেটে গেল বিকেলটা। অনেক কষ্টে বরফ ভেদ করে উঠেছিল লেমিনগ্ৰাদ, প্রায় দুদিনের মত একই জায়গায় কাটিয়ে ডুব দিয়েছে আবার। গত দুটো দিন মোটেই আনন্দ কাটেনি, কিন্তু তবু হাচ বফ করে সাবমেরিন ডুব দিতেই কেমন যেন মোতড় দিয়ে উঠল রানার বুকের ভেতর। জায়গাটার মাঝা বসে গিয়েছে মনে। তার চরিত্রের সঙ্গে দুর্গম এই অঞ্চলটার কোথায় যেন একটা যোগসূত্র আছে, কেমন বেন গোপন সূত্রের তিনে আকর্ষণ করে ওমে, ঠিক বলে বোঝানো যায় না।

আরও একটা কারণ আছে রানার খায়াপ নাশার। কতগুলো লোককে ফেলে এসেছে ওরা শেডেন-কতগুলো নিতপন্ন্য লোক, আতাবিক দুকায় কোনে ডলে পড়তে যাদের দেবি ছিল। এই দুর্গম অঞ্চলে এসে কাজ করাছিল জীবিকার জন্যে,

পরিবার-পরিজন থেকে অনেক অনেক দূরে, কিন্তু তারও দ্বার্যে লেগে গেল। এমন কেউ, যার কমতা আছে। যদিও জানে, এরা নিদোষ, তবু মের ঢাকুর মাত্র-তবু শেষ করে দিল। কি দাম মানুষের জীবনের?

রানার মনে অস্বস্তি। ঠিক একই কারণে অস্বস্তি আরও কয়েকজনের মনেও: কমাডার রাইকভ, লেফটেন্যান্ট কস্তভ, গ্যাকো, পিনিন এবং ডাক্তার রুডেনকো। এরা হয়জন জানে, লেনিনগ্ৰাদে রয়েছে এক বা একাধিক ভয়ঙ্কর বুনি। সামান্যতম প্রয়োজনেই যে আবার আঘাত হেনে বসতে পারে, যে-কোন সময়।

নভেলির অতিথিরা লেনিনগ্ৰাদের ভেতরটা ঘুরেফিরে দেখার অনুমতি চেয়েছে কমাডারের কাছে। ইচ্ছে ছিল না মোটেই, কিন্তু তবু রানার পরামর্শে বলতে গেলো বাধ্য হয়েই অনুমতি দিয়েছেন রাইকভ।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অতিথিদের সাবমেরিন দেখানোর দায়িত্ব নিল কস্তভ। সঙ্গে রইল রানা, ইচ্ছে করেই। আশা, বলা যায় না, কোন দরকারী সূত্র আবিষ্কার হয়ে যেতে পারে বুনির সঙ্গে সঙ্গে থাকলে।

পুরো জাহাজটাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অতিথিদের দেখান কস্তভ, দুটো জায়গা বামে: রিঅ্যাকটর রুম এবং ইনারশিয়াল-নেভিগেশন রুম।

দু’জন বিশেষ অতিথির ওপর কড়া নজর রাখল রানা সর্বকণ।

রাতের খাওয়া শেষ। সিক-বেতে গিয়ে ঢুকল ডাক্তার জ্যাকব, সঙ্গে রানা। রোগীদের দেখানোয় মন দিল জ্যাকব, পাশে পাশে রইল রানা। সাহায্য করল সাধ্য অনুযায়ী। ডাক্তার হিসেবে খুবই ভাল জ্যাকব, নিজের কাজ বোঝে। মৃত অভ্যন্ত হাতে রোগীদের ব্যাডেজ বদলাল, যার যা দরকার তার জন্যে ঠিক তা-ই করল। বেশির ভাগ সময় কাটল ক্যান্টেন কুমারভকে নিয়ে। রুডেনকোর কানের নিচেটা পরীক্ষা করল, ওমুখ লাগাল, হালকা রসিকতা করল। রুডেনকো দুর্বল, তাই আশ্রিত কাজ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে তাকে, কিন্তু পুরোপুরি নয়। লেনিনগ্ৰাদের মাত্র কয়েকজন লোক জানে, কমাডার রাইকভের ঘরের দুটো চাবির একটা দেয়া হয়েছে রুডেনকোকে। প্রয়োজন মত সবার অভ্যন্তে কস্তভ কিংবা গ্যাকোর সাহায্য নিয়ে কমাডারের ঘরে গিয়ে ঢোকে সে, তালা আটকে ভেতরে থাকে কিছুক্ষণ, তারপর আবার বেরিয়ে আসে সবার অলক্ষ্যে। বাইরে থেকে ঘরের তালা আটকে দিয়ে ওয়ে পড়ে সিক-বেতে এসে, নিজের কটে।

নিউক্লিয়নিকস ল্যাবরেটরিতে খানিকটা জায়গার মালপত্র সরিয়ে দুটো বিজ্ঞান্য পা তা হয়েছে। দুই যমজ ভাইকে এনে রাখা হয়েছে এই দুই বিজ্ঞান্য।

এতই আলতোভাবে এতই সাবধানে দুই ভাইকে আনা হয়েছে যে কোনই ক্ষতি হয়নি তাদের। এই কাজের জন্যে পুরো প্রশংসা প্রাপ্য জ্যাকবের।

বুনিয়েনও চুপ ছিলে পেয়েছে এখন। মারাত্মক-পোডা ডান বাততে ভয়ানক যন্ত্রণা, জ্যাকবকে ঢুকতে দেখেই জানাল সে।

বুনিয়েনের বিজ্ঞান্য পাশে গিয়ে দাঁড়াল জ্যাকব। থানাও পাশে এসে দাঁড়াল। বুনিয়েনের পোডা হাতটা তুলে পরীক্ষা কখন ডাক্তার। বীভৎসভাবে পড়েছে। চামড়া বলতে কিছু নেই। ক্ষতের ওপরের বিছুরি দুর্গমময় আন্তরণ ধীরে ধীরে

পরিহার করে নিল জ্যাকভ। লাল দগদগে রক্ত। আলুমিনিয়ামের তন্তুরিতে করে আনা মলম বের করল জ্যাকভ। ক্ষতের ওপর খুব সাবধানে আনতো করে মাখাল মলম। তারপর ব্যাডেজ বাঁধল শক্ত করে। বাখা-নিবারণক ইঞ্জেকশন দিল। কিছু ঘুমের বড়িও গেল। রোগীদের পাহারায় থাকা লোককে কড়া নির্দেশ দিল, যেন বুনিয়েনের সামান্যতম পরিবর্তনও জ্যাকভের গোচরে আনা হয়।

রাতের মত কাজ শেষ করে ঘুমোতে চলে গেল জ্যাকভ।

রানাও নিজের কেবিনে এসে ঢুকল। গত কয়েক রাত ধরে তার ঘুম নেই। পরিশ্রান্ত, তীক্ষ্ণ পরিশ্রান্ত সে। শরীরে আর ক্লান্তি নেই।

কেবিনে ঢুকে দেখল রানা, নিজের বাঁহে ওয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে রক্তভ।

ডাক্তার জ্যাকভের দেয়া ঘুমের বড়ি না খেয়েও মড়ার মত ঘুমাল রানা।

রাত দুটোয় ঘুম ভেঙে গেল রানার। চোখ ঘুমে জড়ানো, ক্লান্তি কাটেনি, মনে হলো মাত্র পাঁচ মিনিট আগে ঘুমিয়েছে। মন কিন্তু ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে সজাগ হয়ে উঠেছে।

এত জোরে শব্দ হচ্ছে, কুস্তকর্ণেরও ঘুম ভেঙে যেতে বাধ্য। প্রচণ্ড শব্দে বাজছে মাথার ওপর সাউন্ডবক্স, অ্যালার্ম হুইসেল। হাসপাতালের আলুলেসের ওয়ানিং হুইসেলের মতই উচ্চ-নিচ ফেল, কিন্তু আরও তীক্ষ্ণ, আরও জোরাল। বন্ধ পরিসরে যা নয় তার চেয়েও জোরে শোনা যাচ্ছে আগুয়াজ।

ওদিকে বাঙ্ক থেকে নেমে কাপড় পরতে শুরু করেছে রক্তভ। কাপড় পরে কোনমতে জুতোজোড়া পায়ে গলিয়ে দ্রুত হাতে ফিতে বাঁধতে লাগল।

'ব্যাপার কি?' জানতে চাইল রানা। হুইসেলের প্রচণ্ড শব্দে কান ঝালাপালা, চোঁচিয়ে কথা বলতে হলো তাকে।

'আগুন!' কঠিন শোনার রক্তভের কণ্ঠ, 'জাহাজে আগুন লেগেছে। আর লাগল কিনা বরফের তলায়।'

জামার বোতাম আঁটতে আঁটতে রানার কট পেরিয়ে ছুটে গেল রক্তভ। বেরিয়ে গিয়ে জোরে তৈলা মেবে দরজার পাল্লা বন্ধ করে দিল।

যেমন শুরু হয়েছিল, তেমনি আচমকা থেমে গেল হুইসেলের প্রচণ্ড কর্কশ চিংকার। শব্দ থেমে যাবার পর হঠাৎই বড় বেশি নিস্তক, বড় বেশি নিবৃত্ত মনে হলো জাহাজটাকে। অনুভব করল রানা, সামান্যতম কাপুনিও নেই জেনিনিয়াদে। বিশাল এঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেছে। আরও একটা ব্যাপার অনুভব করল রানা, শিরদাঁড়া বেয়ে বরফ-ঠাণ্ডা একটা ছোঁয়া উঠে আসছে ওপরে।

এঞ্জিন বন্ধ হলো কেন? বুঝতে পারল না রানা। এত তাড়াহাড়ি কি কারণে বন্ধ হয়ে গেল নিউক্লিয়ার এঞ্জিন? এবং এরপর কি ঘটবে?—হঠাৎ মনে হলো রানার, রিস্যাকটর কম থেকে আগুনের উল্লসি ছানি তো। অলার্ভিস উজ্জ্বল নীল সবুজ আর বেগুনী সেই আলানি ইউরেনিয়ামের স্থাপে যদি আগুন লাগে তো কি হবে?—জানে না রানা। জরুর দরকারও নেই। মৃত্যুটা স্তব্ধ অনেক বেশি দ্রুত হবে নেক্সের।

উঠে পড়ল রানা। কাপড় পরতে লাগল ধীরে সুস্থে, কোন তাড়াহড়ো নেই।

ভাঙা আলুলের জন্যে কাপড় পরতে অসুবিধে হচ্ছে, কিন্তু সেজন্যে নয়, আনলে দেরি করছে সে হচ্ছে করেই। জাহাজে আগুন লেগেছে, হয়তো ধ্বংস হতে যাচ্ছে রিস্যাকটর। একে রক্ষা করতে হলে রাইকভের ট্রেনিং পাওয়া জুদের তাড়াহড়ো করা দরকার। ওরা যদি কিছু করতে না পারে, 'কোথায় আগুন, কোথায় আগুন' বলে চোঁচিয়ে গলা ফাটানোই সার হবে রানার, জাহাজ বাঁচানোর জন্যে তেমন কিছুই করতে পারবে না সে।

রক্তভের কেবিন থেকে বেরিয়ে যাবার তিন মিনিট পরে কন্ট্রোল রুমের দরজা বুলে ভেতরে উকি দিল রানা। সঙ্গে সঙ্গে নাকেচোখে যেন থাবা মারল তীর বাঁঝাল ধোয়া। ঘরটা অন্ধকারাচ্ছন্ন। শোনা গেল রাইকভের তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর, 'ভেতরে এসে দরজা বন্ধ করে দিন।'

পেছনে দরজা বন্ধ করে দিলে ভেতরের দৃশ্য দেখার চেষ্টা করল রানা। কিন্তু ভাল করে চাইতেই পারছে না। এক মুঠো মরিচের গুড়ো ছাড়িয়ে দেয়া হয়েছে যেন তার চোখে। কালো, বিচ্ছিন্ন-গন্ধ, ঘন, ভারী ধোয়ায় ঘর ভরা। গলা জ্বালা করতে শুরু করেছে ইতিমধ্যেই। কয়েক ফুটের বেশি দৃষ্টি চলে না। চোখ মিটমিট করে কোনমতে তাকাল রানা, চোখ দিয়ে স্তব্ধ করে পানি ঝরতে শুরু করেছে। যার যার নিজের চেয়ারে বসে আছে নাবিক-অফিসারেরা। কেউ হাসফাঁস করছে, কেউ কাশছে, কেউ অশ্রুট গলায় পাল দিচ্ছে ধোয়াকে, সবার চোখেই পানি, কিন্তু আতঙ্কিত নয় কেউ।

'দরজার বাইরে থাকলেই ভাল করতেন, ডাক্তার,' শুরু করে কথা বললেন রাইকভ। 'দরজা বুলে দিলে অবশ্য কমে যাবে, কিন্তু ধোয়া এখানেই সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করছি।'

'কোথায় আগুন লেগেছে?'

'এঞ্জিন রুম,' নিজের বাড়ির ব্যালকনিতে বসে যেন আবহাওয়ার খবর রাখবার জানাচ্ছেন রানা'কে কমান্ডার, এমনি ভাষায়। এই লোকটির বিপদে ধৈর্য-ধরার ক্ষমতা দেখে অন্যান্য অনেকবারের মত আরেকবার বিস্মিত হলো রানা। 'তবে এঞ্জিন রুমের কোথায়, জানি না এখনও। ব্যাপারটা খারাপই বলতে হবে, বিশেষ করে এই ধোয়া। আগুন কতটা মারাত্মক, বুঝতে পারছি না। এঞ্জিনিয়ার অফিসার জানাচ্ছে, এঞ্জিন রুম গাঢ় অন্ধকার। কিছুই দেখা যাচ্ছে না।'

'এঞ্জিন,' বলল রানা, 'বন্ধ হয়ে গেছে। কোন গোলমাল...'

রুমাল দিয়ে চোখ ডলতে ডলতে এগিয়ে গিয়ে একটা লোককে কি বললেন কমান্ডার। কবারের সূচি পরে মুখে মাঝ লাগিয়েছে লোকটা।

'ধোয়ায় সেক্ষ হব না আমরা,' রানার দিকে ফিরে সাদুনা দিলেন রাইকভ। হাসলেন। 'যাবড়ার কিছুই নেই। আপসিক পাইল কোন গোলমাল করবে না। যদি কোন গোলমাল দেখা দিতে চায়, এক সেকেন্ডের জাহাজ ভাগের এক ভাগেরও কম সময়ে ইউরেনিয়াম বন্ধ থেমে যাবে, বন্ধ করে দেবে রিস্যাকশন। এখন অবশ্য এঞ্জিনটা আমরাই ধামিয়ে দিয়েছি। এঞ্জিন রুমের ওরা কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, রিস্যাকটর ভাঙাল কিংবা কন্ট্রোল রুমের গভর্নর, কিছু না। বাধা হয়েই এঞ্জিন অফ করে রাখতে হয়েছে। ধোয়ার জ্বালায় এঞ্জিন রুম থেকে জুলা বেরিয়ে চলে

এসেছে। সবাই গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে স্টার্ন রুমে।

হাপ ডাউন রানা। বিস্ফোরণে টুকরো টুকরো হচ্ছে না ওরা, কিংবা আণবিক রিঅ্যাকশনে বাষ্প জাতীয় কিছুও হয়ে যাচ্ছে না। আপাতত শুধু দম বন্ধ হওয়া থেকে বাঁচতে পারলেই হলো।

‘আমরা কি করছি তাহলে এখন?’ জানতে চাইল রানা।

‘এখনি ভেসে ওঠা উচিত। কিন্তু মাথার ওপর চোদ্দ ফুট বরফ।

বরফ নাট্য আর মাস্ক পরা লোকটার দিকে ফিরে কিছু নির্দেশ দিলেন রাইকড। লোকটার হাতে ডায়াল লাগানো একটা ছোট ব্যাল। সেক্টর দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়ালেন কমান্ডার। রানার দিকে ফিরে বললেন, ‘একটিউজ মি, ডব্লিউ রানা,’ বলে লোকটার সঙ্গে এগিয়ে চললেন। নেভিগেটরের চার্ট দেখে পেরিয়ে, আইস মেশিনের ধার দিয়ে এগিয়ে গেলেন ভারী দরজার দিকে। দরজার ওপারে প্যাসেজের প্রান্তে এঞ্জিন রুম, তার নিচে রিঅ্যাক্টর কম্পার্টমেন্ট।

ভারী দরজার চড়কো খুলল স্যুট পরা লোকটা। ধাক্কা দিয়ে পাল্লা খুলতেই জট পাকানো গাঢ় কালো ধোয়া এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল কন্ট্রোল রুমে। চোখের পলকে ছিটকে প্যাসেজে বেরিয়ে গেল লোকটা। ওইটুকু সময়েই প্যাসেজে বোম্বার পরিমাণ নির্বাচন করলেন কমান্ডার, পরক্ষণেই ধাক্কা মেরে আবার লাগিয়ে দিলেন পাল্লা। আবার কন্ট্রোল পজিশনে ফিরে এসে হাত বাড়িয়ে কফ-মাইক্রোফোন বুনে আনলেন।

‘ক্যাপ্টেন বলছি,’ গম গম করে উঠল রাইকডের কণ্ঠ বন্ধ ঘরে, ‘এঞ্জিন রুমে আঙন লেগেছে, কিন্তু ঠিক কোন জায়গা থেকে গুরু হয়েছে জানতে পারিনি এখনও। কি করে লাগল: ইলেকট্রিক্যাল, কেমিক্যাল নাকি ফুয়েল থেকে সৃষ্টি হয়েছে এই আঙন তাও জানি না। ব্যাজিয়েশন লীক করেছে কিনা, পরীক্ষা করতে লোক গেছে,’ একটু থামলেন কমান্ডার। বুঝল রানা, স্যুট পরা লোকটার হাতের ব্যালটা গাইগার কাউন্টার জাতীয় কিছু। আবার কথা বললেন রাইকড, ‘যদি নেগেটিভ বোঝা যায়, স্টীম লীক করেছে কিনা জানার চেষ্টা করব। যদি তা-ও নেগেটিভ হয়, আঙনের উৎপত্তি কোথায় হয়েছে, জানতে হবে। খুবই কঠিন কাজ, কারণ এঞ্জিন রুমে ভিজিবিলাটি জিরো। এঞ্জিন রুমেও সমস্ত ইলেকট্রিক সার্কিট বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, এমনকি বাতিও জ্বলছে না—কে জানে, বাতাসে অ্যাটোমাইজড ফুয়েলের অস্তিত্ব আছে কিনা! তাহলে বিস্ফোরণ ঘটবে। অক্সিজেন-ইনটেক ভালতুলোও বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, একেবারে আলাদা করে ফেলা হয়েছে এঞ্জিন রুমকে। শেডভের বন্ধ বাতাসে ফোটুকু অক্সিজেন রয়েছে জুড়ে জুড়ে শেষ হয়ে যাবে, সারা জাহাজে ছড়িয়ে পড়ার আর কোন সম্ভাবনা নেই।

‘মুমপান নির্মিত এখন,’ কোনো নির্দেশ দিতে লাগলেন কমান্ডার, ‘হীটার, ফ্যান, এবং কথা বলার সাইন ডাডা জনা সমস্ত ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটের সুইচ অফ রাখতে হবে। অতি প্রয়োজনীয় দু’একটা ডাডা বসন্ত বাতির সুইচ অফ করতে হবে। যে যেখানে আছে, নেহায়েত দরকার না পড়লে নড়বে না। পরিস্থিতির যে-কোন বরফের উন্নতি সঙ্গে সঙ্গে জানাব আমি।’

কেউ একজন এসে পাশে দাঁড়িয়েছে, টের পেল রানা। ফিরে চেয়ে দেখল

ডাক্তার জ্যাকড। হাসি হাসি ভাবটা মুখ থেকে নিরাক্ষেপ হয়ে গেছে, গাল বেয়ে পানি পড়াচ্ছে ডাক্তারের। ফ্যানভেসে গলায় রানাকে বলল, ‘বাপরে বাপ, পোয়া কি! নভেলি থেকে উদ্ধার পেয়ে খুব একটা লাভ হলো মনে হচ্ছে না এখন। আর কমান্ডারের এইসব নির্দেশ—সিগারেট বাওয়া চলবে না, ফ্যান বন্ধ, আলো থাকবে না, চলাফেরা বন্ধ—কফিনে এসে ঢুকলাম নাকি রে, বাবা!’

‘বাধা হয়েই এই নির্দেশ দিতে হয়েছে,’ জবাবটা দিলেন রাইকডই। জ্যাকডের কথা কানে গেছে তার। ‘নিউক্লিয়ার সাবমেরিনে এর চেয়ে বড় বিপদ আর নেই, বরফের তলায় জাহাজে আঙন। সাধারণ সাবমেরিনের চাইতে অবস্থা অনেক বেশি খারাপ আমাদের। ওই সব জাহাজে পতুর ব্যাটারি তৈরি রাখা হয়। দরকার পড়লে শুধু ব্যাটারির শক্তিতে এঞ্জিন চালিয়েই মাইলের পর মাইল চলে যাওয়া যায়। অ্যামটমিক সাবমেরিনে ব্যাটারির বিশেষ দরকার পড়ে না। কাজেই আমাদের ব্যাটারির ঠেক খুবই কম।’

‘তা বুঝলাম,’ মাথা ঝাঁকাল জ্যাকড, ‘কিন্তু মুমপান আর নড়াচড়ায় নিষেধ—’

‘সেই ব্যাটারি,’ বাধা দিয়ে বললেন রাইকড। ‘ব্যাটারির স্টক বেশি থাকলে এসবের কোন প্রয়োজন পড়ত না। এঞ্জিন বন্ধ, জেনারেটর বন্ধ। ব্যাটারিতে চলছে এখন বাতাস-পরিশোধন যন্ত্র। লাইট, ভেন্টিলেশন, হীটিং সবই চালাতে হচ্ছে ব্যাটারির সাহায্যে। বিদ্যুৎ বেশি খরচ করলে শীঘ্রই ফুরিয়ে যাবে ব্যাটারি, সত্যি সত্যিই কফিনে পরিণত হবে লেনিনগাদ। বাতাস বিপদ রাখার প্রয়োজনে মুমপান করা যাবে না। বেশি নড়াচড়া করলে প্রখাদের সঙ্গে কাবন-ডাই-অক্সাইড বেশি পরিমাণে বেরোবে। বন্ধ জায়গায় এই গ্যাসের আধিক্য দেখা দিলে কি ঘটবে আপনি আমার চেয়ে বেশি ভাল বোঝেন। কিন্তু বিদ্যুৎ বাতানোর সব চেয়ে বড় কারণ, হীটার জ্বালানো, পাশ্প চালানো এবং রিঅ্যাক্টরের মোটর আবার স্টার্ট দেবার জন্যে আমাদের বিদ্যুৎ দরকার। যদি রিঅ্যাক্টর স্টার্ট করার আগেই সমস্ত ব্যাটারি শেষ করে ফেলি—তা ডাক্তার, আপনার কি ইচ্ছে জানি না, কিন্তু আমাকে দেশে ফিরতেই হবে।’

‘মানুষকে হতাশার সংবাদ দিতে জুড়ি নেই আপনার, কমান্ডার,’ অনুযোগ করল জ্যাকড।

‘ডাক্তাররা কখনও হতাশ হয় না বলেই জানতাম,’ শুধু হাসি হাসলেন কমান্ডার। ‘আপনি কি বলেন, ডাক্তার রানা?’

‘আসলে পেনশন ভোগ না করে মরার ইচ্ছে নেই আপনার, কমান্ডার,’ বলল রানা।

‘এতদিন খেটেখুটে পেনশন ভোগ করতে না পারলে মরেও কি শান্তি হবে?’ সত্যিই যেন পেনশনের জন্যে দারুণ দুঃখিতা হচ্ছে, এমনভাবে কথা বললেন রাইকড। ‘একটা পলিনাইয়া পোতেই হবে, যে করেই হোক। ভাগিয়ে তুলতে হবে লেনিনগাদকে। হ্যাঁচ বলে ধোয়া বাইরে বের করে দেব যতটা সম্ভব হয়। তারপর ভিজেল এঞ্জিন স্টার্ট দিলেই কয়েক মিনিটের মধ্যে এঞ্জিন রুমের সমস্ত ধোয়া টেনে খেয়ে ফেলবে ওটা। ভাসতে না পারলে মরা কিম্বাই হবে।’

‘কম্পাসডলো কি ব্যাটারিতে চলে?’ জানতে চাইল রানা।

'ভাল কথা মনে করেছেন,' বললেন রাইকড। 'ব্যাকটারি শক্তি কমে গেলে, আমাদের তিনটে স্পেরী জাইরো-কম্পাস আর ইনারশিয়াল-গাইডেন মেশিন N6A অকেজো হয়ে যাবে। আমরাও হারিয়ে যাব। এই বরফের রাজ্যে, এই ল্যাটিটুডে চুম্বক-কম্পাস কোনই নিশানা দেখাবে না, চক্রাকারে ঘুরবে শুধু কাঁটা।'
'আমরাও চক্রাকারেই ঘুরব তখন,' চিন্তিত শোনার জ্যাকভের কণ্ঠ, 'ঘুরতেই থাকব, ঘুরতেই থাকব... কমান্ডার, নভেলিতে থাকাই অনেক ভাল ছিল আমাদের জন্যে।'

'এখনও মরিনি আমরা, ডাক্তার... হ্যাঁ, কতটুকু?' ঘরে এসে ঢুকেছে কস্তভ, তাকে দেখেই জিজ্ঞেস করলেন কমান্ডার।

'ভ্যালেনকড, কমরেড, আইস মেশিনের কাছে বসে আছে। ওকে একটা মাস্ক দেয়া যায়? চোখ আর মেনে রাখতে পারছে না বেচারার, অনবরত পানি পড়ছে।'

'যা দরকার নাওগে,' বললেন রাইকড। 'ওর চোখ অকেজো হওয়া চলবে না। গ্রাফ পড়তে হবে। কড়া নজর রাখতে বলো আইস মেশিনের ওপর। বরফে চুলের মত সূক্ষ্ম চিড়ও যেন চোখ না এড়ায়। আর্ট-ন' ফুট পুরু বরফের স্তর পাওয়া গেলেও সঙ্গে সঙ্গে জানাবে আমাদের।'

'টর্পেডো?' জানতে চাইল কস্তভ। 'গত তিন ঘণ্টায় ওগুলো ব্যবহার করার মত পাতলা বরফ পাওয়া যায়নি। যে হারে এগোচ্ছে লেনিনগ্ৰাদ, আগামী তিন মাসেও পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। তবু যাই, দেখি, কি হয়। আমিও থাকছি ভ্যালেনকডের সাথে, আমার এই হাতটার জন্যে কোন কাজই করতে পারছি না।'

'তবু যথেষ্ট করছ তুমি। ধন্যবাদ। যাবার আগে এঞ্জিনম্যান ভাগিলিকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড জ্বারার এবং মনোঅক্সাইড বার্নার বন্ধ করে দিতে বলো। যতটা সম্ভব শক্তি বাচাতে হবে আমাদের। সাবমেরিনের পূর্ব পুরুষেরা তাদের চালকদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করত, তার খানিক স্বাদ আমরাও পেয়ে নিই, কি বলো? শীঘ্রিই অনুভব করবে, একটানা বিশ ঘণ্টা পানির ওলায় থাকতে বাধ্য হলে কতটা আরাম পেত আপেকাকালের সাবমেরিনাররা।'

'অসুস্থদের ভীষণ অসুবিধে হবে,' বলল রানা। 'ক্যাপ্টেন কুমারভ, দুই যমজ, ভাল বাতাস না পেলে ওদের কি অবস্থা হবে কে জানে!'

'দুঃখিত, ডাক্তার রানা,' সত্যিই দুঃখ প্রকাশ পেল রাইকডের কণ্ঠে। 'অক্সিজেন একেবারে কমে গেলে শুধু সিক-বে আর ল্যাবরেটরিতে বিগুপ্ত বাতাসের ব্যবস্থা করব,' আচমকা দরজা খুলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকল এক ঝলক তীক্ষ্ণকায়ী কালো ধোয়া। মাস্ক আর বাবার সুটি পরা লোকটা ঘরে এসে ঢুকেছে। টেলটায়মান অবস্থা ওয়। রাইকড সহ আরও দু'জন লোক তড়িৎগতিতে ছুটে গেল। কমান্ডার আর একজন দু'পাশ থেকে দুই বাহু চেলে ধরল মাস্ক পরিহিতের, অন্যজন খাড়া দিয়ে বন্ধ করে দিল দরজার ভারী শালা।

টেনে লোকটার মুখ থেকে মাস্ক খুলে আনলেন কমান্ডার। ইয়েভজেনি টাবু। টর্পেডো রুমে সেদিন এই লোকই রানার বন্ধী হয়েছিল। এই ধরনের জরুরী পরিস্থিতিতে গ্যাকো আর টাবুর মত লোকই দরকার, ডাক্তার রানা।

সাদা স্ফ্যাকাসে হয়ে গেছে টাবুর মুখ। বাতাসের জন্যে হাসফাস করছে।

চোখের মণি উল্টে কপালের দিকে উঠে গেছে। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে যে-কোন সময় জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যেতে পারে। কন্ট্রোল রুমের বিচ্ছিন্ন বাতাসও এখন বিগুপ্ত পাহাড়ী বাতাসের মত লাগছে তার কাছে।

ভিত্তি সেকেভেই মাথার ভেতরের ঘোলাটে ভাবটা কেটে গেল টাবুর। ধরে নিয়ে গিয়ে তাকে চেয়ারে বসিয়ে দেয়া হয়েছে। হেলান দিয়ে মলিন হাসি হাসল সে।

'সরি, ক্যাপ্টেন,' জোরে জোরে শ্বাস টেনে বলল টাবু। 'এঞ্জিন রুমে এখন যা অবস্থা, এই মাস্ক তেমন কোন কাজেই আসেনি। নরকের নমুনা কিছুটা দেখে এসেছি,' আরেকবার জোরে শ্বাস টানল সে। হাসল। 'তবে সুসংবাদ আছে। নো ব্যাডিয়েশন লীক।'

'গাইগার কাউন্টারটা কোথায়?' শান্তভাবে জানতে চাইলেন রাইকড।

'হারিয়ে গেছে, কমরেড। সত্যি বলছি, ওখানে তিন ইঞ্চি দূর থেকেও কিছু দেখা যায় না। একটা মেশিনে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিলাম, কাউন্টারটা হাত থেকে ছিটকে পড়ে গিয়েছে কোথায়। তবে যা দেখার আগেই দেখে নিয়েছি।' কাঁধ থেকে ক্রিপ খুলে ফিল্ম ব্যাজ বের করল টাবু, 'এতে আছে, কমরেড।'

'জলদি ডেভেলপ করে নিয়ে এসো,' পাশে দাঁড়ানো একজনকে আদেশ দিলেন রাইকড। টাবুকে বললেন, 'দারুণ দেখিয়েছ, জেনি। যাও, মেন্স রুমের দিকে চলে যাও। এখানকার চেয়ে পরিষ্কার বাতাস ওখানে।'

টাবু উঠে চলে গেল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ডেভেলপ হয়ে গেল ফিল্ম। ডেভেলপারের হাত থেকে ছোঁ মেঝে সেটা তুলে নিলেন কমান্ডার। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে নিয়েই মুখ তুলে হাসলেন, 'ঠিকই বলেছে জেনি। নো ব্যাডিয়েশন লীক।'

এই সময় কন্ট্রোল রুমের সামনের দরজা খুলে গেল। ধোয়ার মধ্যেও ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই লোকটাকে চিনতে পারল না রানা।

'চীফ টর্পেডোম্যান লুমিপভের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে এসেছি, কমরেড,' বলল গ্যাকো।

'ধরে নিতে পারি, টাবুর দায়িত্ব পালন করতে এসেছ, নাকি?' গ্যাকোর পেটের কথা আগেই বলে দিলেন রাইকড।

টাবুর অবস্থা খারাপ। 'আমি ছাড়া আর কে যাবে, কমরেড?'

'আরও লোক নিচ্ছই...'

'গ্যাকোই যাক না,' সুপারিশ করল রানা। 'ওই শ্মোক মাস্ক বিশেষ সুবিধের না। এক কাজ করুক, আভারওয়াটার অক্সিজেন সেট নিয়ে যাক।'

'স্টীম লীক চেক করতে বলছেন তো আমাদের, ক্যাপ্টেন?' জিজ্ঞেস করল গ্যাকো।

'ইলেকশনে দাঁড়িয়ে নিজেকেই নিজে ভোট দিয়েছ, এবং একবার ভোটেই জিতে গেছ,' বললেন কমান্ডার। 'হ্যাঁ, স্টীম লীক।'

'ওই সুটিটা পরে গিয়েছিল টাবু?' মোকাবেলা পড়ে থাকা রানার সুটিটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল গ্যাকো।

‘হ্যাঁ, কেন?’

‘স্টীম নীক করলে ময়েশচার লেগে থাকতে পারে নাটে।’ দৈবত্বের কন্ঠস্বর।

‘তা পারে। কিন্তু ভয়ানক গরমে আবার ঠিকঠিক মতে পারে। আরও অনেক কিছুই ঘটতে পারে।’ আবার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সময় নেই কোরো না।

‘এই যে যাচ্ছি, কন্ঠস্বর।’ তাড়াতাড়ি বলে উঠল গ্যাকো। কন্ঠস্বরের দিকে ফিরে আসল। ‘আইন ক্যাপে টেকা দিয়েছিলেন, লেকটেন্যান্ট, কিন্তু এবার? এবার ইমডেল জিনিয়র নিতে যাচ্ছি আমি।’

‘একটা দাঁড়াও, গ্যাকো,’ বলল কন্ঠস্বর। কন্ঠস্বরের দিকে চেয়ে বসল, ‘আমার একটা পরামর্শ আছে, ক্যাপ্টেন।’ ওখানে ঢুকে মাস্ক খুলতে পারবে না ও, কাজেই কি ঘটছে না ঘটছে আমাদের বলে জানতে পারবে না। এক কাজ করতে পারে। প্রতি চার-পাঁচ মিনিট পর পর এজিন টেলিগ্রাফের সাহায্যে কল-সাইন পাঠাতে পারে। তাহলেই আমরা বুঝব, ও ভানই আছে। কল-সাইন না পেলেই আবেকজনের পাঠানো যাবে এক পথ দেখিয়ে নিয়ে আসার জন্যে।’

মাথা কাঁকিয়ে দায় দিলেন রাইকড।

সুট এবং অস্লিভেন-আপারেটাস পরে নিয়ে চলে গেল গ্যাকো। এই নিয়ে তিনবার এজিন রুমের দিকে যাবার দরজাটা খোলা হলো। বার বার খোলার পাচ কালো ধোয়া ঢুকে বিমুক্ত করে তুলল কন্ঠস্বর রুমের আবহাওয়া। চোখ খুলে রাখাই মুশকিল। কন্ঠস্বরের নির্দেশে একজন কিছু গালস সাপ্লাই করে গেল। কেউ কেউ মাস্ক পরল।

ফোন বাজল এই সময়। মিনিটার তুলল কন্ঠস্বর, কথা বলল, তারপর রেখে দিল আবার।

‘মোমিনভ, স্যার,’ বলল কন্ঠস্বর। লেকটেন্যান্ট হুগেই মোমিনভ, মেইন-প্রোপালশন অফিসার। ‘অসুস্থ হয়ে পড়ায় ম্যানুভার রুম থেকে স্টার্ন রুমে সরে যেতে বাধ্য হয়েছিল। এখন ঠিকই আছে বলছে। যোক মাস্ক কিংবা বীদিং আপারেটাস পাঠাতে পারব কিনা জানতে চেয়েছে তার এবং আবেকজনের জন্যে। হ্যাঁ বলে দিয়েছি আমি।’

‘মোমিনভ নিজে তদন্ত করলে আন্তরিক যুগি হবে আমি,’ বললেন রাইকড। ‘কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দাও।’

‘আমিই নিয়ে যাচ্ছি জিনিভলো,’ বলল কন্ঠস্বর। ‘আইন মেশিনের ওপর অন্য আর কাউকে সজর রাখতে বসে দিচ্ছি।’

কন্ঠস্বরের আহত হাতের দিকে তাকালেন রাইকড। বিধা করলেন, তারপর মাথা কাঁকালেন। ‘ঠিক আছে। কিন্তু যাবে আর আসবে?’

মিনিটখানেকের মধ্যেই হুগেই ম্যানুভার জিনিভলো নিয়ে চলে গেল কন্ঠস্বর। পায় ঘিঙি পড়ে ফিরে এল। বীদিং আপারেটাস খুলে দিল। চক্কাবা কাকাসে হয়ে গেছে এই কয় মিনিটেই। কপালে ঘাম।

‘এজিন রুম আওন করাচ্ছে, কল কন্ঠস্বর।’ ‘একবারে মরুক।’ সুইচ কিংবা শিখা দেখলাম না। দেখব কি? যা পাচ খোয়া। রাইকড কার্ণেলের আওনও দুই ফুট দূরে

থেকে দেখা যাবে না।

‘গ্যাকোকে দেখেছ?’ জানতে চাইলেন রাইকড।

‘না, কি করিনি?’

‘দু’বার করেছে। কিন্তু...’ এই সময় রিং হওয়ায় ধেমো গেলেন রাইকড তারপর ফললেন, ‘ওই যে, গ্যাকো। ভানই আছে মোকা যাচ্ছে, স্টার্ন রুমের অবস্থা কি, ইউরি?’

‘এখানকার চোখে অনেক খাবার।’ আহত নোকওলোর অবস্থা শোচনীয়। বিশেষ করে বুনিয়াদ, দরজা বন্ধ করার আগেই কি করে জানি প্রচুর খোয়া ঢুকে পড়েছে।

‘এবার ক্রাবার স্টার্ট নিতে বলাও আসিলিকে। শুধু ল্যাবরেটরির জন্যে।’

পনেরো মিনিট পেরিয়ে গেল। এই সময়ের মধ্যে আরও তিনবার বাজল এজিন রুম টেলিগ্রাফ। কন্ঠস্বর রুমের বন্ধ বাতাস আরও বিমুক্ত হয়ে উঠেছে। খাস নেয়া গ্রীষ্ম কষ্টকর হয়ে উঠেছে। পুরো সাজ-পোশাক পরে ফায়ার ফাইটিং টীম এসে প্রবেশ করেছে কন্ঠস্বর সেটারে। এই সময় আবার খুলে গেল পেছনের দরজা।

গ্যাকো। দাঁড়ানো দেখেই বুঝতে কষ্ট হয় না, অত্যন্ত দুর্বল। বীদিং আপারেটাস আর সুট খুলতে সাহায্য করা হলো তাকে। রক্ত সরে গেছে মুখ থেকে। কপালে, মুখে, ঘাড়ের ঘামের বন্যা। কিন্তু খুশিতে জ্বল জ্বল করছে তার চোখ। দাঁত বের করে হাসছে গ্যাকো।

‘স্টীম নীক না, ক্যাপ্টেন,’ এই কয়টা শব্দ বলার ফাঁকেই তিনবার জোরে শ্বাস নিতে হলো গ্যাকোকে। ‘কিন্তু আওন কোথায় দেখে এসেছি, মেশিনারি স্পেসের নিচের দিকে।’ ফুলিঙ্গ ছড়াচ্ছে পুরো জায়গাটায়। অগ্নি শিখাও আছে। আওন পেগেছে হাই-প্রেশার টারবাইনে। শীথিং-এ আওন জ্বলছে।

‘মেডালটা শেষ পর্যন্ত কেড়েই নিলে তুমি, গ্যাকো,’ বললেন রাইকড। ‘আর কেউ না দিলেও, আমি তোমাকে একটা মেডাল উপহার দেব।’ অপেক্ষারত ফায়ারম্যানদের দিকে ফিরলেন কন্ঠস্বর। ‘ওনেছ? স্টারবোর্ড টারবাইন একেকবারে চারজন করে যাও। পনেরো মিনিটের বেশি থাকবে না। ক্যাম গ্রুপ প্রথম গ্রুপের দলপতি, ওলিভ, তুমি। সঙ্গে নেবে ছুরি, ক্র হামার, প্রায়ারল, জো-বার, সিও-ট। শীথিংটা ভেজাবে আগে, তারপর টেনে খুলে আসবে। স্টীম পাইপের ব্যাপারে হুশিয়ার। যাও।’

চলে গেল ওরা। রাইকডকে জিজ্ঞেস করল বানা, ‘তেনন কিছ হয়নি মনে হচ্ছে? কতক্ষণ লাগবে? দশ-পনেরো মিনিট?’

‘অতটা সহজ হবে না। আমাদের কপাল ভাল হলে তিন-চার ঘণ্টায় হয়ে যাবে। অসংখ্য জটিল যন্ত্রপাতির মাঝে রয়েছে জিনিভলো। ড্রালব, ডিউব, কন্ঠস্বর, আর কয়েক মাইল লম্বা পাঁচালো-বোয়ালো স্টীম পাইপ রয়েছে নাগ্নাতিক গরম। হুগেই লাগালেই চামড়া তেঁপে আসতে হবে। তার ওপর ওট বিশাল টারবাইন হাউজিং, এর চারপাশে পুরো ইনসুলেশন শীথিং জড়ানো। যে এজিনিয়ার কিট কন্ঠস্বর, তানমই কন্ঠস্বর, কোন সহজে উঠে না আসে। আগে ভার্টন-ডাই-ব্রজাইডের সাহায্যে আওন নিভিয়ে নিতে হবে। কিন্তু তারপরও সহজ

হবে না। একটা বারে পোড়া শীথিং-এর টুকরো খুলে আনা হবে, ভেতরে তেল রয়েছে বলে আবার জ্বলে উঠবে সেটা দপ করে।

‘তেল?’

‘গোলমালটা তো ওখানেই,’ ব্যাখ্যা করে বোঝালেন রাইকড। ‘যেখানেই যে যন্ত্রপাতি ঘোরানোর দরকার হবে, লুব্রিকেটর অয়েল লাগবেই। ওখানে যন্ত্রপাতিরও অভাব নেই, তেলেরও অভাব নেই। শীথিং-এ তেল নেই, কড়া কড়িভাবে হাইড্রোস্কোপিক করা, কাজেই তেলের জন্যে খাখা করছে হতমুণ্ডা ইনসুলেশনগুলো। চুক যেমন লোহাকে আকর্ষণ করে, তেল পেলেই তেমনি টেনে নেয় শীথিং। কাছাকাছি পেলে তো কথাই নেই। রুটিং পেপারের কালি যাওয়ার মত করে ঘষে নেবে।’

‘আঙুন লাগার কারণটা কি হতে পারে?’

‘স্পার্টেনিয়াস কমব্যাশশন। এ ধরনের ব্যাপার আগেও ঘটেছে। এ পর্যন্ত পকাশ হাজার মাইল চলেছে লেনিনগ্রাদ। এই সময়ের মধ্যে তেলে নিচুই মাখামাখি হয়ে গেছে শীথিং। নভেলি ছাড়ার পর থেকে টপ স্পীডে চলেছে, মারাত্মক গরম হয়েছে এঞ্জিন। বাস, আঙুন ধরে গেছে হতমুণ্ডা ইনসুলেশন... হঠাৎ মনে পড়ায় রুস্তভের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, ‘মোমিনভের কাছ থেকে এখনও কোন খবর এল না?’

‘এল না তো।’

‘বিশ মিনিট হয়ে গেল না?’

‘বেশি। তবে আমি যখন ফিরে আসি, মোমিনভ আর রিনিভি তখন স্টুট পরছে। হয়তো সঙ্গে সঙ্গেই এঞ্জিন ক্রমে যায়নি। যাই হোক স্টার্ন ক্রমে বিঙ করে দেখি।’ ঘোমত কল্ল কল্লভ। কথা বলল, ওপাশের বলা কথা ওলল, তারপর থমকতে মুখে রিসিভার রেখে কমান্ডারের দিকে চাইল, স্টার্ন ক্রমে জানাচ্ছে, পঁচিশ মিনিট আগে গেছে ওরা। এঞ্জিন ক্রমে গিয়ে দেখে আসব, ক্যাপ্টেন?

‘এখান থেকে এক পা নড়বে না...’

এক ঝটকায় পেছনের দরজা খুলে গেল। হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে বেঁচে গেল দু’জন লোকের একজন—তাকে পেছন থেকে ধরে রেখেছে অন্যজন। ধোয়া ঢুকল। ছুটে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল রুস্তভ।

আগন্তুক দু’জন মাথ খুলে নিল। হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল যে লোকটা, সে মোমিনভ। তাকে ধরে ধরে এনেছে একজন নাবিক, তাকে তিনতে পাকল রানা। ওলিপভের সঙ্গে যাওয়া ফায়ার-ফাইটারদের একজন।

‘লেকটেন্যান্ট মোমিনভের সঙ্গে আসতে বলেছেন আমাকে লেকটেন্যান্ট ওলিপভ,’ বলল ফায়ার-ফাইটার, ‘এনার অবস্থা খারাপ, কমরেড ক্যাপ্টেন।’ মোমিনভকে দেখিয়ে কমান্ডারকে বলল সে।

ঠিকই বলেছে ফায়ার-ফাইটার। মোমিনভের অবস্থা কাহিলই। দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না, টলছে। চেহারা দেখে অনুমান করতে কষ্ট হয় না, যে-কোন মুহূর্তে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যেতে পারে সে। ধরে নিয়ে গিয়ে একটা চেয়ারে বসিয়ে দেয়া হলো তাকে।

‘রিনিভি,’ কোনমতে মাথা বাড়ান রেখেছে মোমিনভ। ‘পাঁচ মিনিট...পাঁচ মিনিট আগে...’

‘কি হয়েছে?’ দ্রুত কথা বললেন রাইকড, ‘রিনিভির কি হয়েছে?’

‘পড়ে গেছে। নিচে, মেশিনারি স্পেসে। সঙ্গে সঙ্গেই নেমে গিয়েছি আমি, তোলার চেষ্টা করেছি, কিন্তু চেঁচিয়ে উঠেছে রিনিভি। প্রচণ্ড যন্ত্রণায়...’ হঠাৎ মোমিনভের মাথাটা বুকের ওপর খুলে পড়ল। গড়িয়ে মাটিতে পড়ে যাবার আগেই ধরে কেনা হলো তাকে। জ্ঞান হারিয়েছে।

‘মেজর ড্রাকচার সম্ভবত,’ বলল রানা। ‘ইন্টারনাল ইনজুরিও হতে পারে।’

‘সর্বনাশ!’ বললেন রাইকড, ‘ড্রাকচার! মেশিনারি স্পেসে!’ রুস্তভের দিকে ফিরে আদেশ দিলেন, ‘ইউরি, মোমিনভকে জুদের মেসে নিয়ে যাও,’ তারপর আপনমনেই বিড় বিড় করলেন আবার, ‘ড্রাকচার!’

‘আমাকে মাঝ আর স্টুট দিন,’ কমান্ডারকে বলল ডাক্তার জ্যাকড, ‘ডাক্তার রুডেনকোর ইমার্জেন্সী কিট নিয়ে আসছি আমি সিক-বে থেকে।’

‘আপনি?’ এদিক-ওদিক মাথা নেড়ে বললেন রাইকড, ‘আপনাকে তো যেতে দিতে পারি না আমি...’

‘ভসব নেভীর আইন-কানুনের কথা বাদ দিন এখন,’ শান্তকণ্ঠে বলল জ্যাকড।

‘আমি একজন রাশান, একজন ডাক্তার, আপনাদের সঙ্গে একই জাহাজে আছি। যদি জাহাজ ধ্বংস হয়ে যায়, আপনাদের পাশাপাশিই সীতরাতে হবে আমাকেও।’

‘কিন্তু...’

‘আর কোন কিন্তু নেই, আমি যাচ্ছি,’ জোর গলায় বলল জ্যাকড। ঘুরে চলে গেল সিক-বের দিকে।

রানার দিকে তাকালেন রাইকড। চোখে গগলস, কিন্তু তাঁর মুখের উদ্বিগ্ন ভাব নজর এড়াল না রানার। নিখাজড়ানো গলায় বললেন কমান্ডার, ‘ডাক্তার জ্যাকড যাবে...’

‘এছাড়া আর কোন উপায় নেই, আপনিও জানেন। ডাক্তার রুডেনকো যুত থাকলে তাকে অবশ্যই পাঠাতেন আপনি। তাহলে জ্যাকড যাবে না কেন? ডাক্তার হিসেবে সে খুবই ডার্ন।’

‘ওখানে যাননি আপনি, ডাক্তার রানা, তাই বলতে পারছেন। ওটা একটা ধাতব-জঙ্গল। ওই মেশিনারি স্পেসে বসে একটা ভাঙা আতুল জোড়া দেবারও উপায় নেই, মেজর ড্রাকচার তো দুয়ের কথা।’

‘আমার মনে হয় না, ওখানে ভাঙা হাড় স্প্লিট বাঁধতে যাবে ডাক্তার। রিনিভিকে একটা ইন্জেকশন দেবে বড়জোর। মই বেয়ে তুলে আনার সময় আর চেষ্টা হবে না বের্গেশ রিনিভি।’

মাথা ঝাঁকালেন রাইকড, ঠোট কুঁচকালেন, তারপর আইস ফ্যানোমিটার পরীক্ষা করার জন্যে এগিয়ে গেলেন।

‘অবস্থা খারাপ মনে হচ্ছে, না রুস্তভ?’ বলল রানা।

‘খুবই খারাপ,’ বলল রুস্তভ। ‘এমনিতে লেনিনগ্রাদের ভেতরের বাতালে ঘোলা ঘন্টা চলে। কিন্তু এখন, অর্ধেক বাতাসই খাঁস নেবার অবশ্য্য হয়ে

পড়েছে। যা আছে, তাতে আর ক'খটা চলবে, কে জানে! বাতাস-পিউরিফায়ার না চালালে মেশিন স্পেসে ফায়ার-ফাইটারদের কাজ করাই অসম্ভব হয়ে উঠবে। তাছাড়া আলো নেই। বীনিং আপারেটাস পরে ফ্লাডলাইটের আলোতেও পরিষ্কার দেখা যায় না, তার ওপর রয়েছে ধোঁয়া। বাতাস বিতরণ করার যন্ত্রটা চালানোর বুকি নেয়া যাচ্ছে না। বাতাসে অক্সিজেন বেড়ে গেলে ছড়িয়ে যাবে এজিন রুমের আগুন।

'বনে মনে শান্তি পাচ্ছি খুব,' বলল রানা। 'তা রিঅ্যাক্টর চালানো হবে কখন?'

'আগুন নিভিয়ে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পর।'

'কমান্ডার বলেছেন, আগুন নেভাতে তিন-চার ঘণ্টা লাগবে।'

'আরও বেশি লাগলেও অবাধ হবার কিছু নেই।'

মেডিক্যাল কিট হাতে নিয়ে কাশতে কাশতে একে কট্টোল সেটারে ঢুকল জ্যাকড। এসেই দুটো আর বীনিং আপারেটাস পরতে শুরু করল। আপারেটাস ব্যবহারের পদ্ধতি তাকে শিখিয়ে দিল রুস্তভ। মৃত পিঁখে নিল ডাক্তার।

'তাড়াতাড়ি কাজ সারবেন, ডাক্তার,' বললেন রাইকভ। 'মনে রাখবেন, এ ধরনের কাজের জন্যে ট্রেনিং নেই আপনার। দশ মিনিটের বেশি কোনমতেই থাকবেন না।'

মোমিনভকে নিয়ে এসেছিল যে লোকটা, সে-ই জ্যাকডকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। কিন্তু দশ মিনিট নয়, চার মিনিটের মাথায়ই কিরে এল ওরা। না, বের্শ রিনিমিককে আনেনি। বরং আধা-বয়ে আধা-হেঁচড়ে অজান জ্যাকডকে নিয়ে ঘরে ঢুকল ফায়ার-ফাইটার।

'ঠিক কি হয়েছিল, বলতে পারব না,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ফায়ার-ফাইটার। নিজের চাইতে তিরিশ পাউন্ড বেশি ভারী একটা অজান দেহকে বয়ে এনে একেবারেই হাঁপিয়ে উঠেছে সে। 'এজিন রুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিই। আমি আগে আগে ছিলাম, হঠাৎ আমার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন ডাক্তার। কোন কিছুতে হেঁচট খেয়েছিলেন হয়তো। আমি পড়ে পেলাম। হেঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়ানাম। উঠ জেলে দেখি আমার পায়ের কাছে পড়ে আছেন ডাক্তার, অজান। মাথটা ছুটে এক পাশে সরে গেছে। চেপেচুপে মাথটা আবার ডাক্তারের মুখে বসিয়ে দিয়েছি যতটা সম্ভব।'

'মটনটা কি!' বিড় বিড় করল রুস্তভ। 'মেডিক্যাল প্রকেশনের লোকদের ওপর প্রসন্ন নয় যেন লেনিনবাদ!' সামনের দরজার দিকে বয়ে নেয়া জ্যাকডের বের্শ দেহটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'চমকান হয়েছো এখন। তিনজন ডাক্তারের দু'জন একেজো, একজন ডাক্তার হিসেবে অকর্মী।'

ফিরে চেয়ে রুস্তভের কথা বললেন কমান্ডার, কিন্তু কিছু বললেন না।

'রিনিমিককে কোন ইঞ্জেকশন দিতে হবে,' কমান্ডারকে জিজ্ঞেস করল রানা, 'জানেন কি? কোথায় আছে ওষুধটা?'

'জানি না।'

'রুডেনকো ছাড়া লেনিনবাদের আর কেউ জানে?'

'জানেন না।'

রুডেনকোর কে বকাল কিট খুলল রানা। হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জ আর একটা শিশি বের করল। খানিকটা তরল শুধু সিরিঞ্জে ভরে নিজের বা হাতের কতিপয়ে ব্যাল্ভজ ফোনানে শেষ হয়েছে, ফোনানে সূচ ঢুকিয়ে নিল। শুধু পুষ করতে করতে বলল, 'পেইন কিলার। হাতটা একেবারে অকেজো নয়। বুড়ো আঙুল আর তর্জনী ঠিকই ব্যবহার করতে পারব।' গ্যাকোর দিকে চাইল রানা। বিবাক্ত বাতাসেও নিজেকে অনেকখানি সামলে নিয়েছে গ্যাকো। রানা জিজ্ঞেস করল, 'কেমন লাগছে এখন?'

'ভাল,' উঠে দাঁড়াল গ্যাকো। সত বাড়িয়ে চেয়ারে রাখা বীনিং আপারেটাস তুলে নিয়ে বলল, 'ভয় নেই, ডাক্তার। আপনার পাশে মোস্ত মেডালিস্ট টর্পেডোম্যান মাস্কিন গ্যাকো থাকবে...'

'এখনও সুস্থ অনেক লোক হাতে আছে আমার, ডাক্তার রানা,' বললেন রাইকভ।

'না, এদের নিয়ে হবে না। গ্যাকোকেই দরকার। ওরও ঊপকার হবে এতে। একই দিনে দু'দুটো মেডান পেয়ে যাবে। দ্বিতীয়টা আমি দেব।'

হেসে মাথার ওপর দিয়ে মাথটা নামিয়ে টেনে আনল গ্যাকো।

দুই মিনিট পরেই গ্যাকোকে নিয়ে এজিন রুমে ঢুকল রানা।

বন্ধ, ভ্যাপসা গরম এজিন রুমে। জোরাল টর্চের তীব্র আলোয় আঠারো ইঞ্চির বেশি দূরীত্ব নেই। বীনিং আপারেটাস অবশ্য ঠিকমতই কাজ করছে, কোন রকম অপ্রতিবোধ করছে না রানা।

রানার বাহু ধরে একটা মইয়ের মাথার কাছে নিয়ে গেল গ্যাকো। বুকল রানা, মইয়ের তলা মেশিনারি স্পেসে গিয়ে ঠেকেছে। নিচে ফায়ার এক্সটিংগুইশারের তীরে হিসিসানি শোনা যাচ্ছে।

নিচে সামনের দিকে বিশাল টারবাইনে বুলে থেকে জ্বলছে দুটো শক্তিশালী ফ্লাডলাইট। সেই আলোয় ছয় ফুট ব্যাস পর্যন্ত জায়গা আলোকিত হয়ে আছে, কিন্তু পরিষ্কার ভাবে নয়, আবছা। গাঢ় কালো ধোঁয়ার জন্যে এত আলোতেও বাধা পাচ্ছে দৃষ্টি।

আঙুল তুলে শীথিং কোণায় দেখাল রানাকে গ্যাকো। সাদা ফেনা এক্সটিংগুইশার থেকে তীব্র বেগে বেরিয়ে গিয়েই শীথিং ইনসুলেশনের গায়ে জমাট বেঁধে যাচ্ছে। কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিক্ষেপ করেই পিছিয়ে আসছে এক্সটিংগুইশারধারীরা, তাদের পেছনে অপেক্ষমাণ লোকগুলো এসিয়ে যাচ্ছে। নিদ্রুটে যন্ত্রপাতির সাহায্যে শীথিং ছিঁড়ে তুলে আনার চেষ্টা চালাচ্ছে। ইনসুলেশনের টুকরা ছিঁড়ে উঠে আসার সঙ্গে সঙ্গে দল করে আবার আগুন জ্বলে উঠছে ওগুলোতে। শেখন থেকে কিছুমাত্র গতিতে এক্সটিংগুইশার চালিয়ে মূহুর্তে এই আগুন নিভিয়ে নিজে ফায়ার-ফাইটারবা। তারপর আবার সামনে বাড়তে শীথিং হেঁড়ার দাপিত ঘাসের, তার। বাকি বাক একই ভাবে চলছে এই প্রক্রিয়া।

ঠিকই বললেন কমান্ডার রাইকভ, ডাবল রানা, কাজটা মোটেও সহজ নয়। চার ঘণ্টার মধ্যে আগুন নেভানোর কাজ শেষ হলে নিজেদের অগ্ন্যবানই মনে

করতে হবে। কিন্তু চার ঘণ্টা পরে লেনিনস্থানের ভেতরের বাতাসের কি অবস্থা হবে, একবার ভেবেই চিন্তাটা মাথা থেকে দূর করে দিল সে।

গ্যাকো আর রানাকে মই বেয়ে নামতে দেখল প্রথমে ওসিপ্ত। ওদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। কতগুলো পাইপ কডেনসার আর অসংখ্য ধাতব যন্ত্রপাতির মাঝের ছোট্ট পরিসর। এই পরিসরে পা ফেলে ফেলে কোনমতে এগিয়ে যাওয়ার যে ব্যবস্থা, তাই এবার পথ।

পেঁচানো কিছু পাইপ আর কডেনসারের মাঝে একটি খোলামত জায়গায় ঢিৎ হয়ে পড়ে আছে রিনিঙ্কি। টর্চের আলোতে দেখল রানা, রিনিঙ্কির গলনের তলায় চোখের মণি কপালের দিকে উঠে গেছে, চোখের নিচের দিকের সাদা অংশ দেখা যাচ্ছে। ওর গলনের সঙ্গে প্রায় ঠেকিয়ে নিল রানা নিজের মাস্ক।

'পা ভেঙেছে?' চোঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

কোনমতে মাথা নাড়িয়ে সায় দিল রিনিঙ্কি।

'বা পা?'

একই ভাবে জবাব দিল রিনিঙ্কি। তারপর অতি কষ্টে 'বাকা' হয়ে হাত বাড়িয়ে কোথায় ভেঙেছে দেখাল। মেডিক্যাল কিট খুলে কাঁচি বার করল রানা। রিনিঙ্কির ডান বাহুর কাছে পোশাকের খানিকটা কেটে সরিয়ে ফেলল। দ্রুত হাতে সিরিঙ্ক আর ও খের শিশি বের করে ইন্জেকশন দিল ওর বাহুর খোলা অংশে। দুই মিনিটেই ঘুমিয়ে পড়ল রিনিঙ্কি।

অজ্ঞান রিনিঙ্কিকে মই বেয়ে ওপরে তুলে আনতে সাহায্য করল দু'জন ফায়ার-ফাইটার। তারপর রানা আর গ্যাকো ধরাধরি করে রিস্যাকটর রুমের ওপর নিয়ে প্যাসেজ পার করে তাকে নিয়ে চলল। টের পেল রানা, তার শ্বাস-প্রশ্বাস অনিয়মিত হয়ে গেছে। পা কাঁপতে শুরু করেছে। যামে ভিজে গেছে সারা শরীর।

কন্ট্রোল রুম পৌঁছেই টেনে মাস্ক খুলে ফেলল রানা। অস্বস্তিকর ভাবে হাঁচতে-কাশতে লাগল। চোখের পানি দর দর করে নামছে গাল বেয়ে। মাত্র কয়েক মিনিট আগে এখান থেকে বেরিয়েছে, ফিরে এসে এইটুকু সময়ই এখানকার আবহাওয়ার অস্বাভাবিক অবনতি টের পেল রানা।

'ধনাবাদ, ডাক্তার, কললেন রাইকড।' ওখানে কি অবস্থা?

'খারাপ, তবে অসহ্য নয়। একটানা দশ মিনিটের বেশি থাকা উচিত নয় ওখানে ফায়ার-ফাইটারদের।'

'ফায়ার-ফাইটাররা সংখ্যায় অনেক। ঠিক আছে, দশ মিনিটের বেশি থাকতে বারণ করব, ওদের যে-কোন দলকে।'

ধরাধরি করে দু'জন নাবিক সিক-বেডে নিয়ে গেল রিনিঙ্কিকে। অপেক্ষাকৃত ভাল বাতাস গ্রহণের জন্যে যেন কয়েক ঘাবার নির্দেশ দিলেন কমান্ডার গ্যাকোকে কিন্তু বেশ পথিক সিক-বেডে রানার সঙ্গে তাত থাকাই স্থির হলো।

রানার ব্যাডেজ-বাধা হাতের দিকে তাকিয়ে মৃত্যু শেল করল গ্যাকো, 'একটা হাতের চেয়ে তিনটে হাত অনেক বেশি কাজে আসবে, রানা। আগাতত আমার হাত দুটোকে নিজের ভাবতে কোন অসুবিধে হবে না নিশ্চয়?'

গ্যাকোর দিকে চেয়ে হাসল রানা।

নিজের কটে আখশোয়া হয়ে বিড় বিড় করছে আর কমান্ডারের গুপ্তি উদ্ধার করছে ডাক্তার রুডেনকো। তার মত সুস্থ মানুষকে কটে গুয়ে অসুস্থ করে তোলায় জন্যে রাইকডের প্রতি আক্ষেপের অত্বে নেই তার। ক্যাপ্টেন কুমারভ যুমাচ্ছে।

রিনিঙ্কিকে পরীক্ষা-টোবিলে গুইয়ে দেয়া হয়েছে। রুডেনকোর দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল রানা। বলল, 'ডাক্তার, আর কটে গুয়ে থাকার দরকার নেই। একটু হাত লাগালে ভাল হয়। লোকটা স্থিতি করতে গিয়ে আছাড় খেয়ে পা ভেঙেছে।'

'বেঁচে থাকো, বাবা, বেঁচে থাকো,' রিনিঙ্কিকে আশীর্বাদ করতে করতে কটে থেকে নেমে এল রুডেনকো।

ঘটটা আশঙ্কা করা হয়েছে ততটা খারাপ নয় রিনিঙ্কির পায়ের অবস্থা। কম্পাউন্ড নয়, ক্লিন ফ্র্যাকচার, টিবিয়া।

কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় রাজল টেলিফোন। জোঁ মেরে রিসিভার তুলে নিল গ্যাকো, শব্দিতভাবে চাইল ক্যাপ্টেন কুমারভের দিকে। ডীক্স জী-১-১ শব্দে তার ঘুম ভাঙেনি দেখে নিশ্চিত হলো। রিসিভার কানে ঠেকিয়ে কিছু তুলল গ্যাকো, তারপর ধীরে ধীরে আবার নামিয়ে রাখল জাডলে।

'কন্ট্রোল রুম,' কঠিন হয়ে উঠেছে গ্যাকোর চেহারা। দুঃসংবাদ, অনুমান করল রানা। 'কমান্ডার আপনাকে জানাতে বলেছেন, ডাক্তার রানা, যমজ ভাইদের একজন, বুনিয়েন, মারা গেছে। দুই মিনিট আগে।' হতভাগ্যভাবে এমিক-ওমিক মাথা নাড়াল গ্যাকো, 'আরেকটা মৃত্যু।'

'না,' প্রথম কঠিন গলায় বলল রানা, 'আরেকটা খুন।' ঘড়ি দেখল, সকাল সাড়ে ছটা।

নয়

বরফ শীতল এক কক্ষিনে পরিণত হয়েছে লেনিনগাদ। সকাল সাড়ে ছয়টায়, আঙন লাগার সাড়ে চার ঘণ্টা পর লেনিনস্থানে বাড়ল আরেকটা লাশ। কন্ট্রোল রুমে বসা কিংবা মেঝেতে গুয়ে থাকা লোকগুলোর লাল-চোখের দিকে তাকিয়ে অনুমান করল রানা, আর বড়জোর এক কি দুই ঘণ্টা বাদে বুনিয়েনের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে লেনিনস্থানের আরও অনেকে। বেলা দশটা নাগাদ সত্যি সত্যিই কক্ষিনে পরিণত হবে লেনিনগাদ। স্ট্রীলের কক্ষিন, যার ভেতরে একটা জীকণ্ড লোকও অবশিষ্ট থাকবে না।

জাহাজ হিসেবে এখন মৃত্যু ঘটেছে লেনিনস্থানের। বিশাল এঞ্জিন চলার কম্পন, জেনারেটরের চাশা গুম-গুম, এয়ার-কন্ডিশনিং ইউনিটের গম্ভীর গুঞ্জন, ইলেকট্রিক পাখার বাতাস কাটার শো-শো আওয়াজ, বাবুর্চিখানায় ধাতব পাতা ঠোকাঠুকির শব্দ, মানুষের কথা বলা, নড়াচড়া, সব স্তব্ধ। এসব ছিল যেন সারমেরিনের রূপান্তরের শব্দ, যেহেতু সেখানে লেনিনস্থানের ফুস ফুস আক্রান্ত হয়েছে যেন। মানুষরূপী রক্তক্ষণিকার হাসফাস করছে বাতাসের অভাবে।

এখনও কয়েকদিন চলার মত অক্সিজেন আছে লেনিনখানার বিশাল গ্যাস ট্যাংকগুলোতে, অল্প ব্যবহার করা যাচ্ছে না। ব্রিটিশ বিল্ট-ইন ব্রীদিং সিস্টেমে তৈরি কিছু ব্রীদিং সেট আছে জাহাজে, ট্যাংক থেকে সরাসরি অক্সিজেনটোজেন মিকচার টেনে নিতে সক্ষম ওগুলো, কিন্তু মাত্র কয়েকটা এই যন্ত্র দিয়ে কি কাজ হবে। তবু এগুলোর ওপরই দরসা রাখতে হচ্ছে। পালা করে প্রতিবারে একটানা দুই মিনিট শ্বাস নিতে পারছে লেনিনখানার লোকেরা।

মারোমধ্যে ট্যাংক থেকে সরাসরি অক্সিজেন চুইয়ে বের করা হচ্ছে, সামান্য ক্ষণের জন্যে। এতে লাভ তো হচ্ছেই না, বরং অ্যানিমোসফেরিক প্রেশার বেড়ে গিয়ে শ্বাস নেয়া আরও কষ্টকর হয়ে উঠছে। শক্তির অভাবে এয়ার সারকুলেটিং সিস্টেম চালু করা যাচ্ছে না, ফলে বিপুল অক্সিজেন অতিরিক্ত বিশাল বাতাসের কারণে কোন কাজেই লাগতে পারছে না। ওদিকে ধোয়ার পরিমাণ আরও বেড়েছে। এঞ্জিন রুমের আশুন নিজে গেছে, কিন্তু লাল হয়ে ওঠা স্মোলডারিং ইনসুলেশন অর্থাৎ ফুলপ্র অবস্থায় আরও বেশি ধোয়া ছড়াচ্ছে।

কিন্তু লেনিনখানার ভেতরে সব চেয়ে বড় শত্রু হলো কার্বন-মনোক্সাইড গ্যাস। ভয়াবহ তীব্র খাবা মেলে ক্রমেই আরও বড় হচ্ছে শিকারের টুটি টিপে ধরার জন্যে।

এর ওপর আছে ঠাণ্ডা। দমস্ত স্টীম পাইপ বন্ধ, হীটার জ্বলছে না। বাইরের সাবজেক্টিং টেম্পারেচার এখন ভেতরেও কামড় বসানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। ইতিমধ্যেই হি-হি কাপুনি উঠে গেছে লেনিনখানার ভেতরের অধিবাসীদের। সেটিগেড স্কেলে জিরোর দুই ডিগ্রী নিচে নেমে গেছে ভেতরের উষ্ণতা।

এত কিছু সত্ত্বেও কিন্তু এঞ্জিন রুমে কাজ বন্ধ হচ্ছে না। আহত ক'জন ছাড়া অন্য সবাই পালা করে গিয়ে গিয়ে কাজ করছে এঞ্জিন রুমে, সাহায্য করছে ফায়ার-ফাইটারদের। ডাক্তার জ্যাকভের জ্ঞান ফিরেছে। জোর করেও আটকানো যাচ্ছে না তাকে। এঞ্জিন রুমে কাজ করতে গিয়ে প্রতিবারে প্রতি প্রপেরই কেউ না ফেট জ্ঞান হারানো, কিংবা অন্য কোন অসুবিধের পড়ছে। লেনিনখানার সবচেয়ে উন্নতমানের ব্রীদিং অ্যাপারেটাস ক্রোজড-সার্কিট অ্যাপারেটাস পরে নিয়ে বার বার এঞ্জিন রুমে আহতদের সেবা করতে যাচ্ছে সে। অল্পত পনেরো বার যাওয়া আসা করেছে জ্যাকভ ইতিমধ্যেই। খুবই কাজের জিনিস এই ক্রোজড-সার্কিট অ্যাপারেটাস। তাই এত বার এঞ্জিন রুমে যাওয়া আসা ছুটোছুটি বরোও বাড়ানো হয়েছে সে।

পৌনে সাতটা নাগাদ কন্ট্রোল সেক্টরে এসে ঢুকল চীফ টর্পেডোম্যান সুমিপভ। মেঝেতে রাইকভ আর রুস্তভের পাশে বসে থেকে দরজা খুলে সুমিপভকে ঢুকতে দেখল রানা, ধোয়ার জন্যে আবছাভাবে।

হামাগুড়ি দিয়ে রাইকভের কাছে এসে পৌঁছল সুমিপভ। মুখে কোন ধরনের শ্বাস নেই, শীতের কাপড়ের খবর করে।

'কিছু একটা করতে হবে আমাদের, ক্যাপ্টেন,' গলা দিয়ে ভোতা আওয়াজ বেরোল সুমিপভের। সিঁহি কাগজ নিয়ে ঘরে নিয়েছে যেন কেউ তার কষ্টনাশী। স্মৃতিজ্ঞান হারিয়েছে। অবস্থা খুবই খারাপ।

'কন্যাবাদ, চীফ,' সুমিপভের মতই রাইকভের মুখেও শ্বাস নেই। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে তারও। গলা দিয়ে কোলা ব্যাডের আওয়াজ বেরোচ্ছে। 'কিছু একটা শীঘ্রিই করব আমরা।'

'অক্সিজেন,' বলল রানা। 'অক্সিজেন ছড়াতে বলুন না।'

'অক্সিজেন?' এদিক-ওদিক সাধা নাড়লেন রাইকভ, 'না। এমনতেই অ্যানিমোসফেরিক প্রেশার অনেক বেশি হয়ে গেছে।'

'প্রেশারে মারা যাবে না কেউ,' গলা, বুক, চোখ জ্বলছে রানার। গলার ভেতরটা বসবসে ওকনো মনে হচ্ছে। নিজের কানেই নিজের স্বর শুভ্র শোনাচ্ছে। 'কিন্তু কার্বন-মনোক্সাইড আরও বেড়ে গেলে মারা যাব সবাই।'

কি যেন ভাবলেন রাইকভ। মনে মনে হিসেব করে নিলেন কিছু। তারপর মাইক্রোফোনে আদেশ দিলেন, 'অক্সিজেন। অক্সিজেন বাড়িয়ে দাও।'

কন্ট্রোল রুমে অক্সিজেন ঢোকাব হিস হিস শব্দ উঠল। কানের ওপর প্রচণ্ড চাপ অনুভব করল রানা, ক্রমেই বাড়ছে চাপ। কিন্তু শ্বাসপ্রক্রিয়ার কোন উন্নতি টের পেল না।

যেহাen দিয়ে এসেছিল, সেদিক দিয়েই বেরিয়ে গেল সুমিপভ। ফিরে এল আবার কয়েক মিনিট পর। খবর নিয়ে এসেছে, এবারে জ্ঞান হারিয়েছে আরও পাঁচজন।

সুমিপভের মতই প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে তার সঙ্গে গেল রানা। অবশিষ্ট যে কয়টা ক্রোজড-সার্কিট সেট রয়েছে ওগুলো পালা করে এক মিনিট ধরল প্রতিটি অজ্ঞান লোকের নাকে মুখে। হাঁশ ফিফল ওদের ঠিকই, কিন্তু সেট সরিয়ে নেবার কয়েক মিনিট পরই আবার জ্ঞান হারাল। এভাবে কিছু হবে না। অন্য কোন উপায় বের করা যায় কিনা পরামর্শের জন্যে রাইকভের কাছে ফিরে এল ওরা আবার।

কন্ট্রোল সেক্টরের মেঝেতে চিত হয়ে পড়ে থাকা লোকগুলোর মুখের দিকে তাকিয়ে আতকে উঠল রানা। বেতনী হয়ে এসেছে মুখের রঙ। কার্বন-মনোক্সাইড বিক্রিয়ার পরিষ্কার লক্ষণ। রাইকভকে জিজ্ঞেস করে জানল রানা, এখনও এঞ্জিন রুম থেকে ফেরেনি ডাক্তার জ্যাকভ।

প্রাচীর টেবিলের পায়ায় হেলান দিয়ে বসে আছেন রাইকভ। তাঁর পাশে শুয়ে আছে রুস্তভ। রানাও শুয়ে পড়ল রুস্তভের পাশে। রান হাসলেন কমান্ডার।

'কেমন আছে ওরা, ডাক্তার?' রানাকে জিজ্ঞেস করলেন কমান্ডার। ফ্লাসকেসে মদু বস্ত্রর।

'আর এক ঘণ্টাও টিকবে না,' জানাল রানা। 'কার্বন-মনোক্সাইড বিষে মরার খবর পাবেন শীঘ্রি।'

'এত তাড়াতাড়ি?' লাল, ফোলা, পানি গড়ানো চোখে রানার দিকে তাকালেন রাইকভ।

'এত তাড়াতাড়ি! কার্বন-মনোক্সাইডের বিক্রিয়ার মারা যেতে দেরি করে না লোকে। এক ঘণ্টার মধ্যে কমপক্ষে পাঁচজন, পরের এক ঘণ্টায় আরও অন্তত পঞ্চাশ জন লোক মারা যাবে।'

'নাহ, আর ঠেকানো যায় না,' বিভ্র বিভ্র করে বললেন রাইকভ। রুস্তভকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমাদের প্রশাশন অফিসার কোথায়?'

‘জেকে আনিছি,’ নিজেই টেনে তুলল রক্তত। মৃত্যুশয্যা থেকে প্রিয়জনদের শেষ বক্তব্য শোনানোর জন্যে যেন প্রাণপণে উঠল কোন বুড়ো মানুষ।

ঠিক এই সময় এঞ্জিন রুমের দিকে যাবার দরজাটা খটকা মেরে খুলে গেল। সারা গায়ে তেল কালিতে মাখামাখি, সাংঘাতিক ক্রান্ত একটা লোক ঘরে প্রবেশ করল। তার পেছনে একই অবস্থায় ঢুকল আরও কয়েকজন।

সামনের লোকটাকে জিজ্ঞেস করলেন রাইকড, ‘ওসিপড?’

‘ই্যা, কমরেড,’ কোন মতে টেনে মাথটা বুনে নিল নেভিগেটিং অফিসার লেকটেন্যান্ট ওসিপড। ধোয়া নাকে যাওয়ায় সঙ্গে সঙ্গেই কাশতে শুরু করল। দুলে উঠল দেহ।

ওসিপডকে সামলে নেবার সময় দিলেন কমান্ডার। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, ‘ওদিককার অবস্থা কি?’

‘ধোয়া বেরোনো বন্ধ করে ফেলেছি, স্যার,’ দুই গাল থেকে চোখের পানি মেশানো ঘাম মুছল ওসিপড। ধপ করে বসে পড়ল মেঝেতে। ‘শীঘ্র পুরোপুরি খুলে নেয়া হয়েছে।’

‘বাকি কাজ সারতে কতক্ষণ লাগবে?’

‘মিনিট দশেকের কাজ। কিন্তু যা অবস্থা, এক ঘণ্টা লাগলেও অবার হব না।’

‘খ্যাংক ইউ, ওসিপড,’ দরজার দিকে তাকিয়ে ঘান হাসলেন রাইকড। ধোয়ার ভেতর দিয়ে এগিয়ে আসছে রক্তত আর মোমিনড।

‘এই যে মোমিনড,’ প্রাণালশন অফিসারকে দেখেই বললেন রাইকড। ‘টার্বো জেনারেটর চালু করতে কত সময় লাগবে?’

‘ঠিক বলতে পারছি না, স্যার,’ লাল চোখ মোমিনডের। কাশল। বুক চেপে ধরে খাস নিল জোরে জোরে। মুখ বিকৃত। ‘তবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চালাতে চেষ্টা করব।’

টলতে টলতে চলে গেল মোমিনড। জোর করে নিজেই খাড়া করলেন রাইকড। ব্রডকাস্ট পাওয়ার সাপ্রাই করার আদেশ দিলেন রক্ততকে। হুক থেকে মাইক্রোফোন খুলে আনলেন। আশ্চর্য শব্দ, পরিষ্কার, জোরাল গলায় কথা বলে উঠলেন। বিগত অক্সিজেনের জন্যে হাঁসফাঁস করছে তাঁর ফুসফুস, কিন্তু কোন আজব কৌশলে সামলে নিয়েছেন যেন নিজেই।

‘কমান্ডার বলছি,’ বলে চললেন রাইকড, ‘এঞ্জিন রুমের আশুন নেভানো হয়েছে। পাওয়ার প্রাক্ট চালু করার চেষ্টা চলছে। সমস্ত ওয়াটার-টাইট দরজা খুলে দাও। পরবর্তী আদেশ না দেয়া পর্যন্ত খুলেই রাখবে। তোমাদের সবার কাজের জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ।’ মাইক্রোফোনটা আবার আগের জরিগার রেখে রক্ততের দিকে ফিরলেন, ‘এখনও বিপদ কাটেনি। রিঅ্যাক্টর চালু করার মত যথেষ্ট শক্তি ব্যাটারিতে আছে কিনা কে জানে।’

‘শক্তি থাকলে কতক্ষণ লাগবে চালু করতে?’ জানতে চাইল রানা। ‘টার্বো জেনারেটর আর এয়ারপিউরফাইং ইউইগমেণ্টের কথা বলছি আমি। এই বিঘ্নিত বাতাস পরিষ্কার করতেই বা কতক্ষণ লাগবে মোশনের?’

‘আশা করছি আধ ঘণ্টার মধ্যেই হয়ে যাবে।’

‘আসলে দেড় ঘণ্টা,’ কর্কশ গম্ভীরে রানার গলা। ‘এঞ্জিন রুমের আবর্জনা পরিষ্কার করার আগে জেনারেটর চালু করা যাচ্ছে না। ওসিপড বলেছে, ওগুলো পরিষ্কার করতে এক ঘণ্টা লাগবে। সবকিছু ঠিকঠাক করে রাখবে ওদিকে মোমিনড। এঞ্জিন রুম পরিষ্কার হলেই কাজ শুরু করবে। আধ ঘণ্টা লাগবে জেনারেটর চালু করে, অন্যান্য যন্ত্রপাতি চালু করে বাতাস ঠিক করতে। মাই ডিয়ার, কমান্ডার,’ এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল রানা। ‘বিপদ তো কাটেনি, বন্ধ শুরু হয়েছে। আগামী দেড় ঘণ্টার লেনিনগ্রাদের প্রতি চারজন মানুষের একজনকে হারাতে হবে আমাদের।’

হাসলেন রাইকড। গলায় ইচ্ছাকৃত রহস্য ঢেলে বললেন, ‘মনোব্রাইড পদজনিও কেউ মারা যাবে না, ডাক্তার। আর পনেরো মিনিট পরেই ফুসফুসে পরিষ্কার বাতাস টানব আমরা।’

রক্তত আর রানা দুজনে চোখাচোখি করল। দুজনেরই চোখে বিষমতা ছায়া ফেলেছে। কিন্তু কার্বন-মনোব্রাইড গ্যাসের বিকস্মিত্য এর আগে মানুষের পাগল হয়ে যাবার কথা, কই, কখনও শোনেনি তো দুজনের কেউই।

ওদের গোপন চোখাচোখি নজর এড়াল না কমান্ডারের। জোরে হেসে উঠতে গিয়েই কেশে ফেললেন। অনেকক্ষণ ধরে চলল তাঁর জোর খক খক কাশি। চোখ দিয়ে অনবরত পানি গড়াতে লাগল। দীর্ঘক্ষণ পরে অনেক কষ্টে কাশি থামালেন কমান্ডার।

‘গিয়ার্হিলাম আরেকটু হলেই,’ গলা দিয়ে পরিষ্কার আওয়াজ বেরোচ্ছে না আর রাইকডের। ‘না, না, চেহারাকে অমন করে বিকৃত করবেন না...ভয় পেয়ে যাব তাহলে...ই্যা, আস্থা বলুন তো কেন ওয়াটার-টাইট সমস্ত দরজা খুলে দেবার আদেশ দিয়েছি?’

চুপ করে বইল রানা। জানে না সে।

রানার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রক্ততের দিকে তাকালেন কমান্ডার, ‘ইউরি?’

এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল রক্তত। জানে না সে-ও।

‘এঞ্জিন রুমকে ডাকো,’ রক্ততকে বললেন রাইকড। ‘বলো, ডিজেল চালু করে দিক।’

‘ঠিক আছে, স্যার,’ শুধু গলায় বলল রক্তত। কিন্তু ডাকলো ছেড়ে নড়ল না।

‘লেকটেন্যান্ট ইউরি রক্তত বুঝতে পারছে না, তার ক্যাপ্টেন পাগল হয়ে গেছে কিনা,’ রক্ততের দিকে পেছন ফিরে বলে গেলেন রাইকড। ‘লেকটেন্যান্ট রক্তত এটা নিশ্চয় জানে না, রাফসের মত বাতাস আবহাওয়া করে ডিজেল এঞ্জিন, জাহাজের সামনের দিকে ট্যাকে থেকে বিগত বাতাস ছাড়ার আদেশ দিয়েছি আমি। ডিজেল এঞ্জিন রয়েছে জাহাজের পেছন দিকে। বাতাসে অক্সিজেন আছে, কিন্তু মানুষের বাস নেবার জন্যে সঠিক পরিমাণ নয়। বিঘ্নিত বাতাসে ডিজেল এঞ্জিনের কোন ক্ষতি হয় না, রিকমত চলতে চাইবে না অকশ। কিন্তু চলবে, বন্ধ হবে না। জাহাজের বিঘ্নিত বাতাস টেনে নেবে এঞ্জিন, ওদিকে সামনের দিক থেকে পরিষ্কার বাতাস ছাড়িয়ে পড়বে ধীরে ধীরে। লেকটেন্যান্ট বহুতো জ্ঞানতে চাইবে, আরও আগে কেন এই প্রক্রিয়া গ্রহণ করিনি আমি? জবাব হলো, বাতাসে অক্সিজেন বেড়ে

গেলেই দাড়ি দাড়ি করে আস্তন আরও বেশি জ্বলে উঠত। এখন আস্তন পুরোপুরি নিভিয়ে ফেলা হয়েছে, কাজেই অজ্ঞান ছাড়াই অসুবিধে নেই। ডিজেল-এঞ্জিন মাত্র কয়েক মিনিট চালালেই বিমুক্ত বাতাসের কবল থেকে মুক্তি পাব আমরা। আমি পাগল হয়ে যাইনি, আশা করি বুঝতে পেরেছে লেফটেন্যান্ট।

কোন জবাব নেই দেখে ঘুরে চাইলেন রাইকভ। কিন্তু রুস্তভ নেই। চলে গেছে আগের।

তিন মিনিট পেরিয়ে গেল। ডিজেল স্টার্ট দেবার শব্দ শুনে পেল রানা। বার কয়েক কেশে প্রতিবাদ জামিয়ে যেন নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও চালু হয়ে গেল এঞ্জিন। পরে জানা গেছে ডিজেল এঞ্জিনের আশপাশে কয়েক বোতল ইথার ছড়িয়ে নিয়েছিল এঞ্জিনিয়ার, তাই এত সহজে চালু হয়ে গিয়েছিল এটা।

মিনিট দু'য়েক অনিয়মিত ভাবে চলল এঞ্জিন, তারপর স্বাভাবিক হয়ে এল আওয়াজ। বিমুক্ত বাতাসকে পাওয়াই দিচ্ছে না। আশ্চর্য! দ্রুত সরে যেতে লাগল কন্ট্রোল রুমের ধোয়া। ধীরে ধীরে স্বচ্ছ হয়ে আসছে ঘর। জ্বলন্ত একটি মাত্র ল্যাম্পের আলোতেই পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এখন ঘরের সবকিছু।

আরও কয়েক মিনিট পরেই ঘটল যেন অলৌকিক ঘটনা। ধীরে ধীরে আরও পরিষ্কার আরও নিবৃত্ত শোনালা ডিজেল এঞ্জিনের শব্দ। সহজেই খাস নিতে পারছে এখন রানা, কন্ট্রোল রুমের প্রতিটি লোক। পেছনের খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেছে বিমুক্ত বাতাস, সামনের দরজা দিয়ে এসে তার জায়গা দখল করেছে বিতর্ক বাতাস। বাতাসে এখনও সামান্য কার্বন-মনোক্সাইড আছে, কিন্তু সেটুকুকে এখন কেয়ার করছে না কেউ।

নিম্নে যাদুকরের হায়েন কাঠি ছুইয়ে দেখা হয়েছে যেন জাহাজের প্রতিটি লোকের শরীরে। মৃত্যুপথ যাত্রীরা নড়েচড়ে উঠে চোখ মেলল। উঠে বসল কেউ কেউ। চোখে অবিশ্বাস। কিন্তু স্বাসকষ্ট নেই, অবিশ্বাস্য হলেও অবিশ্বাস করার উপায় নেই কারণ। জোরে জোরে শ্বাস টানছে সবাই। বুক ভরে টেনে নিচ্ছে মিস্তি পরিষ্কার বাতাস। বাতাসের এই স্বাদ এর আগে যেন পায়নি ওরা।

এয়ার-প্রেশার রেকর্ডিং গজের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন কমান্ডার রাইকভ। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক পনেরো পাউন্ড লেখা ঘরে এসে গেল কাঁটা, কমেতে লাগল আরও। আরও উচ্চ চাপে কম্প্রেশন এয়ার ছাড়ার আদেশ দিলেন কমান্ডার। ধীরে ধীরে আবার উঠতে লাগল কাঁটা। আবার স্বাভাবিক অবস্থায় এসে যেতেই ডিজেল বন্ধ করার আদেশ দিলেন রাইকভ।

'কমান্ডার রাইকভ,' পাশে এসে দাঁড়িয়েছে রানা। 'অ্যাডমিরাল হা.ত যতখানি সুপারিশের দরকার, তার চেয়েও বেশি করব আমি আপনার জন্যে। এবং আমার বিশ্বাস আমি বিদেশী বনেই বিশেষ গুরুত্ব দেবে মহোদয় আমার কথায়।'

'ধন্যবাদ,' হাসলেন রাইকভ। 'আসলে আমাদের কপাল খুবই ভাল।'

সত্যিই কপাল ভাল, নামে মনে স্বাক্ষর করল রানা। বিট রাইকভের অধানে চলবে যে সবমেমিন, অল্প তাতে যারা চড়বে তাদের কপাল ভাল না হয়ে উপায় নেই।

মোটর আর পাম্প চলার শব্দ হলো। নিউক্লিয়ার প্লাস্ট জ্বালানী করার চেষ্টা

চালাচ্ছে মোমিনভ।

সকাল ঠিক আটটার ফোনে সংবাদ দিল মোমিনভ, টারবাইন ব্লড ঘোরানো যাবে। আবার চলার উপযোগী হচ্ছে লেনিনগ্রাদ।

একটানা তিন ঘণ্টা ধীর গতিতে এগিয়ে চলল লেনিনগ্রাদ। পূর্বা দমে চলছে এয়ার-কন্ডিশনিং ইউনিট। ভেতরের বাতাস পুরোপুরি স্বাভাবিক হবার আগে এভাবেই চলার নির্দেশ দিয়েছেন রাইকভ।

বাইরের খোলা বাতাসের জন্যে আকুলি-বিকুলি করছে সবাই। অবস্থাটা বুঝেছেন কমান্ডার। কাজেই আইস মেশিনে পলিনাইয়া খোজার নির্দেশ বহাল রেখেছেন তিনি।

বিকেল চারটে নাগাদ স্বকল্পে পরিষ্কার হয়ে গেল মোশবারি স্পেস। তদন্ত করতে গেলেন কমান্ডার রাইকভ। টারবাইনের বিশেষ জায়গায় শীথিং ইনসুলেশন নেই। এঞ্জিন ধীরে চালানো ছাড়া উপায় নেই এখন। ডকে ফিরে না গেলে আর শীথিং লাগানো সম্ভব নয়।

সারাটা দিন একটানা ঘুমিয়ে কটাল রানা।

সঙ্গে সাতটার একটু পরে ঘুম থেকে উঠল সে। শেড করল, স্নান সেরে কাপড়-চোপড় পরে নিল। ওয়ার্ডরুমে এসে সাপার সেরে নিল ধীরে সুষ্টে।

নয়টার একটু আগে কন্ট্রোল রুমে এসে ঢুকল রানা। ওখানেই দেখা পেল রুস্তভের। এগিয়ে গিয়ে গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কমান্ডার কোথায়?'

'তার কেবিনে।'

'কমান্ডার আর তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই আমি। গোপনে।'

চোখ তুলে রানার দিকে তাকাল রুস্তভ। মাথা বাকাল, তারপর নিজের দায়িত্ব নেভিগেটরের ওপর দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

কেবিনের দরজায় নক করল রুস্তভ। ভেতর থেকে ডাকলেন কমান্ডার। রানাকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল রুস্তভ। প্রথমেই আজ্যামাত কিরিয়াকে পরীক্ষা করল রানা। জ্ঞান ফেরেনি বটে, কিন্তু শ্বাস-প্রশ্বাস আর পালস দেখে টের পেল, দ্রুত উন্নতি হচ্ছে ওর অবস্থার। তিন-চার দিনের মধ্যেই যদি উঠে দাঁড়ায়, অবাক হবে না রানা। হঠাৎ সোজা রাইকভের দিকে ফিরে কোনরকম ভূমিকা না কারাই বলল সে, 'কে খুনী, জানি আমি এখন। কিন্তু আমার হাতে কোন প্রমাণ নেই। প্রমাণ সংগ্রহ করতে চাই। সে ব্যাপারে সাহায্য করতে হবে আপনাদের।'

গত তিরিশ ঘণ্টা ধরে বহুবার নানান ব্যাপারে চমকিত হয়েছেন রাইকভ। এবারে আর চমকালেন না। চিন্তিত দৃষ্টিতে একবার রুস্তভের দিকে তাকালেন। নটে দেখছিলেন, সেটা ভাঁজ করে টেবিলে রেখে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। ওর কণ্ঠে বললেন, 'নিশ্চয়ই সাহায্য করব, মেজর রানা। প্রচণ্ড কৌতূহল হচ্ছে, এর আগে কোন খুনীর সাক্ষ্য পাইনি তো, শান্ত পলায় কথা বললেন কমান্ডার, কিন্তু ধূসর চোখ দুটো বরফের মত ঠাণ্ডা, কঠিন। 'অজ্ঞান লোকের খুনীকে স্বত্বাধীন দেখানো এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতাই হবে মনে হয়।'

'আমাদের কপাল ভাল। মাল আটকানকেই খুন করতে চাপিয়েছে সে,' বলল

রানা। 'আজ সকালে শ' ছাড়িয়ে যেত, শুধু আপনার জ্বালায় পাবল না বোকারা।
 রাইকত আর রক্তভের বিশিষ্ট ভাবটা নজর এড়ান না রানার।
 'কি বলতে চান?' তুচ্ছ কুচকে জিজ্ঞেস করলেন রাইকত।
 'আমাদের বন্ধুটি শুধু পিঙ্কলই নয়, মাচের বাত্মও সাথে রাখে,' বলল রানা।
 'গত রাতে এঞ্জিন রুমে ওই মাচ নিয়ে রাস্তা ছিল সে।'
 'বলতে চাইছ, কেউ একজন জাহাজে আত্মন লাগাতে চেয়েছিল?' অবিশ্বাস
 ভরা চোখে রানার দিকে তাকাল রক্তভ। 'বিশ্বাস করতে পারছি না।'
 'আমি পারছি,' বললেন রাইকত। 'খুশী সম্পর্কে মেজর রানা যা-ই বলবেন,
 অবিশ্বাস করব না আমি। কারণ, আমার ধারণা এই খুশী একজন বন্ধ-পাগল।
 অন্যদের ধ্বংস করার জন্যে নিজের জীবনের পরোয়া সে করে না।'
 'পাগল নয় সে,' বলল রানা। 'শুধু হিসেবে একটু গোলমাল করে ফেলেছিল।'
 'যাই হোক, এখনি তাকে ধরতে না পারলে আরও কি করে বসবে কেউ
 বলতে পারে না।'
 মাথা ঝাকাল রানা। 'কি কি করতে হবে বিস্তারিত বলল রাইকত আর
 রক্তভকে।

রাত দশটা। লেনিনঘাদের ওয়ার্ড রুমে এসে জমায়েত হয়েছে ওরা: গ্যাকো,
 পিনি, ক্যাপ্টেন কুমারভ, ডা. জ্যাকভ, নিকোলাই, অভয়, মিকো, কসমোপভ,
 রুডিন এবং বুয়েল। ওয়ার্ড রুমের টেবিল ঘিরে বসেছে সবাই, গ্যাকো আর পিনি
 ছাড়া। গ্যাকো দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে, ঘরের এক কোণে একটা চেয়ারে
 বসে আছে পিনি। তার হাতে একটা পুরানো খবরের কাগজ।

কমান্ডার রাইকতের পেছন পেছন ওয়ার্ড রুমে এসে ঢুকল রানা। রাইকতকে
 দেখে ঘরের অনেকেই উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল, কিন্তু হাত তুলে নিষেধ করলেন
 কমান্ডার।

সবাই নীরব রইল, ডাক্তার জ্যাকভ ছাড়া। খুশি খুশি গলায় কথা বলল সে,
 'ওফ ইভনিং, ক্যাপ্টেন।' আশা করি ভালই আছেন। তা, এত রাতে এভাবে মীটিং
 ডাকার কারণটা জানতে পারি?

রাইকত কোন জবাব দিলেন না।
 কেশ গলা পরিষ্কার করল রানা। তারপর বলল, 'মীটিং আমি ডেকেছি,
 ডাক্তার, ক্যাপ্টেন নন।'

'আপনি?' চোঁট কামড়ান ডাক্তার। 'আপনি কেন?'

'তার আগে একটা কথা জানাচ্ছি আপনাদের, আমি ডাক্তার নই। হিনামও না
 কোনকালে। আমি একজন কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট। পদদলী মেজর।
 বাহাদুরদলী। না হোক অনুরোধে এসেছি এখানে।'

প্রতিক্রিয়া চেয়েছিল রানা, পেল ঠিকই। নিঃশব্দে বসে রইল সবাই। সলা
 ডাক্তার তোলা মাছের রত হা হয়ে গেছে বুঝ।

সবার আগে, সামনে নিল জ্যাকভ। 'কাউন্টার এলপিওনাজ।' শব্দই দেবার রত
 হচ্ছে ছিল, আজ সে আশা পূরণ হলো দেখছি! তা কেন, কেন আমাদের সবাইকে

এখানে ডেকেছেন, ডাক্তার, খুশি, মেজর মাসুদ রানা?'

'তেনম কিছু না। সামান্য খুনখারাবির একটা ব্যাপার ছিল, এই আর কি।'
 'খুন!' জাহাজে ওঠার পর এই প্রথম কথা বলল ক্যাপ্টেন কুমারভ। এখনও
 দুর্বল, কথা বলার ধরনে সহজেই অনুমান করে নেয়া যায়। 'খুন?'

'নভেলির কাছাকাছি বরফের তলায় দু'জন লোক শুয়ে আছে, একজনকে গুলি
 করা হয়েছে, অন্যজনকে ছুরি মারা হয়েছে। তৃতীয় আরেকজনকেও গুলি করা
 হয়েছিলো, কিন্তু কপাল গুণে বেঁচে গিয়ে এখন এই জাহাজেই আছেন...'

'কে, কে বেঁচে গেছে?' রানার কথার মাঝেই দাঁড়িয়ে উঠে জিজ্ঞেস করল
 ডাক্তার জ্যাকভ।

'আসছি সে কথায়,' ধীরে ধীরে বলল রানা। 'তা আপনারা কি বলেন? গুলি
 করে কিংবা ছুরি মেরে মানুষ হত্যাকে খুন বলে না?'

টেবিলের ধার খামচে ধরল জ্যাকভ। 'কাপতে কাপতে বসে পড়ল আবার
 চেয়ারে। অন্যদের চেহারা দেখেই অনুমান করে নিল রানা, বসে আছে বলে মনে
 মনে খুশিই তারা, নইলে ধাপস করে বসতে হত চেয়ারে।

'সত্যি বলতে কি,' নাটকীয়তার খাতির নাটকীয়ভাবেই বলল রানা, 'এই ঘরে
 আপনাদের মাঝেই বসে রয়েছে সেই খুশী।'

পিনপতন নীরবতা নামল ওয়ার্ড রুমে।

দশ

'প্রথমেই,' বক্তৃতার চঙে শুরু করল রানা, 'ক্যামেরা অপটিকস সম্পর্কে কিছু বলে
 নিই আপনাদের। কারণ কারণ হয়তো জানা আছে বিষয়টা, তবু শুনুন। জিজ্ঞেস
 করতে পারেন, ক্যামেরার সঙ্গে মানুষ খুনের সম্পর্ক কি? আছে, আছে। এই
 বিশেষ জিনিসটাই নভেলির এতগুলো লোকের প্রাণনাশের কারণ।'

সবার ওপর একবার নজর বুলাল রানা।

'কতখানি স্পষ্ট হবে ছবি, সেটা নির্ভর করে ক্যামেরার লেন্সের ফোকাল
 লেন্থ, অর্থাৎ ফিল্ম থেকে লেন্সের দূরত্বের ওপর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই
 ক্যামেরার উন্নতির জন্যে জোর চেষ্টা চালিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের
 সময় অবজারভেটরির রাইরের ফে-কোন ক্যামেরার ম্যাক্সিমাম ফোকাল লেন্থ
 ছিল পঞ্চাশ ইঞ্চি। তাই দিয়েই বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকে ব্রিকিনসিয়াস বিমান থেকে ছবি
 তোলা হত। শত্রুশালী ক্যামেরার প্রয়োজনীয়তা দেন-ই প্রথম বেশি করে অনুভব
 করল মানুষ। বিমানে বসেই ক্যামেরা কমান্ড হত তখনকার দিনে, তাহা সাধারণ
 দশ মাইল ওপর থেকেও একটা স্ট্রোকলের সমান ফে-কোন জিনিসের পরিষ্কার ছবি
 তোলা সম্ভব হত। কিন্তু এতে সবুই থাকতে পারত না মানুষ—না রাশিয়ান, না
 আমেরিকান।

'অতএব কিছুটা উন্নতি হলো ক্যামেরার। বিমান থেকে ব্যবহার করবার

বাপারে লেন্সের ফোকাল লেন্থ নিয়ে অসুবিধে পড়ে গিয়েছিল বিজ্ঞানীরা। প্রকাশ থেকে বাড়িয়ে আড়াইশো ইঞ্চি ফোকাল লেন্থ হয়তো করা যায়, কিন্তু তাতে ক্যামেরার ব্যাকেল লম্বা করতে হয় বিশ ফুট। এতবড় দানবীয় এক ক্যামেরা বিমানে বা উপগ্রহে বসানো দুঃসাধ্য। ভেবে ভেবে এক নতুন পদ্ধতি বের করল তারা। ফোভেড-লেন্স খ্রিস্টিপল ক্যামেরা লাগিয়ে ক্যামেরার ব্যাকেল বড় না করেও কৌশলে প্রতিফলনের মাধ্যমে ফোকাল লেন্থ বাড়িয়ে নিল অনেকখানি।

‘১৯৫০ সাল নাগাদ ফোভেড-লেন্স পদ্ধতিতে ফোকাল লেন্থ পাওয়া গেল একশো ইঞ্চি। তখন দশ মাইল ওপর থেকে শুধু সূটকেস নয়, একটা সিগারেট প্যাকেটের পরিষ্কার ছবিও তোলা সম্ভব হলো। আরও দশ বছরের মধ্যেই বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করে বসল পারকিন-এলমার রোট স্যাটেলাইট মিসাইল ট্র্যাকার—যার ফোকাল লেন্থ দাঁড়িয়েছে পাঁচশো ইঞ্চি। এর সমান ক্ষমতার একটা ব্যাকেল টাইপ ক্যামেরা তৈরি করলে লম্বায় হত চল্লিশ ফুট। যাই হোক, এই ক্যামেরার এতই ক্ষমতা—দশ মাইল ওপর থেকে মাটিতে পড়ে থাকা চিনির একটা দানার ছবি তুলতেও বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয় না।

খামল রানা। ধোঁতাদের মাঝে কোনরকম অমনোযোগিতা আছে কিনা লক্ষ করল। নেই। এর আগে আর কোন বক্তা ধোঁতার এমন গভীর মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরেছে কিনা সন্দেহ আছে তার।

‘বাইশ বছর পর,’ আবার শুরু করল রানা, ‘অবিশ্বাস্য বকম শক্তিশালী আরেক ক্যামেরা আবিষ্কার করে বসল এক রাশান বিজ্ঞানী। ক্যামেরার নাম রাশল, পারকিন-আলমন্ড পেত্রোভি মিসাইল ট্র্যাকার। এর ফোকাল লেন্থ কত, প্রকাশ্যে ঘোষিত হয়নি কখনও, জানি না আমিও। তবে এইটুকু জানি, এই ক্যামেরার সাহায্যে তিনশো মাইল ওপর থেকে অন্ধকারে ফেলে রাখা একটা সাদা পিরিচেরও স্পষ্ট ছবি তোলা সম্ভব। যে-কোন ছোট আকারের স্যাটেলাইটে বসিয়ে দেয়া যায় এই অটোম্যাটিক ক্যামেরা।

‘ক্যামেরাটা বসানোর কথা ছিল দু’টনি রাশান স্যাটেলাইট ‘কসমস নাইন’-এ। কিন্তু বসানো হলো না। না, নষ্ট হয়ে যায়নি, হাইজ্যাক হয়ে গেল সেটা, প্রকাশ্যে নিবালোকে, খোদা মস্কো থেকে, একটা পোলিশ বিমানে করে। বলা বাহুল্য, এটা সোজা চলে যায় আমেরিকানদের হাতে।

‘মাত্র চার মাস আগে সামোস-ফাইভ নামে একটা আমেরিকান স্যাটেলাইটে বসানো হয় এই ক্যামেরা। দিনে সাতবার করে চক্কোর দিচ্ছে সেটা সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর দিয়ে, এই ভাবেই চলার কথা অনিদিষ্ট কাল ধরে। কিন্তু তিন দিনের মধ্যেই কয়েক বছরে যা জানতে পারত না সে-সমস্ত খবর জানা হয়ে গেল ওদের। অসংখ্য ছবি তুললো পারকিন-আলমন্ড পেত্রোভি। কিসের ছবি, জানেন? উত্তর এক। পৃথিবীতে যে ক’টা রাশান-মিসাইল-লঞ্চিং বেস আছে, সবগুলোর ছবি। একদিকে লাক্স-বেসের ছবি তুলেছে পারকিন-আলমন্ড পেত্রোভি, অন্যদিকে একই সময়ে একই স্যাটেলাইট থেকে সোজা আকাশ পানে চেয়ে তারার ছবি তুলেছে আরেকটা ছোট, সাধারণ ক্যামেরা। উদ্দেশ্য সহজ। মাপ মিলিয়ে চেক করে দেখেছে ব্রতোকটী বেসের এককয়টি পজিশন নেমে যাচ্ছে তারা। তারপর সৈনিক

পানে একটা করে ইস্টারকটিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইল তাক করে রাখলেই কেহা ফতে। মুক না কবেই জিতে যাওয়ার মত অবস্থা।

‘কিন্তু খুশি হবার সুযোগটা আর পেল না তারা। রাশ মিসাইল তাক করবার আগে ছবিগুলো হাতে পেতে হবে তো। সেই ব্যাপারে গোলমাল দেখা দিল। স্যাটেলাইট থেকে রেডিও ট্রান্সমিশনের সাহায্যে ছবিগুলো সংগ্রহ করলে অনেক সুস্থ বৃত্তিটি ভিটেইলস বাদ পড়বে, তুল-আত্তি থেকে যাবে। কাজেই নিরুত্ত ছবি পেতে চাইলে ছবি নয়, ফিল্মটা হাতে পাওয়া চাই। আর স্যাটেলাইট থেকে ফিল্ম পেতে চাইলে দুটো মাত্র উপায় আছে। এক: স্যাটেলাইটকে মাটিতে নামিয়ে আনা, আর অন্যটা হচ্ছে: স্যাটেলাইট আকাশেই থাকল, ইজেক্ট করিয়ে ক্যাপসুলের ভেতরে করে ফিল্মটা শুধু মাটিতে নামিয়ে আনা হলো। এই দ্বিতীয় পদ্ধতিতে অনেক রকম অসুবিধে আছে। তাই প্রথমটাই বেছে নিল মার্কিনীরা।

‘নিউইয়র্কের দু’শো মাইল পূর্বে অটোম্যাটিক মহাসাগরে স্যাটেলাইট নামানোর পরিচালনা নেয়া হলো। কিন্তু সব ভুল করে দিল স্যাটেলাইট। সামান্য গোলমাল। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, রেডিও সিগন্যাল পাঠিয়ে স্যাটেলাইটের এক পাশের রেট্রো রকট চালু করা যায়নি। তার মানেটা কি, বুঝতে পারছেন আপনারা কিছু?’

‘বুঝতে শুরু করেছি,’ নরম গলায় কথা বলে উঠল বুয়েল। ‘ভিন্ন কক্ষপথে চলতে শুরু করেছে তখন স্যাটেলাইট, তাই না?’

‘হ্যাঁ, ঠিক তাই। মাতালের মত টালমাটাল অবস্থা হলো ওটার। নিজের কক্ষপথ থেকে সরে পেল। গ্যোত্রা মেহেরই উল্টোপাশটা ছুট লাগাল বিপথে।

‘স্যাটেলাইটকে বাগ মানাতে না পেরে অগত্যা ঠিক করল মার্কিনীরা, ইজেক্ট করে ফিল্ম ক্যাপসুল নামিয়ে আনবে। কিন্তু কোথায় নামানো যায়? রেট্রো রকট খারাপ হয়ে যাবার পর দেখা গেল, মহাসাগরগুলোর ওপর দিয়ে উড়ছে ওটা। মুক্তরাই কিংবা তার খেদমতগার কোন দেশের ওপরে আসছে না স্যাটেলাইট। পরীক্ষা করে দেখা গেল, চেষ্টা করলে গতি কিছুটা কমানো যায় স্যাটেলাইটের, কিন্তু তাতেও নিয়ন্ত্রণে আনা যায় না। ওটার কক্ষপথে পড়ছে নিরপেক্ষ একতাত্র ক্রাফা—উত্তর মেরুপ্রদেশ। চিত্তাভাবনা চলল ওদের। কেউ কেউ বলল সাগরের কোথাও ক্যাপসুল নামানোর ব্যবস্থা হোক। কিন্তু এতে অসুবিধে আছে। ধুলোর ঘর্ষণ আর গরম থেকে রক্ষা করার জন্যে ক্যাপসুলের খোসায় আলুমিনিয়াম আর পাইরোসিরাম-এর ভারী প্রলেপ লাগানো থাকে। ভারী জিনিস। পানিতে পড়লেই টুপ করে ডুবে যাবে, অর্থাৎ চিরতরে হারাতে হবে জিনিসটা। তাই ঝুঁকি নিল না মার্কিনীরা। স্থলভাগের ওপর যখন আসতেই চাইছে না স্যাটেলাইট, বাকি রইল শুধু উত্তরের পোলার আইস ক্যাপ। স্থির হলো, এখানেই নামাতে হবে ক্যাপসুল।

‘কাজেই দ্রিফট আইস স্টেশন নভেলির কাছাকাছি ক্যাপসুল নামানো ঠিক করল মার্কিনীরা, তাই না?’ শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ডাক্তার জ্যাকব।

‘হ্যাঁ, ঠিকই অনুমান করেছেন। তবে মতন এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, তখনো জায় হয়নি নভেলির, স্টেশন গড়ার সমস্ত প্রস্তুতি শেষ হয়েছিলো মাত্র। মার্কিনীরা দেখল এই সুযোগ, এই আবহাওয়া কেন্দ্রেই ক্যাপসুল নামানো সবচেয়ে বেশি সুবিধেবৎ হবে। স্টেশনটা যদিও রাশানদের, কিন্তু তাতে অসুবিধে নেই, নিজস্বদের একজন যোগ্য

লোক ওখানে মোতায়ন করা গেলেই অনায়াসে ক্যাপসুলটা সংগ্রহ করতে পারবে।

স্টেশন গড়তে গিয়ে আমেরিকার আণবিক-শক্তিচালিত সেরা আইসব্রেকার "লিটভা"র সাহায্য পেল রাশানরা—অমীচিভাবেই। বিজ্ঞানের উন্নতির জন্যে শত্রুর সঙ্গে হাত মেলাতেও রাজি আছে তারা, ইত্যাদি অনেক বড় বড় কথা বলে, "লিটভা" ধরতে গেলে প্রায় গড়েই দিয়ে গেল স্টেশন নভেলি, নজর স্থাপন করল পারস্পরিক সহযোগিতা ও সন্ধিচার।

এই ভাবে জন্ম হলো আইস স্টেশন নভেলির। অপেক্ষা করে রইল মার্কিনীরা। আট সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হলো তাদের। তারপর এল সেইকণ, ভিন্ন কক্ষপথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে করতে সরাসরি নভেলির ওপরের আকাশে এসে গেল স্যাটেলাইট সামোশ-ফাইভ।

এদিকে রাশিয়া কিছু জানে না? জিজ্ঞেস করল রুস্তভ।

সব জানে। মার্কিনীরা কি চায়, কি তাদের আসল উদ্দেশ্য, হিসেব-কিতাব করে সৈন্য অনেক আগেই আঁচ করে ফেলেছে রাশানরা। তারাও প্রস্তুত হয়ে গেছে সবদিক থেকে। অপেক্ষা করছিল তারাও।

আবহাওয়া বিষয়ক বিভিন্ন যন্ত্রপাতির সঙ্গে দু'মাস আগেই যে একটা বিশেষ মনিটর নামানো হয়েছে নভেলিতে, সেটা খেয়াল করেনি কেউ। স্যাটেলাইট থেকে ক্যাপসুল ইজেক্ট হলেই রেডিও সিগন্যালের সাহায্যে খবরটা জানতে পারবে মনিটর, জানবে মেজর আজামাত কিরিম। নভেলির উদ্ধার প্রাণদেব দিকে একে একে তাকাল রানা। জিজ্ঞেস করল, 'মনিটরের কথা নিশ্চয়ই এই প্রথম শুনলেন আপনারা?' উদ্ধারপ্রাণ প্রতিটি লোকের চেয়ারায় কিছু খুঁজল, তারপর বলল, 'জানতেন না, যুদ্ধতে পারছি। আসলে জানানো হয়নি আপনাদের। খুবই গোপনীয় ব্যাপার। নভেলিতে জানত শুধু চারজন লোক। আজামাত আর তার তিন সঙ্গী, একই ঘরে ঘুমোত চারজনে। চারজনের তিনজনই এখন মৃত। জীবিত একজনের নাম ওনবেন? তার নাম আজামাত কিরিম। এখনও অজান, তবে বেঁচে যে আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কমান্ডারের কেবিনে তোলা হয়েছে তাকে সবার অলক্ষে।'

ডাক্তার তোলা মাছের মত হাঁ হয়ে গেছে টেবিল ঘিরে বসা লোকগুলোর মুখ। টেবিলের ধার খামচে ধরেছে কেউ কেউ। দুই চোখ বিস্ফারিত। সেদিকে তাকিয়ে মনে মনে হাসল রানা।

'নভেলিতে মার্কিন গুপ্তচর রয়েছে, এটা জানা ছিলো কিরিমের,' বলে চলল রানা। 'কিন্তু কে, সেটা তখনও জানা যায়নি। নভেলির প্রতিটি লোকের ফার্স্ট ক্লাস সিকিউরিটি ক্রিয়ারেণ রয়েছে। অথচ এদেরই মধ্যে কেউ একজন হঠাৎ এতবেশি খড়লোক হয়ে যাবে, যে রাশিয়া থেকে কোনভাবে পালিয়ে পারলেই যাক জীবন্তী পর্যায়ের ওপর সা তুলে কাটিয়ে দিয়ে পারবে। অস্ত্রো ও জননে একথা, কিন্তু এ নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামায়নি—কারণটা পরে বলছি।'

বিশেষ এক ধরনের একটা প্যোটেক্স মনিটর ছিল আমেরিকান স্পাইয়ের কাছে। এটা এক ধরনের রেডিও জিভাইল। স্যাটেলাইট থেকে খসে পড়ার সঙ্গে

সঙ্গে ক্যাপসুলের ভেতরের একটা বিশেষ রেডিও চালু করে দেবে এই ডিভাইস। একটা বিশেষ ওয়েভ লেংগে সংকেত পাঠাতে শুরু করবে ক্যাপসুলের ভেতরের রেডিও। করেওছিল। এতই নিযুক্তভাবে ইজেক্ট করেছিল স্যাটেলাইট, তিনশো মাইল ওপর থেকেও লক্ষ্যস্থলের ঠিক এক মাইলের মধ্যে এসে পড়েছিল ক্যাপসুল। আইস ক্যাপের ভয়ঙ্কর তুষার ঝড়ের মাঝেও ক্যাপসুল খসে পড়ার খবর ওছার সাহেবকে ঠিকই জানাল মনিটর। এই ডিভাইসের সাহায্যেই গাড় অন্ধকারেও ক্যাপসুল বুজে পেতে তখন কোন অসুবিধে হলো না তার। ফিরে এল সে আবার স্টেশনে, নিজের কেবিনে। নভেলির আশপাশে বরফের তলায় কোথাও নিশ্চয়ই চাপা পড়ে আছে এখন ওই মনিটর।' ধামল রানা। শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'বুঝিয়ে বলতে পারছি তো? বিশেষ করে স্পাই সাহেবকে জিজ্ঞেস করছি।'

'সহজ ভাষায়ই তো কথা বলছেন, মেজর রানা,' মোলায়েম কণ্ঠে বললেন রাইকভ। 'এখানের কারোই বুঝতে অসুবিধে হবার কথা নয়।'

'বেশ, অসুবিধে না হলেই ভাল,' বলল রানা। 'তা কপাল খারাপই বলতে হবে আজামাত আর তার তিন সঙ্গীর। কারণ মনিটরের সাহায্যে তারাও ঠিক সময়েই জেনে গেছে, ক্যাপসুল ইজেক্ট করেছে স্যাটেলাইট। ওটাকে আনতে যাবেই কেউ, জানে তারা, কিন্তু কে যাবে জানা নেই। কাজেই চোখ রাখার ব্যবস্থা করল আজামাত। একজন লোক নিযুক্ত করল, কোন কেবিন থেকে কে বেরিয়ে যায় দেখার জন্যে। দুয়োণের রাত, মারাত্মক ঠাণ্ডা, বরফ-ঝড় মুখে নিয়ে বইছে প্রচণ্ড দমকা বাতাস। তার ওপর গাড় অন্ধকার। এতসবের মাঝে কে কোন ফাঁকে কোথায় বেরিয়ে গেল, নজর রাখা সত্যিই বড় কঠিন ব্যাপার। আমার মনে হয় বেরিয়ে যাবার সময় স্পাই সাহেবকে দেখতে পায়নি আজামাতের লোক। ক্যাপসুল নিয়ে যখন ফিরল, তখন দেখেছে। কিংবা স্পাইয়ের কেবিনে আলো জ্বলছে দেখে অনুসন্ধান করতে এগিয়ে গেছে। হয়তো দেখেছে, ক্যাপসুল থেকে ফিমা বার করছে স্পাই। বোকার মত কাজ করেছে তখন লোকটা। আসলে ফিরে গিয়ে আজামাতকে সব কিছু জানানো উচিত ছিল তার। তা না করে সোজা স্পাইকে চ্যালেঞ্জ করে বসেছে। এবং সেখানেই মারাত্মক ভুলটা করেছে সে, যা শোধরাবার সুযোগ আর পায়নি। ঘ্যাচ করে পাজরার ফাঁকে ঢুকে গেছে ইস্পাতের ফলা।' নভেলির উদ্ধারপ্রাণদের ওপর আরেকবার চোখ বোলাল রানা। 'কে, বলুন তো কে এই বিশেষ কাজটি করেছিলেন?' কেউ কোন কথা বলল না। রানা বলল, 'যে-ই করে থাকুন, অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। মইলে ছুরি মারতে গিয়ে ফলা ভেঙে ফেলতেন না। হ্যাঁ, লাশের পাজরায় ছুরির ডাঙা ফলাটা পেয়েছি আমি।' রাইকভের দিকে তাকাল রানা।

কমান্ডার জানেন মিছে কথা বলল রানা। কিন্তু এই মিথো বলার পেছনে নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে, ডেবে চূপ করে বইলেন, চোখের পাতাটি পর্যন্ত কাঁপল না একবারও।

'এদিকে ক্রমেই উন্মিহ হয়ে উঠছে আজামাত। ঘন ঘন ঘড়ি দেখছে। লোকটাকে পাতান, কিন্তু এত দেরি করছে কেন ফিরতে? পের পন্থ আর থাকতে

না পেয়ে আরেকজনকে পাঠান সে ব্যাপার কি দেখার জন্যে। এদিকে বিপদের গুরু পেয়েছে আমাদের দোস্ত, সতর্ক হয়ে গেছে। যে-কোন রকম সন্ধ্যার জন্যে তৈরি সে তখন। জানে, খবর পাড়ে যাচ্ছে, আজামাত নিজে আসবে কিংবা অন্য কোন লোক পাঠাবে খোঁজ নিতে। কাজেই দ্বিতীয় লোকটা ঘরে ঢোকা মাত্র খুন হয়ে গেল। পায়ের কাছে পাড়ে আছে প্রথম লোকটার লাশ, এটা দেখার পর দ্বিতীয় লোকটাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না খুন্সী। তার কাছে শুধু ছুরিই নয়, একটা পিস্তলও ছিল। এবার ব্যবহার করেছে সে এটা।

দ্বিতীয় লোকটাও ফিরে না গেলে সতর্ক হয়ে পড়বে, তৃতীয় কাউকে একা পাঠানোর ঝুঁকি আর নেবে না আজামাত। এবার হয় সে নিজে আসবে, নয়তো একাধিক লোক পাঠাবে খবর নিতে, আশঙ্কা করল খুন্সী। আজান্ত হওয়ার চাইতে আক্রমণ করাটাই এখন উচিত কাজ হবে, ভাবল সে। পিস্তল হাতে সোজা চলে গেল আজামাতের কেবিনে। আজামাত এবং তার ঘুমন্ত সঙ্গীকে গুলি করল নির্মমভাবে। জেগে ছিল বলেই হয়তো মাথা এক পাশে কাত করে ফেলেছিল আজামাত। গুলি লাগেনি ঠিকমত, বেঁচে গেছে। কিন্তু ঘুমন্ত লোকটি মারা গেছে। পরীক্ষা করে তার মাথায় বুলেটের ছিদ্র দেখেছি আমি। এতগুলো খুন করেও হয়তো পারই পেয়ে যেত, কিন্তু খুন্সীর কপাল খারাপ। মেজর আজামাত কিরিমের ঘনিষ্ঠ বন্ধুর নাম মাসুদ রানা। নিজের বুক গোটা দুই টোকা দিল রানা।

‘আ-হ-হা-আ-আ!’ চায়না-রু চোখ কপালে তুলে কিসকিনিয়ে কলন জ্বাকত। ‘খুন করার পরই নিজের কুসাজ ঢাকা দিতে বাস্তব হয়ে পড়ল খুন্সী। উপায় একটাই ছিল, লাশগুলোকে পুড়িয়ে ফেলা। নিজের কেবিনে পাড়ে থাকা লাশ দুটোকে আজামাতের ঘরে এনে ফেলল সে। তারপর ফুয়েল স্টোর থেকে দুটো ড্রাম টেনে এনে ঘরের দেয়ালে তেল ছিটাল। ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে-চিন্তে কাজ করেছে সে। মেজরের ঘরটাই শুধু নয়, ফুয়েল স্টোরেও আগুন লাগিয়েছে। এমনভাবে ঘটনা সাজিয়েছে, যেন সবাই ভাবে ফুয়েল স্টোর থেকেই আগুনের উৎপত্তি হয়েছে।’

টেবিলের চারপাশ ঘিরে শুরু হয়ে বসে আছে সবাই। নিঃশ্বাস ফেলতেও যেন ভুলে গেছে।

‘কৌতূহল একটু বেশিই আমার,’ বলে চলল রানা। ‘প্রথমটাই খটকা লাগল, অসুস্থ, ক্লান্ত, মারাত্মক পোড়া আহত কিছু লোক লাশগুলোকে ল্যাবরেটরিতে সরানোর পরিপ্রসঙ্গটুকু কেন করল? ভেবে বার করলাম, কেউ একজন তাদের বুঝিয়েছে, এটাই করা উচিত। পোড়া বিকৃত কতগুলো লাশ পুড়ে থাকলে ল্যাবরেটরিতে ঢুকতে চাইবে না কেউ, এটাই স্বাভাবিক। আর এটাই চাইছিল খুন্সী, সন্দেহ হলো আমার। ঝুজতে শুরু করলাম। দেখি ভাল বুদ্ধি করেছে—লাশ দিয়ে ঢোকে বোঝেছে স্টোরনোডের ঢাকনা। ওটার নিচে কি পেলেন জানেন? চরিশটা জ্বালান নাইফ সেন্স, প্রচুর রাবার, একটা রেডিও-সমন্বিত বেলুন, আর কেবুনে করার জন্যে রাখা হাইড্রোজেন পালের একটা সিলিন্ডার। নাইফ সেন্সগুলো পেয়ে অতটা অবাক হইনি। কিন্তু আজা ব্যাটারির সঙ্গে ওই সব জিনিসও পেয়ে যাব, না, অতটা আশা করিনি আমি।’

‘দুটো জিনিস বিপক্ষে গেছে খুন্সীর, ফলে তার প্রাণ মারফিক কাজ হয়নি। এক : মেজর আজামাত সন্দিক হয়ে উঠবে, আশা করেনি সে। আর দুই : আচমকা সাংঘাতিক খারাপ হয়ে গিয়েছিল আবহাওয়া। আবহাওয়া ভাল থাকলে ব্যাপসুলটা বেলুনে বেধে আকাশে উড়িয়ে দিত খুন্সী। আকাশ থেকেই হৌ মেয়ে জিনিসটা তুলে নিত কোন আমেরিকান বিমান। বিমানের লোকদের সঙ্গে রেডিও যোগাযোগের জন্যেই নাইফ সেন্সগুলো সরিয়ে রেখেছিল সে। রেডিও ওয়েভ গোপন করা যায় না, তাই যোগাযোগের জন্যে বিশেষ কোড ছিল তার কাছে, কাগজে লেখা। যখন দেখল যোগাযোগ করার আর কোন দরকার নেই, আকাশে বেলুন ওড়ানো যাবে না, কোড লেখা কাগজটা পুড়িয়ে ফেলল খুন্সী। এবারেও ছোট্ট একটা ভুল করল। পোড়া টুকরোগুলো দূরে কোথাও না ফেলে উড়িয়ে দিল বাতাসে। মেট হাউসের কাছে বরফে চাপা পড়েছিল ওগুলো, ঝুঁজে বের করেছে আমি।’

‘ভাল ব্যাটারি ব্যবহার করে হচ্ছে করলেই লেনিনগ্রাদের সঙ্গে ঠিকমত যোগাযোগ রাখতে পারত খুন্সী, কিন্তু রাখেনি। বরং মেজর রেখেছে যেন শক্তি শেষ হয়ে আসা ব্যাটারিই ব্যবহৃত হয়। হচ্ছে করাই অসম্পূর্ণ এস, ও, এস, পাঠিয়েছে। আমরা দেবিতে পৌঁছি, এটাই চেয়েছিল সে। আশা করেছিল, কিছুক্ষণের জন্যে আবহাওয়া ভাল হয়েও যেতে পারে, তাহলে বেলুন ওড়াতে পারবে। নভেলিতে আঙন লেগেছে: আমেরিকা, রাশিয়া, ব্রিটেনের সমস্ত রেডিও স্টেশন বডকাস্ট করেছে এই খবর, নভেলিকে ঝুঁজে বেড়াচ্ছে রাশান, ব্রিটিশ আর আমেরিকান প্লেন, বরফ ভেঙে তোলপাড় করে আইস স্টেশনটাকে ঝুঁজতে বেরিয়েছে মার্কিন আইস ব্রেকার “নভো”, রেডিও মারফত সব খবরই পেয়েছে খুন্সী। আবহাওয়া উন্নতির কোন লক্ষণই নেই দেখে রেডিওতেই তার দোসরদের প্লেন পাঠাতে নিষেধ করেছে। জানিয়েছে, সঙ্গে ফিল্ডগুলো নিয়ে লেনিনগ্রাদেই উঠে যাবে সে।’

‘একটু, মেজর রানা,’ হাত তুলে বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন রাইকত, ‘আপনি বলতে চাইছেন, এই জাহাজেই আছে এখন ওগুলো?’

‘না থাকলেই অবাক হব, কমান্ডার,’ বলে গেল রানা। ‘এই ফিল্ডের জন্যেই সম্ভবত সরাসরি আঘাত হানা হয়েছে লেনিনগ্রাদের ওপর। আমাদের দেরি করিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু কেন দেরি করানো হচ্ছে, আমার কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়নি এখনও। দেরি করানোর জন্যে বন্দরে থাকতে কারসাজি করা হয়েছে, লেনিনগ্রাদের টিউব ডোর খুলে রেখেছিল কেউ। দেরি করানোর জন্যেই আঙন লাগানো হয়েছে এঞ্জিন রুমে।’

‘কে?’ জানতে চাইলেন কমান্ডার।

প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল রানা। বলল, ‘যে-ই হোক, লেনিনগ্রাদ ধ্বংস হয়ে যাবে, এটা চায়নি সে। একথা আসেও একদিন বলেছি আপনাকে, এক ধরনের মানসিক ছাড়া নিতান্ত বাধ্য না হলে খুন করে না যেকোনো। নভেলির পাইকারী খুনখায়াবও, আমার মনে হয় নিতান্ত বাধ্য হয়েই করতে হয়েছে খুন্সীকে।’

‘কে, মেজর রানা?’ শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল সোফী ফুয়েল, ‘কে খুন্সী জানেন আপনি?’

‘জানি। আসছি সে কথায়। নভেলির ছয়জনকে সন্দেহ করেছিলাম প্রথমে। ক্যাপ্টেন কুমারও আর যমজ দুই ভাই শয্যাশায়ী ছিল, তারা বান। চলাফেরার মোটামুটি কমতা ছিল বুয়েল, কতিন, ডাক্তার জ্যাকভ, কসমোপড, অভয় আর মিকোর। প্রচুর ভাবলাম। ধীরে ধীরে জানা হয়ে গেল উত্তর। খুন এবং বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে আর মাত্র তিন সপ্তাহ পরেই রাশান নামরিক আদালতে আমাদের বিচার হবে, বন্ধু। তুমি সাংঘাতিক বুদ্ধিমান সন্দেহ নেই, কিন্তু হেরে গেলে শেষ পর্যন্ত।’ জ্যাকভের দিকে তাকিয়ে শেষের কথাগুলো বলল রানা।

প্রথম কয়েক সেকেন্ড কেউ কিছু বুঝতে পারল না। তারপর ধীরে ধীরে রানার কথা আর দৃষ্টির মানে বুঝে নিয়ে ঘাড় ফেরাল ডাক্তার জ্যাকভের দিকে।

ধীরে, অতি ধীরে উঠে দাঁড়াল জ্যাকভ। আশে করে দুই পা এগিয়ে এল রানার দিকে। নীল চোখ দুটো বিস্ফারিত, বিশ্বাস করতে পারছে না যেন রানার কথা, এমনি ভাব চেহারায়।

‘আমি?’ প্রায় কিসকিসিয়েই বলল জ্যাকভ। ডান হাতের তর্জনী ঠেকাল নিজের বুকে। ‘আমি? আপনি পাগল হয়ে গেছেন ডাক্তার... মেজর রানা। আপনি পাগল...’

মারল ওকে রানা। ভেতরে পুষে রাখা ভয়ঙ্কর ক্ষোভ দড়াম করে আছড়ে পড়ল ওর নাকে-মুখে।

দুই হাতে নাক-মুখ চেপে ধরে ছিটকে পেছনে গিয়ে পড়ল ডাক্তার। সেই মুহূর্তে জ্যাকভকে খুন করার ইচ্ছেটা অনেক কষ্টে দমন করল রানা। তীব্র ঘৃণা কুটে বেরোচ্ছে তার চোখ থেকে।

টেবিলের ধারে বসে থাকা লোকগুলো সামান্যতম নড়ল না। স্থব্র হয়ে দেখছে তারা। বিমূঢ় হয়ে গেছে ঘটনার আকস্মিকতায়।

চিত হয়ে পড়েছে জ্যাকভ। দুই কনুইয়ে ভর দিয়ে কোনমতে উঠে বসল, জোব করে নিজেকে খাড়া করল পায়ের ওপর। মুখে-চোখে বাথার ছাপ। পকেট থেকে রুমাল বের করে চেপে ধরল ঠোঁটে। টলতে টলতে দিয়ে ধপ করে বসে পড়ল আবার আগের চরায়।

‘ডাক্তার, জ্যাকভকে বলল রানা। ‘নিজের হাতে তোমাকে খুন করার সুযোগ পেলেন সবচেয়ে বেশি খুশি হতাম আমি। কিন্তু নিজের হাতে আইন ভুলে নিতে পারছি না এখন। ফাঁসির দড়িতে ঝুলেই মরতে হবে তোমাকে। আমার আন্তরিক ইচ্ছে, দড়ির ফাঁসে কোনরকম গোলমাল ঘটে গিয়ে তোমার মরণটা যেন অনেক দীর্ঘস্থায়ী হয়। অনেক, অনেকক্ষণ যেন লাগে তোমার সম বেরোতে।’

মুখ থেকে রুমাল সরাল জ্যাকভ।

‘বন্ধু পাগল হয়ে গেছেন আপনি,’ ঝেঁতলানো দুই ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে কোনমতে কথাগুলো বের করল জ্যাকভ। ইতিমধ্যেই সাংঘাতিক ঘুলে ঠাচ্ছে তার ঠোঁট। ‘আবোল তাবোল বকছেন।’

মাথা নড়ল রানা। ‘অভিনন্দ করছি, করো। কিন্তু জেনে রাখো, আটচল্লিশ ঘণ্টা আগেই চিনেছি আমি তোমাকে। যা বলছি তা প্রমাণ করে নিতে পারব।’

‘কি বললেন? গুট আটচল্লিশ ঘণ্টা পাবে আপনি জানেন কে খুনী, অথচ...’

কমাতারের কণ্ঠে ক্ষোভ।

‘বাধা হয়েছি, কমাতার,’ বলল রানা। হঠাৎই নিজেকে বড় বেশি দ্রুত মনে হলো। খুব তাড়াতাড়ি এখন সব কথাবার্তা শেষ হয়ে যাক, তাই চাইছে। একটা লম্বা ঘুম চাইছে এখন তার শরীর। ‘আপনাকে বললেই সঙ্গে সঙ্গে একে কয়েদ করে রাখতেন। কিন্তু শুধু একা ওকে নয়, পুরো স্পাই-কিউটাকেই ধরতে চেয়েছি আমি। আমার কথা শেক-হয়নি এখনও, কমাতার, আরও আছে। দয়া করে শুনুন কিছু যুক্তি দেখাতে দিন।’

‘আচ্ছা, একটা ব্যাপারে খটকা লাগেনি আপনার?—আগুন লাগার পরেও ঘুমিয়েই ছিল জ্যাকভ। ভেবে দেখুন, তার নাকি দম বন্ধ হয়ে এসেছিল। ধোয়ায় ভর্তি ঘরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের দরজার কাছে ঠিক চলে এসেছে, একটুও অসুবিধে হয়নি। ওদিকে আবার ঘর থেকে বেরিয়েই হুশ হারিয়ে পড়ে গেল। কি আশ্চর্য! ঘরের ভেতরে ধোয়ায় দম বন্ধ হয়েও জান হারান না, অথচ বাইরে, যেখানে খোলা বাতাসে ভালভাবে দম নিতে পারতিল সেখানেই এসে কিনা বেহুশ হলো। আসলে ঘটনাটা কি জানেন? সবাইকে ওর জানানো দরকার, ওই অগ্নিকাণ্ডের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। সবাইকে বোঝাতে চেয়েছে, বড় নাক্তক মানুষ সে, বিপদ-আপদে হাল ছেড়ে দেয়। কিন্তু আমি কসম খেয়ে বলতে পারি, তার মত ব্যক্তি নেবার কমতা ও সশস্ত্রিত খুব কম লোকেরই আছে।’

‘ওর বিপক্ষে এটা কোন প্রমাণ হলো না,’ বললেন কমাতার রাইকড।

‘আমি প্রমাণ দিচ্ছি না,’ বলল রানা। ‘পয়েন্ট উল্লেখ করছি মাত্র। এখন দুই নম্বর পয়েন্ট। অভয়, তুমি তোমার দুই বন্ধু খায়রভ আর ননোটিকে জাগানোর প্রাণপণ চেষ্টা করেছ, কিন্তু জাগেনি ওরা। কি করে জাগবে, আমাদের জ্যাকভ ডাক্তার যদি ওধু দিয়ে অজ্ঞান করে রাখে? কি ব্যবহার করেছিলে ডাক্তার, ইথার না ক্লোরোফর্ম? যা-ই ব্যবহার করে থাক, করেছেলে মেজর আজামাতকে খুন করার পর। তারপর আগুন লাগিয়েছ। তুমি জানতে, উদ্ধারকারীরা আসতে অনেক দেরি হবে, কারণ এই দুর্গম মেরুতে খবর পেলোই কিছু আর হুট করে চলে আসতে পারে না কেউ। এই সময়টা যাতে উপোস না নিতে হয় এজন্যে আপোনাগেই খাবার সরিয়ে রেখেছিলে। অন্যেরা যদি না খেতে পেয়ে মরে যায়, যাবে, তাতে তোমার কি, তাই না? ভেবে ভেবে কিন্তু খাবার রাখার নিরাপদ জায়গাই বের করেছিলে। ঢেকে রেখেছিলে খায়রভ আর ননোটির লাশ দিয়ে। আচ্ছা, অভয়, তোমার একটুও খটকা লাগল না, দু’জন লোককে জাগানোর জন্যে অত ধাক্কাধাক্কি চেষ্টামেটি করলে, অথচ কেন ওরা জাগল না? অবশ্য তোমাকে দোষ দেয়া যায় না। ওই বকম পরিস্থিতিতে মাথা ঠাণ্ডা রেখে চিন্তা করার প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া ক্লোরোফর্ম কিংবা ইথারের গন্ধ চাপা পড়ে গিয়েছিল পোড়া ডিকেলের গন্ধে।’

ধামল রানা, তারপর বলল, ‘এতেও অবশিষ্ট কিছুই প্রমাণ হয় না।’

‘এবারে তিন নম্বর পয়েন্ট। এই তো, আজ সন্ধ্যায় ক্যাপ্টেন কুমারভকে জিজ্ঞেস করে জেনেছি, পোড়া লাশগুলোকে ল্যাবরেটরিতে সরাবার আদেশ নাকি উনিই দিয়েছিলেন। তবে, জ্যাকভের দিকে চাইল রানা, ‘পঞ্চমশতা অবশ্যই ডাক্তার সাহেবের। লাশের সঙ্গে বাস করলে মানুষের নাকি কী কী সব মারাত্মক

ব্যারাম হয়। তাছাড়া পোড়া বিকৃত লাশ দেখলে নাকি মন ভেঙে যাবে আহতদের। কাজেই লাশগুলো না সরালেই নয়। আসলে যে খাবার আর অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র লাশ দিয়ে ঢাকা না দিলেই নয়, এটা তো আর বলতে পারবে না মুখ ফুটে। ঠিকঠাক বলছি তো সব, জ্যাকড? নাকি কোন ভুল আছে?

চতুর্থ পয়েন্ট। জ্যাকড বলেছে, আগুনটা কি করে লাগল এটা জেনে নাকি কোন লাভ নেই। আমরা জানলে অনুবিধে আছে তো তার। কেঁচো বুড়ো সাপ বেরিয়ে পড়বে যে। জ্যাকড, আগুন লাগানোর আগেই ফায়ার এক্সটিংগুইশারগুলো জ্বাল করে রেখেছিলে, তাই না? মিকো বলেছিল সেদিন, ও বাম্বুহার্ডসের দিকে রওনা দেবার পর ফাটতে শুরু করে তেলের ড্রাম। ঠিকই বলেছে সে। নাকি, ডাক্তার?

‘আপনার মাথার ঠিক আছে কিনা সে সম্পর্কে আমার সন্দেহ জোরদার হচ্ছে, মেজর,’ শান্ত কণ্ঠে বলল জ্যাকড। ‘এই মুহূর্তেঠেসে ধরে আপনাকে কোন ফেরিমে বন্দী করে রাখা উচিত। পাগলকে ছেড়ে রাখা নিরাপদ নয়।’

‘পাচ নম্বর পয়েন্ট। নভেলিতে লেনিনগ্রাদকে দেরি করাতে চেয়েছিল কেন বুঝতে পারছি না। তবে দেরি করাতে চেয়েছিল বলেই আমাকে আর কডেনকোকে সরাসরে চেয়েছিল। আমরা যদি বলি যমজ দুই ভাইকে জাহাজে তোলা যাবে, কমান্ডার তোমার কথা শুনবেন না, তুমিও লেনিনগ্রাদকে দেরি করাতে পারবে না, এই তো?’

‘লাশ কবর দেবার অনুষ্ঠানে জোর জবরদস্তি করে গেলে যদি কিছু সন্দেহ করে বসি আমরা, এই জনো অন্য লোককে দিয়ে কমান্ডারকে অনুরোধ করিয়েছে জ্যাকড। প্রথমে অনুরোধ করেছে অডয়, তারপরে রুডি। কমান্ডার, ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত ঠেকেনি আপনার কাছে? যখনই শুনেছে জ্যাকড, বরফে লাশ কবর দেয়া হবে, তখনই প্ল্যানটা করে ফেলেছে সে। লেনিনগ্রাদের সেইল তেমন পিঙ্কিল হয়েছিল, দেখেছে সে। কডেনকোকে শেষ করা যায় কিভাবে, সেটাও ভেবেছে। এদপন সহজ কাজ। কবর দিয়ে ফেরার পথে কডেনকোর সঙ্গে সঙ্গে থেকেছে সে। লিডিং বেয়ে ওঠার সময় কডেনকোর নিচে থেকেছে। দড়ি ধরে ভারসাম্য ঠিক রাখছিল কডেনকো, জ্যাকডও। সময় বুঝে দড়িতে জোরে একটা দোলা দেয় জ্যাকড। সেইলের ছাতে ওঠার আগের মুহূর্তে শুধু দড়ির ওপর নির্ভর করেছিল বদেই আচমকা দোলা সইতে পারেনি। কডেনকো, পড়ে যায়। কি চালাক এই জ্যাকড ডাক্তার। নিজের নিচে থেকেছে। ফলে ওকে নিয়ে নিচে পড়েছে কডেনকো। নিজের ওপর থেকে নন্দেহ দূর করার কি সুন্দর কনসী! এতে অবশ্য নিজের জীবনের ওপরও যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়েছিল সে, স্বীকার করতেই হবে। দু’জনের পতনের শব্দ ছাড়া ও তৃতীয় আরেকটা চাপা শব্দ কানে এসেছিল আমার। জেতার ডগা দিয়ে মানুষের খুলি, মানে কডেনকোর কানের পাশে লাগি মারাত্মকই ওই শব্দ হয়েছিল। এর ফলে তোমার পায়ের আঙুল মলকায়ান তো, জ্যাকড?’

‘পাগলের কথাই প্রকার নিয়ে আর কি করব,’ ব্যস্তিক শোনাল জ্যাকডের কণ্ঠ। ‘বকর বকরই সার। প্রমাণ করতে পারবেন না কিছু।’

‘চেষ্টা করতে তো দোষ নেই। হ্যাঁ, কডেনকো তোমাকে নিয়ে নিচে পড়েছে,

কথাটা সত্যি। তুমিও স্বীকার করেছ। মাথায় চোটও পেয়েছ, দেখেছি আমরা। কিন্তু ওই সামান্য চোটেরই ইশ হারিয়ে ফেললে? মটকা মেরে পড়েছিলে, না? হবইশ হবার ভান করেছিলে। এরপরেই ভুলটা করলে তুমি। ইশ ফিরে পাবার ভান করলে, উঠে বসলে। এবং নেহাতই বোকার মত মুখ ফলকে বলে ফেললে কথাটা। কথাটা আপনার মনে আছে না, কমান্ডার?’

‘আমার মাথা আর ঝাপ্পা করবেন না,’ তিক্ত শোনাল রাইকডের কণ্ঠ। ‘অতিশয় তেমন ভাল না আমার।’

‘ঠিক আছে, বলে দিছি। জ্যাকড বলেছিল: বেঁচে আছে তো? কে এমন করল? আপনি জিজ্ঞেস করেছিলেন: কি করল? কটে গুয়ে থাকা ব্যাভেজ বাধা কডেনকোকে চেনা যাচ্ছিল না, তার কি হয়েছে বলেওনি তাকে কেউ, অথচ কোন অলৌকিক উপায়ে যেন জানতে পারল জ্যাকড পাশের কটে গুয়ে আছে কডেনকোই। বলে উঠল: ডাক্তারকে আমার ওপর ফেলল? কে? মনে পড়েছে তো এবার, কমান্ডার?’

‘ঠিক বলেছেন, মেজর, কে পড়েছে তার ওপর জানা ছিল জ্যাকডের, কিন্তু পাশের কটে কডেনকো আছে সেটা তো জানার কথা নয়!’ ডাক্তারের দিকে কঠিন, শীতল দৃষ্টিতে চাইলেন কমান্ডার। ‘ঠিকই বলেছেন, ও, ও...’

‘বুনী। কডেনকোর পর পরই আমার ওপর নজর দিল জ্যাকড ডাক্তার। মেডিক্যাল স্টোর থেকে কিছু ওষুধপত্র আনার অনুমতি চেয়েছিলাম আমি আপনার কাছে, ওয়ার্ড ক্রমে তখন ছিল ও। শুনেছে। রাস, সময় মত পিছু নিয়েছে আমার। ছাচ কভারের হুড়কো খুলে রেখে সরে পড়েছে। কডেনকোর মত মরতে মরতে বেঁচে গেলাম আমিও। দুই-দুইবার ব্যর্থ হলো জ্যাকড। এরপর আসছি বুনিয়েনের কথায়। বুনিয়েনকে নড়ানো যাবে না, মরে যেতে পারে, এসব বলে ওকে নভেলিতেই রাখতে চেয়েছিল জ্যাকড, কিন্তু তার কথা শুনলেন না আপনি, কমান্ডার...’

‘ঠিকই বলেছিলাম,’ বলল জ্যাকড। ‘আশ্চর্য শান্ত ভাবগতিক।’ ‘যা বলেছিলাম তাই হয়েছে, মারাই গেছে বুনিয়েন।’

‘হ্যাঁ, মারা গেছে,’ স্বীকার করল রানা। ‘কারণ ওকে মেরে ফেলেছে তুমি। এবং ওকে মেরে তোমার বিরুদ্ধে কিছু প্রমাণ সংগ্রহের সুযোগ দিয়েছে আমাকে। কি করে মেরেছ, সে কথায় পরে আসছি। কিন্তু তার আগে আরেকটা ব্যাপার। বুনিয়েনের দোহাই দিয়ে লেনিনগ্রাদকে আটকাতে না পেলে অন্য উপায় ধরলে তুমি। চেয়েছিলে এক, কি দুই ঘটনা দেরি করাতে। কিন্তু হিসেবে একটা গোপনমাল করে ফেললে। প্রায় শেষই হয়ে যাচ্ছিলাম আমরা। এজিন ক্রমে সামান্য একটু অগ্রিমভের বন্দোবস্ত করতে গিয়েছিলে তুমি, ভয় পাইলে দিতে চেয়েছিলে, যাতে রিস্যাকটর বন্ধ করে দেয়া হয়। সিকবেতে বশেই এক সুযোগে তৈরি করে নিয়েছিলে ভিলেইড-অ্যাকশন কেমিক্যাল ফিউজ যাতে আগুন ধরালে প্রচুর ধোয়া বেরোয়। মাঝরাত্রে, যখন প্রায় নির্জন হয়ে পড়েছে এজিন ক্রম, ফিউজ নিয়ে গেলে সেখানে তুমি। কি করে গেলে, সেকথাও বলছি। সাংঘাতিক, সাংঘাতিক চালাক তুমি ডাক্তার, এবং সেই পরিমাণ ভয়ঙ্কর।’

‘এবং নিষ্ঠুর,’ বললেন রাইকড।

‘হ্যাঁ, নিষ্ঠুর। সেই সন্ধ্যায় রোগীদের দেখাশোনা করেছে সে। আমিও ছিলাম তার সঙ্গে। বুনিয়েনের পোড়া কব্জে ব্যাডজ বেধে দিয়েছে। তারপর রোগীদের পাহারায় যে ছিল, তাকে বলছে বুনিয়েনের যে-কোন অসুবিধের কথা যেন সঙ্গে সঙ্গে জানানো হয় জ্যাকডকে। জানানো হয়েছে ছিল। এঞ্জিন রুমের একজন স্টাফের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি আমি, সেই রাতে দেড়টা নাগাদ এঞ্জিন রুম প্যাসেজওয়ে ধরে বুনিয়েনকে দেখতে যাচ্ছিল জ্যাকড। মেশিনারি-সম্পর্কে ফিউজ ফেলার সুযোগ পেয়েছিল সে ওখান দিয়ে যাবার সময়ই। তার পরিকল্পনা মাফিকই কাজ হত, কিন্তু গোল বাধান শীঘ্রই। তেল-বাওয়া জিনিসটাতে ধরে গেল আন্তন। তারপর কি হলো, আপনারা জানেন।’

দীর্ঘ কয়েক মুহূর্ত জ্যাকডের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন কমান্ডার। তারপর রানার দিকে চেয়ে এদিক-ওদিক মাথা নাড়লেন। ‘আপনার এই কথাটা ঠিক মানতে পারছি না, মেজর। বুনিয়েনের অবস্থা খারাপ না-ও হতে পারত। তাহলে জ্যাকডের পরিকল্পনা ঠিক থাকত না। অনিশ্চয়তায় ভরসা করে না জ্যাকডের মত লোক।’

‘করও নি,’ স্বীকার করল রানা। ‘সিক-বের রেফ্রিজারেটর খুঁজলেই এর জ্বাব পেয়ে যাবেন। একটা অ্যালুমিনিয়ামের পাত রাখা আছে তাতে। ওই পাতে জ্যাকড ডাক্তারের আঙুলের ছাপ পাবেন। পাতের এক পিঠে মলম মাখানো। কিন্তু মলমের আগে আর একটা জিনিস মাখিয়ে নিয়েছিল পিশাচটা। সোডিয়াম ক্লোরাইড, নানে, সাধারণ লবণ। বুনিয়েনকে বাথার ইলেক্ট্রিশন নিয়েছে জ্যাকড। তিন-চার ঘণ্টা পর্যন্ত থাকে এই ওষুধের কার্যকারিতা। ওদিকে তার দেহের তাপে পাতলা হয়ে লবণ মিশে গেল মলমের সঙ্গে। ঘায়েল সম্পর্কে এল এই লবণ। ওষুধের আকর্ষণ ঘুরোতেই তাঁর যন্ত্রণা অনুভব করল বুনিয়েন। চোঁচিয়ে উঠতেই ডাকা হলো ডাক্তারকে। ব্যাডজ না পাল্টে আরও একটা বাথার ইলেক্ট্রিশন পুশ করল পিশাচটা। ধোয়ায় মারা যায়নি বুনিয়েন, মারা গেছে শকে। গোটা হাতে অসহ্য জ্বলুনি—দরল সেইবার শক্তি ছিল না তার শরীরে।’

‘জ্যাকড ডাক্তার যে কতটা নীচ চরিত্রের লোক, করনা করতে পারবেন না, কমান্ডার। মহত্ব দেখাতে এঞ্জিন রুম থেকে বিনিমিকে তুলে আনতে গিয়েছিল সে। আসলে ওটা ছিল টাটকা বাতাসে যাবার কৌশল। এঞ্জিন রুমের গরমের মধ্যে গিয়ে ইচ্ছে করেই হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে গেছে। টেনে খুলে ফেলছে মাঝ। দশ-পনেরো সেকেন্ড যে কেউ দম না নিয়ে থাকতে পারে। তাই থেকেছে সে, তারপরই তুলে আনা হয়েছে ওকে। তখন ওকে পরিষ্কার বাতাসে নিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়েছেন আপনি, কমান্ডার। এটাই চাইছিল জ্যাকড।’

‘কিন্তু এর পরেও যার বার এঞ্জিন রুমে যাওয়া-আসা করেছে জ্যাকড,’ বললেন কমান্ডার।

‘অবশ্যই করেছে। কিন্তু কেন, জানেন? ক্রোজ-সার্কিট ব্রীজিং সেট পার আমাদের সবাই চেয়ে অনেক আগ্রহে থেকেছে সে। আহতদের সেবা করার ভাঙতা দিয়ে আসলে সেবা করেছে নিজের। দারুণ এক লোক হে তুমি, ডাক্তার।’

তোমার মত স্বার্থপর, নীচ, জঘন্য লোক জীবনে দেখিনি আমি।’

কোন কথা বলল না জ্যাকড।

‘ফিল্মডলো কোথায়, জ্যাকড?’

‘কিসের কথা বলছেন, বুঝতে পারছি না,’ শান্ত কণ্ঠে বলল জ্যাকড। ‘বিশ্বাস করুন, আপনি ভুল করেছেন। সব আপনার অবান্তর করনা।’

‘আলুমিনিয়ামের পাতে লবণ এবং তোমার আঙুলের ছাপও কি অবান্তর করনা?’

‘যে-কোন ডাক্তার তুল করতে পারে।’

‘তা পারে। কিন্তু লবণ ওষুধ নয়। ফালতু কথা বাদ দিয়ে ফিল্মডলো কোথায় বলে ফেলো তো চট করে।’

‘প্রীজ, দোহাই আপনার, আমাকে আর জানাবেন না,’ স্পষ্ট ক্রান্তি ফুটল জ্যাকডের গলায়।

‘এবার আপনার যা খুশি করতে পারেন, কমান্ডার,’ রাইকডের দিকে তাকাল রানা। ইচ্ছে করলে ঝোড়ে প্যাদানি দিতে পারেন, ইচ্ছে করলে কয়েদখানায় ভরে রাখতে পারেন।’

‘অবশ্যই কয়েদ করব,’ হাসি হাসি গলায় বললেন কমান্ডার। ‘গ্যাকো আর রুস্তভকে কিন্তু তৈরিতে পারব না আমি, ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করতে তার কেবিনে যেতে চাইবে ওরা।’

‘কেউ দেখা করতে যাবে না কারও কেবিনে,’ কথা বলে উঠল রুডিন। রানার দিকে তাকিয়ে আছে সে। আরও একটা জিনিস তাকিয়ে আছে রানার দিকে—বিচ্ছিন্ন চেহারার একটা মাউজার; কিভাবে যেন চলে এসেছে রুডিনের হাতে।

গোটা ঘরে পিনপতন স্তব্ধতা।

রানার দুই ডুকর ঠিক মাঝ বরাবর তাক করল রুডিন পিস্তলটা।

এগারো

‘কি বুঝলে, মেজর সাহেব?’ হাসল জ্যাকড। ফোনা চৌকটের জন্যে বিকৃত দেখাল হাসিটা। ‘বিভ্রাট পোয়েন্দা সেজে গিয়েছিলে। কত তাড়াতাড়ি পাল্টে যায় পাশার ছক, তাই না? কিন্তু, স্বরদার, কেউ কোনরকম বোকামি করবে না। পিস্তলে খুব ভাল হাত রুডিনের। খুব ভাল জায়গায় আছে ও, ঘরের সবাইকে উভার করতে কোন অসুবিধা নেই।’

ক্রমশঃ নিয়ে আলতো করে চৌকটের রক্ত মুছল জ্যাকড। উঠে দাঁড়াল। হাল্কা পায়ে হেঁটে এলে দাঁড়াল রানার পেছনে। রানার পোশাকের সন্ধ্যা জায়গাগুলো দ্রুত হাতে টিপেটিপে দেখে নিল।

‘নেই,’ বলল জ্যাকড। ‘তুমি বড়ই আনাড়ি লোক, রানা। কেমন স্পাই তুমি,

একটা পিণ্ডল পর্যন্ত নেই। ঘোরাও এখন, ঘুরে দাঁড়াও। দরকার হলেই তোমার শিরদাঁড়ায় ডলি ঢোকাতে পারে যেন রুডিন।

ঘুরে দাঁড়ান রানা। বিজয়ীর হাসি হাসল জ্যাকভ।

আখাতটা এল হঠাৎই। রানা কিছু বুঝে ওঠার আগেই প্রচণ্ড চড় খেলো গালে। পর পর দু'বার। উল্টোদিকের চড়। পড়তে পড়তে কোনমতে সামলে নিল রানা নিজেকে। রক্তের স্বাদ পেল জিতে।

'কিছু মনে কোরো না, রানা, বড় উশখুশ করছিল মমটা,' সন্তুষ্টি প্রকাশ পেল জ্যাকভের গলায়। 'বেশ আরাম পাচ্ছি এখন।'

'ও, রুডিনই তাহলে খুনী?' রানার গলার স্বর ভারী। 'ডলি করেছে ও-ই?'

'করেছি, তবে সবাইকে নয়,' জবাব দিল রুডিন। 'আমি আর জ্যাকভ ভাগ্যভাগি করেই কাজ সেরেছি।'

'কাপসুল আনতে তাহলে তুমিই গিয়েছিলে,' আপনমনে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'বুঝেছি, সেজন্যেই ফুস্ট-বাইটে মুখের অবস্থা করছিল হয়েছে তোমার।'

'হারিয়ে গিয়েছিলাম,' মুচকি হেসে বলল রুডিন। 'হতভাড়া স্টেশনটা খুঁজে পাবার আশাই ছেড়ে দিয়েছিলাম প্রায়।'

'জ্যাকভ আর রুডিন!' বুয়েলের কণ্ঠে বিস্ময়। 'বন্ধুদের খুন করেছে এরা! পিশাচ, খুনী, জানোয়ার...'

'বাস, বাস, হয়েছে। চুপ থাকো,' রুডিনের দিকে ফিরে আদেশ দিল জ্যাকভ। 'কারও প্রেরণে কোন জবাব দেবে না। নিজেকে হীরো বানানোর দরকার নেই আমাদের। বাংলাদেশের বোকা স্পাইটার মত বকর বকর করে কাউকে বোঝানোর দরকার নেই, কত চালাক আমরা। কমান্ডার রাইকভ, ফোনটা তুলে নিল। কন্ট্রোল রুমকে জাহাজের মুখ ঘোরানোর আদেশ দিন। সোজা দক্ষিণ-পশ্চিমে যেতে বলুন।'

'বড় বেশি আশাবাদী তুমি, জ্যাকভ,' শান্তকণ্ঠে বললেন রাইকভ। 'একটা সাবমেরিন হাইজ্যাক করতে চাইছ, বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?'

'রুডিন,' বলল জ্যাকভ। 'রুডিনের পেটে নিশানা করো। আমি পাচ গোণার সঙ্গে সঙ্গে টিগার টিপবে। এক...দুই...তিন...'

পবাজিত সেনাপতির মত একটা হাত তুললেন রাইকভ। এগিয়ে গেলেন ওয়াল টেলিফোনের কাছে। প্রয়োজনীয় আদেশ নিয়ে, দ্বিবিভার যথাস্থানে রেখে ফিরে এসে দাঁড়ালেন রানার পাশে। চাইলেন। কমান্ডারের চোখে রানার প্রতি সম্মান কিংবা শ্রদ্ধা কোনটাই অবশিষ্ট নেই। ঘরের অন্যান্যদের দিকে চাইল রানা।

জ্যাকভ, রুডিন আর গ্যাকো দাঁড়িয়ে আছে। চেয়ারে বা করে বসে আছে লিনি, কোনের ওপর রাখা খবরের কাগজ। ঘনোরা আগের মতই মার মার চেয়ারে। সবার কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে রয়েছে রুডিন। পিণ্ডল-ধরা হাতটা দ্বি, নিরুপল। কারও চেহারাও বীরত্বের কোন লক্ষণ নেই। শুধু হয়ে গেছে ঘেন ওরা।

কিছু ভাবতেও সাহস পাচ্ছে না।

একটা নিউক্লিয়ার সাবমেরিন হাইজ্যাক করার মধ্যে উত্তেজনা আছে, এবং নিঃশব্দতায় লাতজনের কাজ, কমান্ডার রাইকভ, বলল জ্যাকভ। 'কিছু সীমা নাথেন

করব না আমি। জায়গামত পৌঁছে আপনাদের ছেড়ে চলে যাব। আইস কাপের নাত্র কয়েক মাইল দূরে অপেক্ষা করছে একটা জাহাজ, তার ডেকে অপেক্ষা করছে একটা হেলিকপ্টার। বোলা সাগরে বেরিয়েই একটা বিশেষ ফ্রিকোয়েন্সিতে লেনিনখানদের পজিশন জানিয়ে মেনেজ পাঠাবেন আপনি। হেলিকপ্টার এসে তুলে নিয়ে যাবে আমাকে আর রুডিনকে। একটা উপদেশ দিচ্ছি আপনাকে, খোড়া এগ্রিন নিয়ে এরপর জাহাজটাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করবেন না। ওটা একটা ডেট্রয়ার। এই এগ্রিন নিয়ে ওটার ধাক্কা-কাছেও পৌঁছতে পারবেন না আপনি কোনদিন।'

'ফ্রিকোয়েন্সি কোথায়, জ্যাকভ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'তোমাদের নাগালের বাইরে। ঠিক সময় মত পৌঁছে যাবে ডেট্রয়ারে।'

'কিভাবে?' জানতে চাইলেন রাইকভ।

'দুঃখিত। আগেই তো বলেছি, যানার মত বকর বকর করতে পারব না।

কোন প্রফেশনাল বোকার মত বাহাদুরী করে না কখনও, কি কৌশলে কি করেছে জানায় না কাউকে।'

'সরিয়েই ফেললে শেষ পর্যন্ত!' তিক্ততা ঝলল রানার কণ্ঠ থেকে। ফুলে গেছে টেট। ভারী লাগছে কথাগুলো।

'হ্যাঁ, তুমি হেরেই গেলে শেষ পর্যন্ত, স্পাই সাহেব। পারলে না ঠেকাতে।' হাসল জ্যাকভ।

'হাসছ!' অবাক কণ্ঠে বলল রানা। 'সাতজন! সাতজন লোককে হাসিমুখে পরপারে পাঠিয়ে...'

'হাসিমুখে?' বেছে বেছে শব্দ চয়ন করে কথা বলল জ্যাকভ, 'না, বন্ধু, হাসিমুখে নয়। আমি একজন প্রফেশনাল, এবং কোন প্রফেশনালই বিনা কারণে খুন করে না। নিতান্ত বাধ্য হয়েই খুন করেছে আমরা সাতজনকে।'

'এই নিয়ে দু'বার প্রফেশনাল শব্দটা ব্যবহার করেছে তুমি,' ধীরে ধীরে বলল রানা। 'তার মানে হিসেবে কিছুটা ভুল হয়েছে আমার। এই খেলা তুমি নতুন খেলছ না। ক'বছর?'

'পনেরো বছর, বোকা,' শান্ত জ্যাকভ, 'আমি আর রুডিন—মন্ত্রোতে আমেরিকার সেরা অপারেটর।'

'সাতটা খুন করেছে, স্বীকার করতে দ্বিধা নেই?' জিজ্ঞেস করল রানা।

হঠাৎ ঠাঙ্গা হয়ে গেল জ্যাকভের চোখ। দ্বিঃ দৃষ্টিতে তাকাল রানার দিকে।

'কেন, ফিনের দ্বিধা? অবশ্যই খুন করেছে। কেন?'

'তুমি, রুডিন?' ঘাড় কিরিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ এ প্রশ্ন কেন?' সন্দেহ ফুটেছে রুডিনের চোখে।

'জবাব নিতে অসুবিধে আছে? নাকি ভয় পাচ্ছ বলতে?' চোখের কোণ দিয়ে দেখল রানা, তুরুর কুচকে তার দিকেই তাকিয়ে আছে জ্যাকভ। বোকাও একটা গোলামাল হয়ে গেছে, টের পেয়েছে যেন জ্যাকভ।

'ভয় পাব কেন?' বোচা খেয়ে খেপে গেল রুডিন। 'অবশ্যই খুন করেছে। দরকার হলে আরও করব।'

‘যাক, স্বীকার করলে তোমরা শেষ পর্যন্ত এগারো জন লোকের সামনে এভাবে মুখ কলকানো উচিত হয়নি তোমাদের। আসলে আমার কাছে তোমাদের বিরুদ্ধে এমন কোন প্রমাণ ছিল না, যার সাহায্যে কীমতে মোলানো যায়। কাজেই কিছু নাকীর নামনে খুনের স্বীকারোক্তি করিয়ে নিলাম। এবার আর বন্ধা নেই তোমাদের। তা, জ্যাক ডাক্তার, তোমার হেলিকপ্টার আর আসছে না কিন্তু। ফাঁসিতে ঝুলে মরাই লেখা আছে তোমাদের কপালে।’

‘বাটা উন্মাদ হয়ে গেল নাকি?’ ক্রমকে উঠল জ্যাক। গলার স্বরে উদ্বেগ।

জ্যাকের কথায় কান দিল না রানা। বলল, ‘কানে বিস্ত্রিত হবে, আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে রুডিনের ব্যাপারেও নিশ্চিত হয়েছি আমি। জিজ্ঞেস করতে পারো, ডাক্তার, ধরলাম না কেন তাকে? ধরলে নিজেদের কুকর্মের কথা সোজাসুজি অস্বীকার করতে দু’জনেই। তার চেয়ে এখনকার এই খেলাটাই কি ভাল খেলিনি?’

‘জাগলটার কথায় কান দিও না,’ রুডিনকে সাবধান করল জ্যাক। ‘ব্রাফ দিচ্ছে। আগে তোমাকে মোটেই সন্দেহ করেনি ও। করলে এভাবে পাশার ছক উল্টে যেত না।’

‘যখন বুঝেছি তুমি খুনী, ডাক্তার, আমি নিশ্চিত হয়ে গেছি সহকারী আছে তোমার। রুডিনের সঙ্গে একই কেবিনে ঘুমাতো তুমি, কাজেই, ওকে হাতে না রাখলে কুকর্ম করতে পারতে না। যদি রুডিন তোমার সহকারী না হত, তো ওকেও খুন করতে হত তোমার। অগ্নিকাণ্ডের রাতে তোমাদের কেবিনে দুই-দুইজন লোককে খুন করলে, অথচ রুডিনকে বাঁচিয়ে রাখলে, এ হতে পারে না। আরও কিছু ব্যাপার জানি আমি। বলছি। আসলে সে রাতে তোমার কেবিনের দরজা বরফ জমে জাম হয়ে যায়নি। অত্যা যখন দরজা ধাক্কাছিল, তোমরা দু’জনেই ভেতর থেকে পাল্লাটা গায়েব জোরে তেলে রেখেছিলে। এবং তা করে অত্যন্তে ভাল বোঝাতে চেয়েছিলে।’

‘মিলাহাইলকেও খুন করেছ তোমরা। ওর ঘাড়ের একটা লাল দাগ দেখেছি আমি। গ্যাকোকেও দেখিয়েছি। মানুষ খুন করতে দেখে ফেলেছিল নিচুই মিলাহাইল, কাজেই শেষ করে দিয়েছ তাকেও। ঘাড়ের আঘাত করে অজ্ঞান করে ফেলেছিলে ছেনেটাকে, তারপর ফেলে রেখেছিলে আগুনের ভেতরে। কিন্তু তোমরা ভাবনি, ক্যান্টেন কুমারত জলস্ত ঘরের ভেতরে টুকে বের করে আনবেন তাকে।’

‘পিলে চমকে গেল তোমাদের। যদি হুঁশ ফিরে পায় মিলাহাইল, তাহলে সব ভেঙ্গে যাবে। মিলাহাইলের ব্যাপারটা তখন খেয়াল করেনি কেউ। করার অবস্থাও ছিল না। ব্রাফাইলসের প্রতিটি লোক কুমার আর মোলানো মাঝে কাঁটার। আমরা যখন পৌঁছে গেলাম, বেশরোয়া হয়ে উঠলে তুমি জ্যাক। হুঁশ ফিরে পাবার লক্ষণ দেখাচ্ছিল মিলাহাইল। আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর মরফিন নিয়ে গিয়েছিলাম, সব পুষ করলে মিলাহাইলের শায়ে। মরফিন কি হলো তবুে অরাক হয়েছিল। তখন, কিন্তু এখন নই। অতিরিক্ত মরফিন পুষ করলে, এবং বোম্বা মারা গেলে সেটাকেও খুন বলে, না ডাক্তার?’

‘আসলে যা ভেবেছি, তার চেয়ে মাথায় অনেক বেশি বুদ্ধি রাখো তুমি, মাসুদ রানা,’ শান্ত কণ্ঠে বলল জ্যাক। ‘তোমাকে হিসেব করতে একটু ভুলই করে ফেলেছি। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না।’

‘যায় আসে না? অরাক করছ আমাকে, ডাক্তার। আমি আটচল্লিশ ঘণ্টা ধরে পরিহার ভাবে জানি তুমি আর রুডিন খুনী। তারপরও সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের আরেকটু না করে এখানে এই ওয়ার্ড রুম জমায়েত হয়েছি। কেন?’

‘কারণ সোজা, তুমি জানতে না রুডিনের কাছে পিতল আছে।’

‘তাই, না?’ রুডিনকে জিজ্ঞেস করল রানা, ‘ঠিক জানো তো, তোমার হাতের খেলনাটা কাজ করবে?’

‘এই ধরনের ধোঁকাবাজি অনেক পুরানো হয়ে গেছে, দোস্ত,’ হালকা গলায় বলল জ্যাক।

‘আমি ভাবছিলাম কি, পেট্রোল থেকে থেকে খেলনাটার জোড়ার সমস্ত লুহিকটিং অয়েল ধুয়ে গেছে বুঝি,’ জ্যাকের মতই হালকা গলায় বলল রানাও।

‘রানার কাছে ঘেঁষে এল জ্যাক। কঠিন হয়ে উঠেছে চেহারা। ‘জানো তাহলে তুমি সবই, রানা?’

‘ট্রাকটরের পেট্রোল ট্যাংকে ওটা ঝুঁজে পেয়েছেন আসলে, কমান্ডার রাইকট,’ বলল রানা। ‘তোমার ব্যাগে ভরে ওটা নিয়ে আসার ঝুঁকি তুমি নাওনি, ডাক্তার। তোমার ব্যাগ পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। কিন্তু আমি জানি, একজন প্রফেশনাল খুনী তার পিতল বেশিষণ কাছছাড়া রাখে না। আমি জানতাম, সামান্যতম সুযোগ পেলেই পিতলটা তুলে আনার জন্যে শেড়ে যাবে তুমি। কাজেই আবার পেট্রোল ট্যাংকে জিনিসটা রেখে দিয়ে এসেছিলাম।’

‘ভীষণ খারাপ লোক তো আপনি, মেজরা’ রেগেই গেলেন কমান্ডার। ‘নাকি আমাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলেন কথাটা?’

‘দুঃখিত, কমান্ডার,’ জ্যাকের দিকে তাকাল রানা। ‘পিতলটা রাখার আসল কারণ কি জানো? তোমার সহকারী কেউ আছেই, এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হওয়া। আমি পিতলটা রেখে আসার পরও স্টেশনে গিয়েছিলে তুমি। জোকের মত তোমার সঙ্গে লেগে ছিলাম আমি। তারপর তুমি সাবমেরিনে ফিরে এলে। আমি রয়ে গেলাম স্টেশনেই। সবাই লেনিনগ্রাদে ফিরে আসার পর গিয়ে পেট্রোল ট্যাংকে দেখলাম পিতলটা নেই। তুমি আনোনি, তাহলে কে আনল? সহকারী আছে, বুঝতে অসুবিধে হয় আর এরপর?’

‘তোমাকে মেরেই ফেলতে হচ্ছে, রানা,’ রুডিনের দিকে চাইল জ্যাক। ‘অত্যন্ত ডেঞ্জারাস লোক তুমি।’

‘লোজা রানার দুই চোখের মাঝে টিপ করল রুডিন।

‘রুডিন, দোস্তাই’ তোমার, আমার কথা শোনো,’ বলল রানা। ‘পিতল নানাও। নইলে বিশ সেকেন্ডের মধ্যে কোন ডাক্তারের সাহায্য দরকার হবে তোমার।’

‘মুখ খিঁচি করে গাল দিল রুডিন।

‘গ্যাকের দিকে ফিরল রানা। ‘কি কবতে হবে জানো তুমি, গ্যাকো।’

চকিতে সব ক'টা মুখ ফিরল গ্যাকোর দিকে। একটা বাকহেডে চেনা দিয়ে দাড়িয়ে আছে গ্যাকো। তাবাত্তর নেই চেহারা।

রুডিনও ফিরে চেয়েছে। নিজের অজান্তেই মাউজারের মুখ ঘুরে গেছে গ্যাকোর দিকে। বন্ধ পরিসরে পিতলের গুলি ফোটান আরো একটা বেশি করেই কানে বাজল। চোঁচিয়ে উঠল রুডিন। হাত থেকে পিতল পড়ে গেছে। বা হাতে চেপে ধরল ভাঙা ডান কড়া।

রানার ওয়ালথারটা খবরের কাগজের তলা থেকে বের করে আনল পিনি। ছোট্ট একটা গোল ফুটো হয়ে গেছে কাগজটার এক জায়গায়। শিল্পীর চোখে রুডিনের দিকে তাকিয়ে নিজের হাতের কাজ দেখল খেন, তারপর রানার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঠিক এভাবেই যত্ন করে চেয়েছিলেন আপনি, না মেজর?'

'হ্যা, ঠিক এভাবেই। হাতের টিপ তোমার চমৎকার, পিনি। ভেরি গুড!'

প্রশংসা করল রানা। 'মারুপ দেখিয়েছে হে, ল্যাণ্ডা মিয়া,' রুডিনের হাত থেকে বসে পড়া মাউজারটা তুলে নিয়েছে গ্যাকো। জ্যাকভের দিকে তাক করে বলল, 'বেসামান দেখলেই ট্রিগার টিপব। যদি মেকানিজম কাজ না করে, এটা দিয়ে পিটিয়ে ভাঙব তোমার মাথাটা।' পকেটে হাত ঢুকিয়ে ব্যাডেজের রোল বের করল সে। ঝুঁড়ে দিল জ্যাকভের দিকে, 'ঘটনা এই-ই ঘটবে, মোটামুটি শিওর ছিলাম আমরা, বুঝতে পারছ। কাজেই ব্যাডেজও সঙ্গে রেখেছি। নাও, তোমার বন্ধুকে একটু সাহায্য করো।'

'তুমি করো গে,' খ্যাক করে উঠল জ্যাকভ। রুশ কর্শ কণ্ঠস্বর। রাইকভের দিকে তাকিয়ে কাঠ হাসি হাসল গ্যাকো, পিতলটা দেখিয়ে বলল, 'ডাক্তার জ্যাকভের মাথায় এটা ভাঙবার যদি একটু অনুমতি দিতেন, কমরেড...'

'অনুমতি দেয়া গেল,' মুচকি হেসে বললেন রাইকভ। কিন্তু গ্যাকো এগোবার আগেই ব্যাডেজ নিয়ে কাজে লেগে গেল জ্যাকভ। পুরো এক মিনিট নীরবতা বিরাজ করল ঘরে। ব্যাডেজ বাঁধতে গিয়ে ইচ্ছে করেই রুডিনকে বাঁধা দিল জ্যাকভ। আল ঝাড়ছে। সব ভেঙে যাওয়ায় সবার ওপর রাগ।

ব্যাডেজ বাঁধা শেষ করল জ্যাকভ। রানাকে জিজ্ঞেস করলেন কমান্ডার, 'আমি এখনও বুঝতে পারছি না ফিল্ডলো কোথায় কি করে সরান ওরা।'

'সহজেই,' মৃদু হেসে বলল রানা। 'একটা ওয়াটার প্রফ ব্যাগে ফিল্ডলো ভরে একটা হলুদ ডাই মার্কার বেঁধে দিয়েছে ব্যাগের সাথে। তারপর গ্যালির পারবেজ-ডিসপোজাল ইউনিটে সেটা ফেলে রেখেছে। দাবমেরিন খোলা সমুদ্রে বেরোলেই পাম্প করে বের করে দেবার ব্যস্ত হবে—এই ছিল প্লান। রেডিওর সাহায্যে আগেরই জানিয়ে রেখেছে ডেপুটিয়ারকে ঠিক কোথায় তুলে উঠবে ব্যাগটা। গ্যাকোকে খেঁজান রাখতে বলেছিলেন। আজ বিকেলে রুডিনকে গ্যালিতে বোত দেবে গ্যাকো, হাতের ব্যাগটা ছিল। বেরিয়ে এসেছে খালি হাতে। রকফের নিক থেকে খোলা সাগরে বেরোলেই চট করে এক ফাঁকে ডিপে দেবে পাম্পের

বোতাম। সাথে সাথেই ভেসে উঠবে মার্কার স্ক্রু ব্যাগ। কয়েক হাজার বর্গপদ ছড়িয়ে যাবে পানির ওপর হলুদ রঙ। ডেপুটিয়ারের হেলিকপ্টার সহজেই খুঁজে পাবে ওটাকে। এরাও নিশ্চিত লেনিনঘাদে চড়ে চলে যাবে গদামস্ক হয়ে মস্কোতে—হয়তো বীরত্বের মেডেলও পেয়ে যাবে এক-আধটা। বুঝতে পেরেছেন?'

মাথা ঝাকালেন কমান্ডার। 'আরেকটা কথা,' বলে চলল রানা, 'লেনিনঘাদকে দেয়ি করাচ্ছে কেন জ্যাকভ, বুঝতে পারিনি বলেছিলাম। এখন বুঝেছি। আরহাওয়া খারাপ, যখন ওরা বুল গুলে করে ফিল্ড উদ্ধার সত্ত্ব নয়, তখন, মানে, বেশ দেয়িতে ডেপুটিয়ারটাকে আসতে বলেছিল জ্যাকভ। জায়গা মত পৌঁছতে দেয়ি হচ্ছিল ওটার, তাই আমাদের দেয়ি করাবার চেষ্টা। নভেলি ছেড়ে চলে আসার পর লেনিনঘাদের পজিশন জানিয়েছে সে, রেডিওতে যোগাযোগ রেখেছে ডেপুটিয়ারের সঙ্গে। সেখান থেকে আরও একটু দেয়ি করাবার নির্দেশ আসতেই আস্তন দিয়েছিল এজিন ক্রমে।'

'বুঝলাম,' ভুরু কঁচকে মাথা ঝাকালেন কমান্ডার। 'দক্ষিণ-পশ্চিমে রয়েছে ডেপুটিয়ারটা। দেব নাকি একটা টর্পেডো মেরে?'

'তৃতীয় বিশ্বুদ্ধের ঝুঁকি আপনি নিতে পারেন না,' হাসল রানা। 'আবার মাথা ঝাকালেন কমান্ডার। 'এখন পারবেজ ডিসপোজাল ইউনিট থেকে ব্যাগটা বের করি কি করে?'

'বের করার দরকার নেই,' বলল রানা। 'জায়গা মত পৌঁছে আমরাই ডিপে দেব বোতামটা।'

'কেন?' চমকে উঠলেন কমান্ডার। 'আমি চাই, ব্যাগটা ওরা পেয়ে যাক। ফিল্ডলো ডেভেলপ করে প্রিন্ট করার পর সি.আই.এ.টাক কমিউনের মুখের চেহারাটা কেমন হয় দেখবার সুযোগ পেলে বড় ভাল লাগত। জ্যাকভ, নিজেকে খুবই চালাক ভেবেছিলে তুমি। কিন্তু যদি জানতে অত্যন্ত সন্দেহপ্রক লোক আমি, তাহলে অতটা বাড়াবাড়ি করতে না। পিনিনের পা-টা এক-রে করার জন্যে পাগল হয়ে গিয়েছিলে, ভেবেছিলে কেউ আন্দাজ করতে পারবে না যে ওরই ব্যাডেজের নিচে করে চালান দেয়া হয়েছে ফিল্ডলো নভেলি থেকে লেনিনঘাদে। ওর প্রাস্টার কাস্ট খুলেছিলে কেন? প্রাস্টিকের খামে পোরা ফিল্ডলো বের করে নিতে, না? লুকানোর সত্যিই চমৎকার জায়গা বের করেছিলে তুমি, জ্যাকভ। সবই লক্ষ করেছি আমি।'

'প্রাস্টার কাস্টে ব্যবহৃত ব্যাডেজ ইত্যাদি খুলে নিয়ে খামটাস্ক ওয়েস্ট ট্রিতে ফেলে রাখলে তুমি। তারপর এক সুযোগে টুক করে খামটা নিয়ে পকেটে ভরলে।' হেসে উঠল রানা। কমান্ডারের দিকে চেয়ে বলল, 'কিন্তু যেহেতু জানেও না, আগের রাতেই পিনিনকে সিক বে-তে আনিয়েছিলাম আমি, দু'ঘণ্টা ধরে প্রাস্টার খসিয়ে ফিল্ডলো বের করে নিয়ে আবার প্রাস্টার করেছিলাম। প্রাস্টার করার আগে অন্য ফিল্ড ভরে নিয়েছিলাম ত্রিফ জায়গা মত। আসলে নিজেকে খানেকটা প্রকল্পশীল ভেবেছি তুমি, ডাক্তার। হঠাৎকার সি.আই.এ. বন্ধুরা রাশান লাকিং-বোনের ছবি কোনদিন পাবে না।'

অপ্রাণ্য গালাগাল নিয়ে উঠল জ্যাকভ। খানিকটা গাঢ় উপক্রম করল রানার

কিন্তু পারল না। পা বাড়াতেই চাঁদির ওপর বাড়ি খেল মাউজাবের কাঁটের। দলদল করে দাতব মেঝেতে আছড়ে পড়ল সে—অজ্ঞান।

কৃত্রিম জ্বাকভকে পরীক্ষা করল থাকো। তারপর সোজা হয়ে দাঁত বের করে হাসল। 'কোন কাজ করে এত আনন্দ ছাঁবনে পাইনি আমি, মেজব। ও হ্যা, ডাক্তার রুগডেনকোর কামেমবার ছবি তুলে, ফিল্মডলো প্রান্তিক বামে ভরার সময়ও প্রাণ খুলে হেসেছি।'

'কিসের ছবি?' কৌতুহল চেপে রাখতে পারলেন না কমান্ডার রাইকড।

দিলখোলা হাসি হাসল থাকো। নিক-বের দেয়ালে ডাক্তারের টাচানো ক্রমিক ছবি। ইয়োগী বীয়ার, ডোনাল্ড ডার্ট, ব্রুটো, পপি, মো-হোয়াইট অ্যাসেডেন ডোয়ার্থ। দেয়ালের সমস্ত ছবি তুলেছি টেকনিকালারে, 'আবার হাসল। 'ছবি দেখে বড় আনন্দ পাবে সি.আই.এ-টীক।'

এই সময় কন্ট্রোল রুম থেকে খবর এল, মাথার ওপরে পলিনাইয়া যাচ্ছে।

ভেসে ওঠার হুকুম দিলেন কমান্ডার রাইকড।

বুক ভরে শ্বাস নেয়ার জন্যে এখন কিছুটা তাজা বাতাস দরকার।



Almon

A lonely man in the crowded planet